শিক্ষা ও সাহিত্য

Teachers' Journal

VOL.LXXXIII NO.9 SEPTEMBER, 2004

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

শিক্ষা ও সাহিত্য

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

কবিতাগুচ্ছ

Teachers' Journal

CONTENTS

Editorial

Poem

ঃ প্রচ্ছদ ঃ

১লা সেপ্টেম্বর কলকাতা শহরে যুদ্ধবিরোধী শান্তিমিছিলের একাংশ

ভাববার কথা

প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয় ব্যবস্থায় সবচেয়ে প্রধান ভূমিকা শিক্ষকের। ঐ কারণে শিক্ষকের ভূমিকাকে লঘু করে দেওয়ার একটি সংগঠিত অপচেষ্টাও দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৯৮ সালে ফ্রান্সের ছাত্র আন্দোলনের একটি প্রধান ধ্বনিকে স্মরণ করি। সেই ধ্বনিটি হল "No teacher no future". **Jacques Delors-এর নেতৃত্বে International Commission on Education** for 21st Century শিক্ষাকে সবচেয়ে গভীর এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ মানব উন্নয়নের উপায় বলে দেখতে চেয়েছেন যার সাহায্যে দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতা দূর করা সম্ভব হয়, শোষণ এবং যুদ্ধকে জীবন থেকে চিরতরে বিতাড়িত করার চেষ্টা ফলবতী হয়। এই উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করতে হলে শিক্ষার চারটি লক্ষ্যকে অর্জন করতে হবে। সেগুলি হল — জানতে শেখা, করতে শেখা, একসঙ্গে বাঁচতে শেখা এবং বিকশিত হয়ে ওঠা। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে একসঙ্গে বাঁচতে শেখা শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এ সম্বন্ধে দ্যলর কমিশন বলেছেন, 'অন্যদের ইতিবৃত্ত, ঐতিহ্য, নৈতিকতা বিষয়ে একটি বোঝাপড়ার মধ্যদিয়ে একটি নতুন চেতনার জন্ম হতে পারে যা আমাদের ক্রমবর্ধমান একটি পারস্পরিক ধ্যান-ধারণার জন্ম দিতে পারে যার সাহায্যে এক সঙ্গে সার্বজনীন প্রকল্প রূপায়ণে এবং অনিবার্য মতভেদ সমূহকে বুদ্ধিদীপ্ত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করা সম্ভব হয়।' দ্যলর কমিশন শিক্ষার মধ্যে একবিংশ শতাব্দীতে এই ধরনেরই জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে দেখতে চেয়েছেন।

শিক্ষকের নিপুণতা, আত্মবিশ্বাস এবং দায়বদ্ধতা — এই ত্রিকোণের সাহায্যেই শিক্ষার সামগ্রিক গুণগত পরিকল্পনা সফল হতে পারে।

গণতান্ত্রিক জীবনবোধের ধারাবাহিকতার ফলশ্রুতিতে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার অঙ্গনে এখন বঞ্চিত-শোষিতদের একটা বড় অংশ প্রবেশাধিকার পেয়েছে। ধারাবাহিকভাবে পঁচিশ/ছাব্বিশ বছর ধরে দরিদ্রতম মানুষের কাছে শিক্ষার সুযোগ উন্মোচিত হতে পেরেছে এবং গ্রামাঞ্চলে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রেণিশিখনে সংখ্যার স্ফীতিকে একটা বড় সমস্যা হিসাবে মনে হচ্ছে। অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিশিখনের ধারাবাহিকতার মধ্যদিয়েই সংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করা যায়। এই কাজের উপযোগী গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবিক পাঠ্যসূচি বিদ্যালয়স্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

কিন্তু সারাদেশের পরিস্থিতি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন বিকাশের অনুকূল নয়, যার প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রকেও কলুষযুক্ত করছে। উন্মত্ত ভোগ্যপণ্যবাদী জীবনবোধ মানুষকে সংকীর্ণ, স্বার্থপর, সমষ্টিবিমুখ, আত্মসুখী জীবনযাপনে প্ররোচিত করছে। জীবনের সমস্ত কিছুকে মুনাফার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার প্রবণতা সৃষ্টি হচ্ছে। তার ফলে শিক্ষার মধ্যেও পণ্যমানসিকতা এসে যাচ্ছে। পণ্যমানসিকতার নিয়ন্ত্রক শক্তি বিশ্বায়নের আপাতঃউদারতার অন্তরালে সর্বব্যাপি বাজার মৌলবাদ। এই মৌলবাদের একমুখী নীতি একচক্ষু হরিণের মতো গণতান্ত্রিক জীবনবোধকে ও তার দার্শনিক ভিত্তিকে নস্যাৎ

করার চেষ্টায় মানুষকে ক্রমে ক্রমে ভোগ্যপণ্যের উপভোক্তায় পরিণত করে নিজের ও নিজের পরিবারের জন্য 'বিচ্ছিন্ন' জীবনযাপনে প্ররোচিত করার চেষ্টা করছে। প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় উন্নয়নের ফলে গোটা পৃথিবী 'কর্মসংস্থানহীন উন্নয়ন'-এর যুগে পদার্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। তার অনিবার্য ফলশ্রুতি রূপে 'সকলের জন্য শিক্ষা'র ধারণাকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা চলছে, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থাকে অকেজো করার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকের ভূমিকাকে নস্যাৎ করে তথাকথিত 'মুক্তশিক্ষা', 'দূরবর্তী শিক্ষা' ইত্যাদি শিক্ষকবিহীন শিক্ষার মাহাত্ম্য কীর্তন করা হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অঙ্গনে আসা দরিদ্রতম মানুষের ঘরের ছেলেমেয়েদের অবহেলা ও অপমানের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। শিক্ষকের গুরুত্বের হানির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণিশিখনের বিশ্বাসযোগ্যতাও ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়েছে। শ্রেণিশিখনের গুরুত্ব ও বিশ্বাসযোগ্যতা লঘু করে দেখানো হচ্ছে, অর্থের বিনিময়ে প্রশ্নের উত্তর লাভের বাণিজ্যিক প্রয়াসকে শিক্ষার জন্য অপরিহার্য বলে প্রচার করা হচ্ছে। শ্রেণিশিখনের বিশ্বাসযোগ্যতা আমাদের প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। শিক্ষার্থীদের শিখনপ্রয়াসে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে হবে। তার বিচারবুদ্ধিতে সাহস জাগ্রত করতে হবে। সারা বছরে শেখার শেষে পরীক্ষার উত্তরপত্রে বাজারচলিত 'নোটবই' থেকে নির্ভুল মুখস্ত লেখার মধ্যেই তার মূল্যায়ন করা, কৃতিত্ব দেওয়া আদৌ সঙ্গত কিনা ভাবতে হবে। রবীন্দ্রনাথও অনেকদিন আগেই আক্ষেপ করে বলেছিলেন — "ঘুচলো না আমাদের নোটবই-এর শাসন, আমাদের বিচারবুদ্ধিতে নেই সাহস, আছে নজীর মিলিয়ে অতি সাবধানে চলা।" নোটবই-এর নাগপাশে আটক বিচারবুদ্ধিতে সাহস আনার অভিযান চালাতে হবে। রবীন্দ্রনাথ যে কথা আরো বলেছেন সেই কথাটি আপনাদের ভাবনার জন্য উপস্থাপিত করছি। রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন ঃ যারা পরীক্ষার ঘরে 'চাদরের মধ্যে বই নিয়ে যায়' তারা ধরা পড়লে তাদের আমরা তিরস্কার, বহিষ্কার করি। কিন্তু পরীক্ষার ঘরে যারা 'মগজের মধ্যে করে বই' নিয়ে যায় এবং খাতা ভরিয়ে লেখে, তাদেরই আমরা পুরস্কার দিই, সম্মান জানাই। কেন এই অবিচার ?

আপনাদের সম্মিলিত ভাবনার মধ্যদিয়ে মূল্যায়ন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করতে হবে। 'নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন' ও 'গ্রেড ব্যবস্থা'র পরিকাঠামো 'বিদ্যালয়গুচ্ছ' ভাবনার মধ্যদিয়ে গড়ে তোলার উদ্যোগ সংগঠিতভাবে গ্রহণ করতে হবে। বহুবার আলোচিত পুরনো এই কথাগুলি বর্তমান মুহূর্তে খুবই প্রাসঙ্গিক।

১৩.৯.২০০৪

সমিতির ডাক

অমল ব্যানার্জী
সাধারণ সম্পাদক

প্রতিবাদী মানুষের ভাষায় সোচ্চার হয়ে উঠলো ঐতিহাসিক মহামিছিল। যুদ্ধের বিরুদ্ধে জারি থাকবে এই লড়াই, এটাই ছিল মিছিলের প্রত্যয় দৃঢ় ঘোষণা। ১লা সেপ্টেম্বরের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে এই সমাবেশে আমরা ছিলাম অংশীদার। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমাজের তরফে অংশগ্রহণ ছিল অভিনন্দনযোগ্য। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য বিস্তারের নীতির বিরুদ্ধে উচ্ছল সরব এই প্রতিবাদ এক ধাপ এগিয়ে দিল আমাদের সংগ্রামকে।

'ফিসে' ডাক দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বায়নের নামে যেভাবে শিক্ষার উপরে হামলা চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদে পালিত হোক ৫ই অক্টোবর আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবস। এস টি এফ আই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সব রাজ্যের জেলায় জেলায় এই কর্মসূচি পালন করতে। সমিতির তরফে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সকল শিক্ষক সংগঠনকে যুক্ত করে রাজ্য স্তরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে ঐদিন বেলা ৪টের সময় আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবস পালিত হবে। আলোচিত হবে শিক্ষায় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের ধাক্কা রুখতে রাষ্ট্রের দায়িত্বপালনের প্রসঙ্গ।

জেলায় জেলায় এই দিবস পালনের উদ্যোগ নিতে হবে। এ বি পি টি এ'র সাথে যৌথভাবে তৎপর হতে হবে জেলা নেতৃত্বকে। যে সব ক্ষেত্রে অন্যান্য সংগঠন আগ্রহী হবে, তাদেরকেও যুক্ত করে নেবার ব্যবস্থা নিতে হবে।

গণ-সংগঠনগুলির জাতীয় মঞ্চের (NPMO) পশ্চিমবঙ্গ শাখার আহ্বানে সেপ্টেম্বর মাসব্যাপী শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দাবী সহ ২২ দফা দাবীতে ব্লক-মহকুমা সহ সর্বস্তরে ব্যাপক প্রচার অভিযানের কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এই প্রচার অভিযানের পর আগামী ১লা অক্টোবর শহীদ মিনার ময়দানে সমাবেশের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য সংগঠনের সাথে যৌথভাবে, বিশেষ করে, ১২ই জুলাই কমিটির মাধ্যমে এই কর্মসূচি সফল করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কেন্দ্রে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার একটি ন্যূনতম কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে কিছু জনকল্যাণকর কাজের কথা বলা আছে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই শ্রেণিস্বার্থে আর্থিক সংস্কারনীতির প্রয়োগ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্তও ঘোষিত হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও গতি শ্লথ। বরাদ্দ যথেষ্ট নয়। এমতাবস্থায় আন্দোলন ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই। পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক শক্তির তৎপরতা সম্পর্কেও সজাগ থাকতে হবে। সঠিক অভিমুখের গণ-আন্দোলনই আমাদের ভবিষ্যতের দিশারী — এই উপলব্ধিতে সদস্যবন্ধুদের উদ্দীপিত হতে হলে সংগ্রামের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া একান্ত জরুরী।

পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যা শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রসঙ্গকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। মানোন্নয়নের বিষয় এখন আর নিছক কয়েকজন গবেষক ও কতিপয় বিশেষজ্ঞের বিষয় নয়। পশ্চিমবাংলার বিশেষ প্রেক্ষিতে এটা এখন শিক্ষা আন্দোলনের নয়া অভিমুখ। বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে একে সামগ্রিক আন্দোলনের রূপ দিতে হবে সমিতিকে। তবেই রক্ষা, প্রসার ও উন্নয়ন সম্ভব হবে প্রথাগত বিদ্যালয় ব্যবস্থার — বাঁচবে স্কুল, শ্রেণিশিখন এবং এই মহতী পেশা। অন্যথায় সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণকে রুখতে সাধারণের বিদ্যালয় ব্যবস্থা এককভাবে লড়াই চালাতে আরো বেশী বিপদের মুখে পড়বে।

জেলা সম্মেলনগুলি শুরু হয়ে গেছে। নিজ নিজ জেলার সম্মেলন সফল করে তোলার পাশাপাশি আন্দোলন সংগ্রামের কর্মসূচি সফল করে তোলার বিষয়েও সাংগঠনিক তৎপরতাকে সুবিন্যস্ত করতে হবে। জেলা সম্মেলনের কাজ সম্পন্ন করার পর রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে মহকুমা স্তর পর্যন্ত শিক্ষা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সেমিনার বা যৌথ কনভেনশনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে যে ত্রিমুখী সংগ্রাম তা সর্বস্তরে সম উপলব্ধিতে আনা দরকার। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা একটা জরুরী কর্তব্য। প্রথমত, শান্তির পক্ষে, যুদ্ধ-সন্ত্রাস-মৌলবাদ ও আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক মানুষ সমাবেশে যুক্ত হলেন তাদের সাথে আমাদের যুক্ত হওয়া। দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশের জন্যে, জনস্বার্থে, সি এম পি-কে হাতিয়ার করে যে গণ-আন্দোলন বিকশিত হচ্ছে তাতে যুক্ত হওয়া শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমাজের একটা বড় সামাজিক দায়িত্ব। তৃতীয়ত, পেশার স্বার্থে, নিজের এবং পরিবারের অস্তিত্বের স্বার্থে স্কুলটাকে বাঁচানো, শ্রেণিশিখনকে রক্ষা করা আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সাধারণের স্কুলটাকে সাম্রাজ্যবাদ সুকৌশলে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে দেশের বৃহৎ পুঁজির সাহায্যে। তাই বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের মানোন্নয়নের আন্দোলন গড়ে তোলা এটা আজ প্রয়োজনীয় সংগ্রাম। গত চার দশক ধরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রথাগত বিদ্যালয় ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলা বা দুর্বল করে দেবার কাজ নিরন্তরভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। তাই সকলকে সজাগ হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক।

১৬.৯.২০০৪

সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে শান্তির মহামিছিল

বিমান বসু

আজ পয়লা সেপ্টেম্বর, ২০০৪ দুপুর একটায় আবার ঐতিহ্যশালী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কলকাতা শহরে লাখ লাখ মানুষ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের নীতির বিরুদ্ধে মহামিছিলে পা মেলাবেন। এই মহামিছিলে অংশ নেবেন শিল্পী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্র-যুব-মহিলা, শ্রমিক-কর্মচারী, রাজনৈতিক কর্মী-নেতৃত্ব এবং অগণিত সাধারণ মানুষ। মহামিছিলের আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যের ১৭টি বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্ব। মিছিল থেকে স্লোগান উঠবে ঃ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরাক থেকে হাত ওঠাও, ইরাক-আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে, কিউবাকে ঘিরে নতুন চক্রান্ত বন্ধের দাবিতে। আরও অনেক স্লোগান উঠবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বব্যাপী আধিপত্য কায়েম করার নানা চক্রান্তের প্রতিবাদে। পয়লা সেপ্টেম্বর ছুটির দিন না-হওয়া সত্ত্বেও কেন কলকাতায় মহামিছিলের আয়োজন করা হচ্ছে, এ নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন তোলার প্রয়াসে কোনও কোনও সংবাদপত্রে কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। প্রশ্নকর্তারা আমাদের প্রশ্ন না করে ইতিহাসের পাতা থেকে কষ্ট করে সংগ্রহ করলে দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় দেশপ্রেমিক মানুষের মনে জাগরূক এই সেই কালো দিন, যে দিন মদমত্ত জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনী ১৯৩৯ সালে অহেতুকভাবে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করার মধ্যদিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছিল। ইতিহাসের কোনও 'বিশেষ দিন' ছুটির দিন না হলে আমরা নাচার। সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পয়লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধবিরোধী শান্তিমিছিল আয়োজিত হয়ে আসছে। আর এই পৃথিবীর বাইরের কোনও জীব নই বলেই আমরাও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার নানা এলাকা-সহ বহু জেলার সমন্বয়ে মিলিত এই মহামিছিলের আয়োজন করেছি।

বলাইবাহুল্য, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কেন ইরাক আক্রমণ করেছিল এবং ইরাকের ঐতিহ্যশালী এলাকা-সহ সম্পত্তি ধ্বংস করে হাজার হাজার মানুষকে খুন করেছে, তার জবাব অন্য কোনও দেশ দূরের কথা, নিজেদের দেশের জনগণকে তাঁদের রাষ্ট্রনেতারা দিতে পারছেন না। আবার ইরাক দখলে রেখে 'পুতুল সরকার' বসিয়ে, দেড় লক্ষাধিক সৈন্য মোতায়েন রেখে, কোটি কোটি ডলার ব্যয় করার কোনও প্রয়োজন তাঁদের দেশের মানুষ বুঝতে পারছেন না। প্রশ্ন আরও জোরালো হচ্ছে যখন ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যদের ইরাকি মানুষের প্রতিরোধে পাল্টা খুন হতে হচ্ছে। ইরাকের ফালুজা ও নাজাফ মার্কিনী সেনাকর্তাদের আর নিরাপদ স্থান নয় বলে তাঁরা নিজেরাই মনে করছেন। তাই, মাঝে মাঝে আকাশপথে আক্রমণ হানছেন। এভাবে কতদিন চলবে? আমরা কেউ ভিয়েতনামের ইতিহাস ভুলে যাইনি। আমেরিকার বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মাইকেল মুর, তাঁর ফারেনহাইট ৯/১১ আমার আমেরিকার সিনেমা হলে বসে দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে। দর্শকদের অভিব্যক্তিও দেখেছি।

আমরা সকলে জানি, যেদিন সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরের অনুষ্ঠান হয়েছিল, সেদিন ইরাকি জনগণ কোনও উৎসব করেন নি। আর সেইদিন বাগদাদের খুব কাছে ইস্তাম্বুলে (তুরস্কে) ন্যাটোর বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার উপস্থিত থাকলেও বাগদাদে তথাকথিত হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন না কেন? ইরাক তো এখন ইঙ্গ-মার্কিন ও তাঁদের সহযোগী সেনাদের দখলে রয়েছে। কারণ আছে। এককথায় প্রায় বিনা প্রতিরোধে বাগদাদ দখল করার পর জর্জ বুশ বা টনি ব্লেয়াররা বুঝতে পারেন নি যে, তাঁদের সৈন্যবাহিনীর বড় কর্তারা নিজেদের পারিষদবর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত না হয়ে ইরাকের রাস্তায় চলাফেরা করতে পারবেন না। শুধু কি হাজার হাজার নিরীহ ইরাকি জনগণ ও প্রতিরোধকারীরা খুন হচ্ছেন? না, গত কয়েক মাস সময়ের মধ্যে প্রায় সহস্রাধিক মার্কিন সেনা ইরাকি প্রতিরোধ বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে এবং কয়েক হাজার আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এ অবস্থায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর ইরাকে যাওয়া কি সমীচীন হবে?

নতুন করে আবার কিউবাকে ঘিরে চক্রান্তের জাল বিস্তার করতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ফ্লোরিডার টম্পোতে এক সম্মেলনে বলেছেন যে, 'ফিদেল কাস্ত্রোর জমানায় মার্কিন ও কানাডার যৌনলোভী পর্যটকেরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিবর্তে কিউবাকেই তাঁদের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত করেছে।

২

বুশ সাহেব আরও বলেছেন যে, 'মানুষের দেহ নিয়ে ব্যবসা আমাদের দেশে বয়ে আনছে লজ্জা ও দুর্ভোগ। এর বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেব।' মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্রের সন্ধানে ইরাক আক্রমণের মতো এ এক অদ্ভুত অজুহাত। কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো অবশ্য ডঃ জাস্টিন ও ফ্র্যাঙ্ক-এর বিখ্যাত বই 'বুশ অন দ্য কাউচ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'মার্কিন রাষ্ট্রপতি ২০ বছর বয়স থেকে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত অত্যধিক পানাসক্তির ফলশ্রুতিতে নানা বিভ্রান্তিকর কথা বলে কিউবায় জন্মগ্রহণ করা ফ্লোরিডার মানুষকে কিউবার বিরুদ্ধে তাঁদের চক্রান্তের যৌক্তিকতা বোঝাবেন তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী রয়েছে!' কিন্তু কিউবা ছোট্ট দেশ হলেও ছেড়ে কথা বলার পাত্র নয় একথা আমরা সকলে জানি। আমরা দেখেছি, ভেনেজুয়েলা নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নানা চক্রান্ত। এই সেদিন মার্কিনীদের উত্থাপিত গণভোটের কথার চ্যালেঞ্জ নিয়ে হুগো স্যাভেজ ভেনেজুয়েলার জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে জয়লাভ করেছেন। ভুলে গেলে চলবে না যে, অভ্যন্তরীণ নাশকতা ও ভাড়াটে বাহিনীর নানাবিধ চক্রান্তকে ভেনেজুয়েলার জনগণ সতর্ক প্রহরীর মতো সচেতনভাবে পরাস্ত করেছেন। এ সব সত্ত্বেও এশিয়া-আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত একের পর এক সংগঠিত হচ্ছে। মানুষের অধিকার হরণ আর অমানবিক কাজের অসংখ্য উদাহরণ হাজির করে এ লেখা বড় করতে চাই না।

এই মুহূর্তে জরুরি কর্তব্য, সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তারের রণকৌশল সম্পর্কে জনগণকে সজাগ সতর্ক করা। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নয়া উপনিবেশবাদের নয়া কৌশল ও যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সোচ্চার হওয়া — যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই ; আধিপত্য চাই না, অন্য দেশের হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বাধীন সার্বভৌম দেশের মানুষ হিসেবে বাঁচতে চাই। তাই মহামিছিলে সকলে মিলে পা মেলাতে অংশ নিতে চাই। আসুন, আপনি আমি আমরা সকলে মহামিছিলে সামিল হই।

(প্রবন্ধটি প্রকাশিত ১লা সেপ্টেম্বর, ২০০৪-আজকাল পত্রিকায়)

সমাজ, মূল্যবোধ ও শিক্ষা

রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়

সভাধ্যক্ষ, রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়

সূচনা ঃ আমরা বর্তমান সমাজের সর্বস্তরে বহুবিধ বিকার ও বিচ্যুতি নিয়ে আতঙ্কিত, মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখে উদ্বিগ্ন, শিক্ষাব্যবস্থাকে ঘিরে চিন্তিত। এই তিনটি ক্ষেত্রকে স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনা করা এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জটিল ও বিরাট কাজ। এই নিবন্ধে আংশিকভাবে সেই চেষ্টা করা হল।

১। সমাজ ও সমাজবোধ ঃ পরিবেশের বাধা-বিঘ্ন ও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে এককভাবে বেঁচে থাকা যে সম্ভব নয় এটা আদিম যুগেই মানুষের উপলব্ধিতে এসেছিল। বংশানুক্রমে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মানুষে-মানুষে সহযোগিতা অপরিহার্য। তাই তাগিদ জেগেছিল যৌথ জীবনযাপনের, যার প্রথম ধাপ পরিবার। তারপরে পরিস্থিতির ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্টি হল নানা স্বার্থের ও চরিত্রের গোষ্ঠীসমূহ। জাতি, ধর্ম, বৃত্তি ইত্যাদির ভিত্তিতে পরিচিত হ'ল খণ্ড-সমাজ—বাঙালী সমাজ, বৌদ্ধ সমাজ, শিক্ষক সমাজ এবং আরো অনেক। এই অংশসমূহের সামগ্রিক রূপ মহান মানবসমাজ। পরিবার থেকে শুরু করে বিশ্ব মানবসমাজ গড়ে তোলার এই যে সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া তার মূল তাগিদ ছিল পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সার্বজনীন উন্নয়ন, সমষ্টিগত অগ্রগতি। এই লক্ষ্যে পৃথিবীর নানা প্রান্তে অগণিত মানুষের চিন্তা ও সৃজনশীল শ্রমের ফলেই আমরা মানবসভ্যতার অংশ, সেই গৌরবের অংশীদার। আমরা বিশ্বনাগরিক।

পারিবারিক বন্ধন নির্ভর করে একের প্রতি অন্য সদস্যের মনোভাব ও অনুভূতির ওপর। পিতা-মাতা ও সন্তানদের নিয়ে গঠিত যে-কোনও পরিবারের সুস্থ লক্ষ্য থাকে, যেন সব সদস্য যথাসম্ভব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে স্বমর্যাদায় জীবনযাপন করতে পারে এবং সম্ভাব্য সমৃদ্ধির পথে এগোতে পারে। এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সমষ্টির স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধে স্থান দিতে হয়। দুর্বলকে রক্ষা করার জন্য সক্ষমতরকে কিছু স্বার্থত্যাগ করতে হয়। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধার যে সম্পর্ক তা এই একাত্ম হবার উদার মানসিকতা গড়ে তোলে। এই পবিত্র আবেগসমূহই সুস্থ পরিবারের ভিত্তি। একাধিক প্রজন্ম এবং বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সমন্বয়ে যৌথ পরিবারের চিত্র আমাদের অনেকেরই পরিচিত। সেখানে আরও অনেকের চাহিদা, সুবিধে-অসুবিধের দিকে দৃষ্টি রেখে পরিবারের স্বাভাবিক পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে হয়। প্রয়োজন হয় সহনশীলতা, মানিয়ে চলার মনোভাব, ব্যক্তির কিছু স্বার্থকে পেছনের সারিতে রাখা। এই পরিমণ্ডলে জন্ম নিতে পারে মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, সমবেতভাবে বেঁচে থাকার উপযোগিতা সম্পর্কে গভীর বিশ্বাস। এই মনোভাব প্রসারিত হতে পারে প্রতিবেশীদের দিকে। তখন গড়ে ওঠে গ্রামের বা পাড়ার সংহতি। মূর্ত হয়ে ওঠে নিরুচ্চার প্রতিজ্ঞা—'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। জাতি, ভাষা, ধর্ম বা অন্যবিধ ভেদাভেদ অতিক্রম ক'রে প্রতিষ্ঠিত হয় স্থায়ী অন্তরঙ্গ সম্পর্ক।

কিন্তু যা হওয়া কাম্য তা সবসময় হয় না, বা স্থায়ী হয় না। শোষণভিত্তিক সমাজের ছিদ্রপথে আসে বিভাজনের বিষ। লোভ, স্বার্থপরতা, অসহিষ্ণুতা, হিংসা প্রভৃতি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে নেতিবাচক মাত্রা যোগ করে। স্নেহ-ভালবাসা, আবেগ-অনুভূতি শুকিয়ে যায়। বিরোধ বাধে যৌথ পরিবারে। 'পরিবার' বা 'আপনজন'-এর সংজ্ঞা পাল্টে যায়। জীবনে প্রতিষ্ঠিত সন্তানের সঙ্গে বৃদ্ধ অশক্ত পিতামাতার যান্ত্রিক সম্পর্কের সূত্র ধরে জেগে ওঠে বৃদ্ধাবাসের সংস্কৃতি। জন্মসূত্রে স্বাভাবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রের এই মনোভাব বৃহত্তর সমাজে সম্প্রসারিত হতে থাকে। সব সম্পর্কই হয়ে ওঠে স্বার্থকেন্দ্রিক। সমাজের সংহতি দুর্বল হতে থাকে।

সমষ্টিগত জীবনযাপন সম্পর্কে ব্যক্তির বিশ্বাস ও আগ্রহই হচ্ছে সমাজবোধের মূল কথা। সেই বিশ্বাসের অনুসারী আচরণে প্রতিফলিত হয় তার দায়বদ্ধতা। এই দায়বদ্ধতা যত গভীর ও ব্যাপক হবে, মানুষে-মানুষে সম্পর্ক তত নিবিড় হবে, সমাজ সংহত হবে, সমষ্টির এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তির ক্রমোন্নতি সহজ হবে। এই দায়বদ্ধতার একমাত্র উৎস মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, সর্বজনের কল্যাণ সাধনের আগ্রহ। সমাজে সক্ষম-দুর্বল, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-

শিক্ষাহীন প্রভৃতি নানা অবস্থার মানুষ আছে। সমাজ ব্যবস্থাই যুগে যুগে এই বিভাজন সৃষ্টি করেছে, তাকে টিকিয়ে রেখেছে, বাড়িয়ে তুলেছে। 'আমি' এই সমাজের অংশ। 'আমার' চেয়ে বিত্তবান, সুযোগপ্রাপ্ত মানুষ কিছু আছে। কিন্তু তারচেয়ে অনেক বেশী সংখ্যায় আছে দীন-দরিদ্র, বঞ্চিত, অসহায় মানুষ। 'আমাদের' আচরণ যদি সমস্যার মূলোৎপাটন করে সকলের স্বার্থ রক্ষার দিকে চালিত হয়, সমাজ উন্নত হবে, তার সুষম অগ্রগতি হবে। আখেরে সেটা 'আমার' স্বার্থকেও সুরক্ষিত করবে। এই চেতনাই সমাজকে ধরে রাখার মূলমন্ত্র।

কিন্তু মুনাফা-তাড়িত বাজার-চালিত আর্থব্যবস্থা মানুষের এই সুস্থ সমাজ-চেতনাকে বিধ্বস্ত করছে, বিনষ্ট করছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে মানুষের মধ্যে যে সাধারণ প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ছে তার সার কথা হ'ল আত্মকেন্দ্রিক ভোগলিপ্সা। মালিকশ্রেণির হাতে প্রভূত পরিমাণ পুঁজি সঞ্চিত হয়েছে। একে বিনিয়োগ করতে হবে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। বাজার-নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে সমাজের স্বার্থ অগ্রাধিকার পায় না। কোটি কোটি মানুষের মৌলিক প্রয়োজন বিশুদ্ধ পানীয় জল। কিন্তু বাজারী প্রক্রিয়ায় অনেক বেশী লাভজনক মোবাইল ফোন, অথবা কোনো ক্ষেত্রে মারণাস্ত্র। পুঁজির বিনিয়োগধারা অতএব সেই যুক্তির খাতেই প্রবাহিত হয়। বাস্তবে তাই উৎপাদিত হচ্ছে নিত্যনূতন দ্রব্যসামগ্রী, উদ্ভাবিত হচ্ছে প্রয়োজন-নির্বিশেষে হরেকরকম মনোরঞ্জক পরিষেবা যার অনেকগুলিই প্রকৃতপক্ষে অনিষ্টকর। এসবের জন্য বিরাট বাজার তৈরী করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে বিশ্বব্যাপী বিপণনের ফাঁদ। মানুষের চাহিদা সৃষ্টি করতে হবে। তাদের ভেতর জাগিয়ে তুলতে হবে উদগ্র ভোগবাসনা যার কোনো সীমা থাকবে না। গতকাল যা ছিল নিছক বিলাসের সামগ্রী আজ তাকে নিয়ে যেতে হবে অবশ্য-প্রয়োজনের তালিকায়। একই পণ্যকে মোড়কের চাকচিক্য আর বিজ্ঞাপনের প্রগল্‌ভতায় নতুন বলে প্রতিভাত করতে হবে। বণিককূলের এই মায়াজালে মানুষ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। তাদের তুলে ধরা স্বপ্নের জীবনমানকে স্পর্শ করার ঐকান্তিক আগ্রহে অন্যসব বিবেচনা মন থেকে সরে যাচ্ছে। আরো সম্ভোগ, আরো সম্পদ, আরো অনেক বিলাসিতা — একেই মনে হচ্ছে জীবনের চরম সার্থকতা। ভাগীদারের সংখ্যা কমাবার জন্য পরিবার-পরিজনের পরিধি সঙ্কীর্ণ ক'রে শুধুই নিজের অলীক স্বপ্ন সার্থক করার চেষ্টায় মানুষ নিমগ্ন থাকছে। চটকদার বিজ্ঞাপনের একটি পরিচিত সুর—'পড়শির ঈর্ষা, আপনার গর্ব'। [Neighbour's envy, Your pride] । হ্যাঁ, এই মনোভাবটাই জাগাতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কে থাকবে না প্রীতি, আনন্দ বা সহমর্মিতার ছোঁয়া! থাকবে শুধু সম্পদ দেখিয়ে তার ঈর্ষা জাগানোর তৃপ্তি, আর তার সুখ দেখলে ঈর্ষায় দগ্ধ হবার যন্ত্রণা।

অপরদিকে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণামেই বিরাটসংখ্যক মানুষের অতি সাধারণ মান-এর জীবনধারণও কঠিন হয়ে উঠছে এবং এই বর্গের মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতিকে সমাজের সার্বিক কল্যাণের পরিবর্তে মুনাফার লক্ষ্যে নিয়োজিত করার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষের ভূমিকা কমে যাচ্ছে। 'কর্মসংস্থানহীন বিকাশ'-এর পরিস্থিতি সাধারণ মানুষের স্বপ্নকে চুরমার করে দিচ্ছে। ক্রমবর্ধমান কামনা-বাসনার সঙ্গে ক্রমহ্রাসমান সুযোগের দ্বন্দ্বে সবাই ইঁদুর দৌড়ে প্রতিদ্বন্দ্বী। দুর্লভ কিছু লক্ষ্য অর্জনের প্রতিযোগিতা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। জীবন সংগ্রামে সকলেই পরস্পরের প্রতিপক্ষ, কেউ সহযোগী মিত্র নয়। আবেগ-অনুভূতিহীন, আত্মকেন্দ্রিক সমাজবিমুখতার এই ব্যাধি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংক্রামিত হচ্ছে শিশু-কিশোরদের মধ্যে। তাদের মনে সঞ্চারিত হচ্ছে এই বিশ্বাস যে সহপাঠীরা সকলেই প্রতিপক্ষ, সবাইকে হারিয়ে প্রথম হতে হবে। তাই কারোকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করাটা বোকামী। এভাবে শুধু এই প্রজন্ম নয়, আগামীদিনের নাগরিকদেরও সমাজবোধ বা সামাজিক দায়বদ্ধতার উৎসমুখ রুদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

একথা স্বীকার্য যে এই সর্বনেশে ঝোঁক সমাজের সংখ্যালঘিষ্ঠ একটি মহলেই প্রকট হয়ে উঠছে। তবে তারাই সমাজে কিছু কিছু বিষয়ে নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালন করছে। তারসঙ্গে রয়েছে পুঁজিপতিদের পরিকল্পিত অনলস প্রচার অভিযান। গ্রামের সাধারণ মানুষকে ডাব-খাওয়া ভুলিয়ে দিয়ে বোতল-কোলা ধরানোর কাজ অনেকটাই সফল হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণিত হাসিম সেখ, রামা কৈবর্তের বংশধরেরাও এই বৃত্তে প্রবেশ করতে উন্মুখ হচ্ছে। ধীর বিষক্রিয়ায় তাদের মধ্যেও সোনালী স্বপ্ন পৌঁছে যাচ্ছে। প্রত্যাশিতভাবেই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পরিণাম হচ্ছে স্বপ্নভঙ্গজাত হতাশা আর হীনম্মন্যতা। এরই দৃশ্যমান উপসর্গ— সকলের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া, লুকিয়ে রাখা, আর অভিশপ্তের মত বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করা। সমাজ সম্পর্কে এক বিচিত্র অনীহা এদের গ্রাস করে নেয়।

২। সমাজবোধ ও নৈতিকতা ঃ মানুষের সমাজবোধই নৈতিকতার তথা সামাজিক মূল্যবোধের উৎস। সঙ্কীর্ণ

ব্যক্তিস্বার্থকে দূরে সরিয়ে মানুষ যদি সবল-দুর্বল সকলের অগ্রগতি সুনিশ্চিত করার তাগিদ অনুভব করে তবে একটি সংবেদনশীল সংহত সমাজ গঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। সামাজিক জীব হিসেবে কোন্ মনোভাব ও আচরণ সমষ্টির স্বার্থের অনুকূল সেই উপলব্ধিকেই বলা যায় মূল্যবোধ—মূল্যবান আচরণ সংক্রান্ত বোধ। একটি বিশেষ সমাজের কাঠামো মানুষে মানুষে সম্পর্কের প্রেক্ষাপট রচনা করে। এর ভিত্তিতে সেই সমাজের প্রাসঙ্গিক মূল্যবোধগুলি জন্ম নেয়। ব্যক্তি যদি নিজের স্বার্থ নিয়েই মগ্ন থাকে তাহলে সমষ্টির স্বার্থ লঙ্ঘিত হবে ; তাই নিঃস্বার্থপরতা একটি মূল্যবোধ। সবাই যদি সৎ থাকে তাহলে কারো ন্যায্য স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে না ; তাই সততা একটি মূল্যবোধ। সমাজের একাংশ যদি নিজেরা পরিশ্রম না করে অন্যের শ্রমের ফল আত্মসাৎ ক'রে জীবনধারণ করতে চায় তবে শ্রমকারী মানুষের স্বার্থ ব্যাহত হবে ; তাই শ্রমের মর্যাদা একটি মূল্যবান বিশ্বাস। কেবল পুরুষের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে নারীজাতিকে অবহেলা করলে সমাজের একাংশের প্রতি অবিচারই শুধু করা হয় না, সমাজের সুষম বিকাশও অসম্ভব হয়ে পড়ে। লিঙ্গসমতা, অতএব অন্যতম মূল্যবোধ। এইভাবেই সহিষ্ণুতা, সমানাধিকার, যুক্তিবাদিতা, অহিংসা প্রভৃতি প্রচলিত মূল্যবোধগুলির সঙ্গে আমরা পরিচিত। এই বাঞ্ছিত আচরণ সম্পর্কে কিছু সাধারণ নীতি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যেগুলিকে মেনে চলাই নৈতিকতা। মূল্যবোধ আর নৈতিকতা অনেকক্ষেত্রে সমার্থক শব্দ হিসাবে প্রযুক্ত হয়। ব্যক্তির নৈতিক মান-এর পরীক্ষা হয় যখন তার নিজের স্বার্থের সঙ্গে সমষ্টির স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

সভ্যতার সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের সমাজব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। এক একটি ব্যবস্থায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কেরও রূপান্তর ঘটেছে। সেই সঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে মূল্যবোধের চরিত্র। দাস সমাজের মূল্যবোধের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ মেলে না। পুঁজিবাদী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় বুর্জোয়া মূল্যবোধ। সমাজতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা অন্য চেহারা নেয়। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে এই নৈতিকতা ও আচরণবিধি মূলত শোষক শ্রেণির স্বার্থকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা ধর্মীয় অনুশাসন এবং রাষ্ট্রীয় আইনকানুন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। শোষণভিত্তিক কোনো সমাজ যখন অনিবার্য সঙ্কটের দিকে যায়, বৈষম্য-বঞ্চনা তীব্র আকার নেয়, তখন দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে নতুন চিন্তা-চেতনা-দর্শন বিকশিত হয়। গড়ে ওঠে নবতর নৈতিকতার ভিত্তি।

চলমান সমাজে একই সময়ে একাধিক মূল্যবোধের দ্বান্দ্বিক অবস্থানও বিরল নয়। শিক্ষার আলো ও অন্যবিধ উদ্ঘাটনের ফলে প্রচলিত প্রথাকে ভেঙে ফেলার মানসিকতা প্রস্তুত হয়। এই প্রবণতা অনেক ক্ষেত্রেই প্রগতির সূচক, কখনো হয়ত কায়েমী স্বার্থের চাপে প্রতিক্রিয়াশীল। বিয়ের সময় পাত্রপক্ষ পণের জন্য কন্যার পিতাকে হয়রান করবেন এটা প্রতিষ্ঠিত রীতি ছিল, এখনও তা ইতিহাস হয়ে যায় নি। এইরকম একটি সমাজে উন্নত চেতনাশীল কোনো পাত্র যদি বাবার নির্দেশ অগ্রাহ্য করে পণের হিসাব অস্বীকার করে বিয়ে করার স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করে, যুগের বিচারে সেই আচরণই অনৈতিক বলে গণ্য হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুপঠিত 'দেনাপাওনা' গল্পে এর একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। ছেলের বাবা ঘোষণা করে দিলেন, বরপণের পুরো টাকা হাতে না পেলে বর সভাস্থ করা যাবে না। ছেলে হঠাৎ বাবার অবাধ্য হয়ে বলে বসল, "কেনা-বেচা-দরদামের কথা আমি বুঝি না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি বিবাহ করিয়া যাইব।" মর্মাহত পিতার আক্ষেপ শুনে প্রবীণ লোকেরা বললেন, "শাস্ত্র শিক্ষা নীতিশিক্ষা একেবারেই নাই, কাজেই।"

উচ্চমান-এর মানবিক মূল্যবোধ সুস্থ সমাজ গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান। এই উপাদানের উৎপত্তিও হয় সমাজ থেকেই। তাই সমাজ যখন ভাঙে, মূল্যবোধের উৎস শুকিয়ে যায় ; একইসঙ্গে মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজকে দুর্বলতর করে। ক্রিয়াশীল হয় অবক্ষয়ের এক দুষ্টচক্র। এই আলোচনার প্রথমাংশে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে যে, বিশ্বায়নের আঘাতে মানুষের সমাজমনস্কতা হারিয়ে যাচ্ছে, বিধ্বস্ত হচ্ছে মূল্যবোধের ভিত। পৃথিবীর সব দেশেই মানুষের নৈতিকতার অধঃপতন নজিরবিহীন মাত্রা নিচ্ছে। এর অনেক নিদর্শনই আমাদের গোচরে আছে। অবক্ষয়ের দুষ্টচক্র অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। একে সুস্থচক্রে রূপান্তরিত করতে হলে কোনো এক জায়গায় ভেঙে বেরোতে হবে। সেটাই সমাজ বদলের প্রক্রিয়া। শোষণহীন সমাজ ছাড়া এই ক্রমপ্রসারমান ব্যাধির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়—একথা সম্প্রতি অনেক মহল থেকেই উচ্চারিত হচ্ছে।

৩। নৈতিকতা ও শিক্ষা ঃ সুস্থ সমাজের উপযুক্ত মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক তৈরী করা শিক্ষাব্যবস্থার স্বীকৃত লক্ষ্য। সুতরাং মূল্যবোধের এই গভীর সঙ্কটের জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করা হয়। বলা হয় শিক্ষা তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। সেই সঙ্গে আশা করা হয় শিক্ষাব্যবস্থাই এই অধোগতি রোধ করে সমাজের বুকে নির্মল নৈতিকতার

বাঞ্ছিত বাতাবরণ ফিরিয়ে আনবে। এই প্রত্যাশা উচ্চারিত হয়েছে ১৯৯৮ সালের অক্টোবর মাসে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা মহাসম্মেলনের মঞ্চ থেকে। এই কর্তব্য লিপিবদ্ধ হয়েছে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (এন সি ই আর টি) কর্তৃক ২০০০ সালে প্রকাশিত জাতীয় বিদ্যালয় পাঠক্রম সংক্রান্ত সুপারিশে।

চেতনা ও মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ মানুষ গড়ে তোলা যে শিক্ষার লক্ষ্য তা সর্বজনস্বীকৃত এবং বিতর্কাতীত। প্রথম দশ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষার সাধারণ পাঠক্রমে সমাজে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রগুলোতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, বোধ, দক্ষতা প্রভৃতি অর্জনের পথে ছাত্র-ছাত্রীদের এগিয়ে দেবার পর্যাপ্ত উপাদান আছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্তরে যে পাঠক্রম চালু রয়েছে তার ভিত্তি অধ্যক্ষ হিমাংশু বিমল মজুমদারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন। সেই মূল্যবান দলিলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে "............শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীল মনোভাব গঠনের এবং তদানুযায়ী নিজ জীবনচর্যায় অভ্যস্ত হওয়ার উপযুক্ত ভিত্তি স্থাপনই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য।" এই মূল লক্ষ্যের ভিত্তিতে আবার প্রাথমিক শিক্ষার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে যেগুলি তিনটি বিভাগে বিন্যস্তঃ (ক) জ্ঞানমূলক, (খ) দক্ষতা ও অভ্যাসমূলক এবং (গ) দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতা সংক্রান্ত। এই সাধারণ লক্ষ্য ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহকে অনুসরণ করে পাঠ্যবিষয় সমূহ ও আনুষঙ্গিক কর্মধারাকে সাজানো হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমের সাধারণ লক্ষ্য হিসেবেও বিবৃত হয়েছে 'ন্যায়ভিত্তিক সমাজের উপযুক্ত নাগরিক তৈরী করা, সৃজনশীলপূর্ণ মানুষ তৈরী করা।' পাঠ্যবিষয় সমূহের বিন্যাস লক্ষ্যানুসারী করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ে পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হয়েছে। সহ-পাঠক্রম কার্যক্রমও যথোচিত গুরুত্ব পেয়েছে। এই পরিকল্পিত পঠন-পাঠন ও কার্যধারা যদি সুচারু ও সম্পূর্ণরূপে অনুসৃত হয়, তবে মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যালয় শিক্ষার প্রচেষ্টা সম্পন্ন হবে। নীতিশিক্ষার জন্য কোনো স্বতন্ত্র বিষয় প্রবর্তনের প্রয়োজন নেই। বিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্যকলাপ—শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠনই হ'ক বা মাঠে খেলাধুলার চর্চা, সাংস্কৃতিক অনুশীলন, কিংবা বিতর্ক প্রতিযোগিতাই হ'ক—সব কিছুই মূল্যবোধ সঞ্চারের উপায়।

উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে পঠন-পাঠন ইত্যাদির ভেতর দিয়ে মূল্যবোধ সঞ্চারের অবকাশ অপেক্ষাকৃত কম। যে বয়সে তরুণ-তরুণীরা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তার মধ্যে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাদের মনোভাব মোটামুটি একটা আকার নিয়ে নেয়, চরিত্রের মূল উপাদানগুলি তৈরী হয়ে যায়। ভাল-মন্দ, সুস্থ-অসুস্থ নানা অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়ে তারা এই স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়। পাঠক্রম-পাঠ্যসূচির মাধ্যমে তাদের মধ্যে নতুন করে নৈতিকতা জাগিয়ে তোলার যেটুকু সুযোগ থাকতে পারত আজকের বাজারমুখী শিক্ষা তাকে নির্মূল করে দিয়েছে। শিক্ষা এখন মানুষ হবার মন্ত্র নয়, বাজারে সফল হবার যন্ত্র। অবশ্য উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে এসে শিক্ষার্থীরা একটি নতুন পরিবেশ পায় যেখানে তাদের সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রটি প্রশস্ততর হতে পারে। বিশিষ্ট শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব তাদের প্রভাবিত করতে পারে। সহপাঠী মহলের রুচি ও প্রবণতা অনুসারে তারা সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হতে পারে। কোনো কোনো গোষ্ঠী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে, কোনো মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই মেলামেশা ও মতবিনিময় ইতিবাচক মূল্যবোধ বিকাশে কতখানি ফলপ্রসূ হবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে ইতোপূর্বে তাদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের ভিত্তি ও অভিমুখ কীভাবে গড়ে উঠেছে তার ওপর। বিদ্যালয়স্তরে যদি সমাজবিমুখ, স্বার্থপর, ভোগবাদী মানসিকতা তৈরী হয়ে থাকে, তবে উত্তরপর্বে তার প্রভাব কাটিয়ে তোলা কঠিন কাজ। নিজ নিজ পরিমণ্ডল অনুযায়ী তাদের মূল ব্যক্তিত্বের কিছু প্রান্তিক পরিমার্জন হতে পারে। বিদ্যাঙ্গনের চার দেওয়ালের বাইরে সমাজমুখী গঠনমূলক কিছু কার্যক্রম যদি সার্থকভাবে সংগঠিত করা যায়, আংশিকভাবে সামাজিক দায়বদ্ধতাও আসতে পারে।

এই বিষয়ে বিদ্যালয় শিক্ষার ভূমিকা স্পষ্টতই অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পাঁচ থেকে পনেরো বছর বয়সকালই চরিত্রের মূলভিত্তি গড়ে দেবার উপযুক্ত সময়। কিন্তু এই অতীব দুরূহ দায়িত্বপালনে বিদ্যালয়ের প্রভাব নিরঙ্কুশ নয়। পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে, কমিটি-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পাঠক্রম-পাঠ্যসূচিকে নতুনভাবে সাজিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাপকরা যা করতে চান সার্থকভাবে তার সবটুকু ক'রে ওঠা তাদের সাধ্যের বাইরে। অবক্ষয়ী সমাজে সামগ্রিক পরিবেশ মূল্যবোধ গড়ে তোলার আদৌ সহায়ক নয়। প্রতিকূল শক্তিগুলি ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠছে, বিপরীত স্রোতকে রোধ করা যাচ্ছে না। বিদ্যালয়গুলি এই পরিস্থিতির বাইরে অবস্থান করে না।

স্বভাবতই সমাজের যাবতীয় ত্রুটি-দুর্বলতা, গ্লানি ও কলুষ থেকে ঐ প্রতিষ্ঠানও মুক্ত নয়। অতএব বিদ্যালয়ের পক্ষে এত বাধা অতিক্রম করে নৈতিকতায় সমৃদ্ধ প্রজন্ম গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব কাজ। তবু আশা করা যায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষকসমাজ এবং শিক্ষাব্যবস্থাপকরা পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না। সীমাবদ্ধ সুযোগের মধ্যে যতখানি সম্ভব আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন এবং তার মধ্যদিয়েই মৌলিক পরিবর্তনের পথ খুঁজে পাবেন।

এই প্রচেষ্টার অভিমুখ নির্ধারিত হবে পাঠ্য-বিষয়ের লক্ষ্যসমূহের দ্বারা। মাধ্যমিক স্তরের সব আবশ্যিক পাঠ্য-বিষয়ের কিছু লক্ষ্য উল্লিখিত আছে। এর সবগুলিই দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তোলার সাধারণ লক্ষ্যের অনুসারী ; বিষয়-বিশেষজ্ঞতার ভিত্তি স্থাপনের জন্য নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় আবশ্যিক গণিতের পাঠ সকল ছাত্র-ছাত্রীকে ঐ বিষয়ে পণ্ডিত করে তোলার জন্য নির্দিষ্ট হয় নি ; দৈনন্দিন জীবনের গাণিতিক সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিসম্মত চিন্তার অভ্যাস, সিদ্ধান্ত নেবার উপযুক্ত সুশৃঙ্খল মানসিকতা ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা তৈরী করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি সব বিষয়েই মূল্যবোধ সংক্রান্ত কিছু উপাদান আছে। তবে নিঃসন্দেহে এই সুযোগ সবচেয়ে বেশী আছে সাহিত্যপত্রে। একটি সার্থক গল্প, কোনো মর্মস্পর্শী নাটক বা মরমী কবিতার বার্তা তরুণ মনে স্থায়ী ও গভীর ছাপ ফেলতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্পে নিরুপমার জীবনদীপ নিভে যাওয়া, শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে গফুরের শেষ প্রার্থনা, 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় জমিদারের অন্যায় লোভের ফলে অসহায় উপেনের ভিটেছাড়া হওয়া— এগুলি সামাজিক অবিচার সম্বন্ধে যে উপলব্ধি জাগিয়ে তোলে কোনো তাত্ত্বিক আলোচনা সেই ফল দিতে পারে না। সাহিত্যের সুপরিকল্পিত পঠন-পাঠন কিছু মানবিক অনুভূতি, কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা এনে দিতে পারে। শ্রেণিকক্ষে সব বিষয়ের উপস্থাপনে এবং সর্বস্তরের মূল্যায়নে মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যকে প্রাধান্য দিতে হবে। আক্ষরিক অর্থে সিলেবাস শেষ করা বা পরীক্ষায় প্রচুর নম্বর জোগাড় করা শিক্ষায় সার্থকতার চিহ্ন নয়, যদিও বাজার-শাসিত সমাজের সেটাই চাহিদা।

শ্রেণিকক্ষের বাইরে সহ-পাঠক্রমিক কর্মধারাও তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রক্রিয়ায় কম প্রয়োজনীয় নয়। মাঠে সমবেতভাবে খেলাধূলার চর্চা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্যচর্চা, বিতর্কের আসরে যুক্তিবিচার, বিবিধ চারুকলার অনুশীলন—প্রকৃতপক্ষে এগুলির কোনো বিকল্প নেই। মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক ভ্রমণ এবং শিবির জীবনের আয়োজন করলে শিক্ষার্থীদের মানসিকতায় উল্লেখযোগ্য মাত্রা যোগ হয়। আজকের পটভূমিকায় দেলর কমিশনের যে সুপারিশটি সবচেয়ে বেশী প্রাসঙ্গিক তা হল যৌথভাবে বাঁচতে শেখা। (Learning to live together)। সমবেত ভ্রমণ ও শিবিরের অভিজ্ঞতা মানুষ হয়ে ওঠার পথে এক অমূল্য পাথেয়। সার্বিক শিক্ষার আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল পাঠ্যসূচির বাইরে স্বাধীনভাবে নানাবিধ বিষয়ের বই পড়া। সমাজকে চেনার জন্য, জীবনের সমস্যা, সম্ভাবনা, সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতির স্বাদ পাবার জন্য, মানসিক পরিণমনের স্বার্থে সৎ সাহিত্যপাঠ একান্ত প্রয়োজন। আজকের দিনে পরীক্ষার তাড়নায় এবং আধুনিক বিনোদনের অমোঘ আকর্ষণে কিশোর-কিশোরীদের মুক্তপাঠের অভ্যাস লক্ষণীয়ভাবে কমে যাচ্ছে। পাঠ্যের বাইরের বই পড়ার মূল্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি আমাদের চোখ খুলে দেয়। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে এই প্রশ্নটিকে বিশ্লেষণ করে তিনি মন্তব্য করেছেন, "অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীনপাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না।"

বাস্তবে অবশ্য অনেক স্কুলের পক্ষেই মূলত সঙ্গতির অভাবে এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া সম্ভব হয় না। স্কুলের এই সীমাবদ্ধতার কথা মুদালিয়র কমিশনও তাদের প্রতিবেদনে (১৯৫২) উল্লেখ করেছিলেন। এই অভাব মেটাবার উদ্দেশ্যে কমিশন স্কুলের সঙ্গে সামাজিক সংগঠনের সংযুক্তি ঘটানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমাদের রাজ্যে শিশু-কিশোরদের সার্বিক কল্যাণসাধনে ব্রতী বেশ কয়েকটি ঐতিহ্যসম্পন্ন নির্ভরযোগ্য সংগঠন আছে। সারা বছর শরীরচর্চা, সাহিত্য চর্চা, বই পড়া, সাধারণ জ্ঞান, পরিবেশ ও বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষ, নাচ-গান-অভিনয় প্রভৃতি নিয়মিত কার্যধারার মধ্যদিয়ে এই স্বেচ্ছাসেবামূলক সংস্থাগুলি আগামী প্রজন্মকে সুনাগরিক করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। ব্রতচারীর 'পণ-মানা' ; সব পেয়েছির আসর-এর 'সঙ্কল্প বাক্য', 'স্কাউটকার'— এদের অঙ্গীকারসমূহ অনুধাবন করলে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে এদের লক্ষ্যের অভিন্নতা স্পষ্ট বোঝা যায়। এদের আয়োজিত শিবিরে দেশের বিভিন্ন অংশের ছেলেমেয়েরা কঠোর শৃঙ্খলা এবং গভীর আনন্দের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেয়। কোনো কোনো সংগঠনের শিবিরে অন্য রাষ্ট্র থেকেও ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করতে আসে। এই অভিজ্ঞতা তাদের অন্তরকে নাড়া দেয়, সংবেদনশীল করে তোলে। যৌথ

জীবনযাপনের মন্ত্রে তারা উজ্জীবিত হয়। এই কর্মসূচি প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয় শিক্ষার পরিপূরক আয়োজন বলে গণ্য হবার দাবী রাখে। এ ধরনের সংগঠনগুলিকে স্বীকৃতি দিয়ে যদি বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায় তাহলে একটি বড় অপূর্ণতা ঘোচানো যেতে পারে।

নৈতিকতা ও ধর্মশিক্ষা ঃ মূল্যবোধ সঞ্চারের বিবিধ উপায়ের মধ্যে ধর্মসংক্রান্ত শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব এনে এন সি ই আর টি (নভেম্বর, ২০০০) দেশব্যাপী তীব্র বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষ দেশে রাষ্ট্র-পোষিত শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মশিক্ষার আয়োজন স্পষ্টতই অযৌক্তিক। আপাতত সে প্রশ্ন সরিয়ে রাখলেও জ্ঞানের জগৎ ও ধর্মের রাজ্যের মধ্যে মৌলিক বিরোধের সম্পর্কটা তো মনে রাখতেই হবে। জ্ঞান সতত অগ্রসারী। জগৎ, জীবন, সভ্যতা, সংস্কৃতির সঙ্গেই জ্ঞানের বিকাশ ঘটে, তার দিগন্ত প্রসারিত হতে থাকে। আজ যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হল আগামীকাল থেকেই তা প্রশ্নের সামনে দাঁড়াবে। চলবে বিচার-বিশ্লেষণ, নিরন্তর গবেষণা। সৃষ্ট হবে নিত্য নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞান যা মানুষের জীবনকে আরো এগিয়ে দেবে। কিন্তু ধর্মের রাজ্যে প্রশ্নের দ্বার রুদ্ধ, যুক্তি বিচার নিষিদ্ধ। মানুষের বিবেচনা শক্তিকে বন্ধক দিতে হবে বিশ্বাসের পায়ে। নতুন পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে কোনো নতুন পথের দিশা ধর্ম দেখাতে পারে না। সে স্থানু নিশ্চল। তাই ইতিহাসে বারে বারে যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিস্কার আর উদ্ভাবনের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ বেঁধেছে। যুক্তিবাদীদের শাস্তি পেতে হয়েছে ধর্মশাস্ত্রের বিচারে। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে ধর্মশিক্ষার এই সম্পর্কের দিকে রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন নানাভাবে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে 'ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "..............একদিন যে-ধর্মসম্প্রদায় দেশের বিদ্যাকে পালন করিয়া আসিয়াছে পরে তাহারাই সে বিদ্যাকে বাধা দিবার সর্বপ্রধান হেতু হইয়া উঠিল। কারণ, বিদ্যা যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকে ততই সে প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের সনাতন সীমাকে চারিদিকেই অতিক্রম করিতে উদ্যত হয়। শুধু যে বিশ্বতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্বন্ধেই সে ধর্মশাস্ত্রের বেড়া ভাঙিতে বসে তাহা নহে, মানুষের চারিত্রনীতিগত নূতন উপলব্ধির সঙ্গেও প্রাচীন শাস্ত্রানুশাসনের আগাগোড়া মিল থাকে না।

এমন অবস্থায় হয় ধর্মশাস্ত্রকে নিজের ভ্রান্তি কবুল করিতে হয়, নয় বিদ্রোহী বিদ্যা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে ; উভয়ের এক অন্নে থাকা আর সম্ভবপর হয় না।"

তবে এন সি ই আর টি'র ধর্মসংক্রান্ত শিক্ষার প্রস্তাবে কিছু অস্বাভাবিকতা আছে। একটি অংশে বলা হয়েছে, 'সব ধর্মের দর্শনসমূহের তুলনামূলক চর্চা' করতে হবে। ('..........a comparative study of the philosophy of all religions') অর্থাৎ পড়ুয়াদের মগজে ঢোকাতে হবে ধর্মে নিহিত দর্শন শুধু নয়, সব দর্শনের তুলনা! এবং সেই প্রক্রিয়া শুরু হবে প্রাথমিক স্তরে। এমন উর্বর মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে সংশয় জাগা স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, এই পাঠ অনুসরণের জন্য কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি বা পাঠোপকরণ, এমনকি রূপরেখাও থাকবে না। শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁদের নিজ নিজ ধ্যানধারণা বিশ্বাস অনুযায়ী পাঠ দেবেন। এই চিন্তার পেছনে কোন্ রাজনৈতিক শক্তি ছিল আমরা জানি, অভিসন্ধিও অজানা নয়। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হ'লে স্কুলে স্কুলে গুজরাটের নমুনা আর আগামী প্রজন্মে বেশ কিছু আধুনিক কালের নীরোর জন্ম দেওয়া যেত!

অবক্ষয়ের দুষ্টচক্র ভেঙে নতুন সমাজ, নতুন জীবনবোধ জেগে উঠুক আমাদের শিক্ষাঙ্গনের ঐকান্তিক সাধনায়।

পাঠকের কলমে

আমি ঠিক করেছি, অবসরের পরেও শিক্ষা ও সাহিত্য-র ব্যক্তিগত গ্রাহক হব। কারণ, এতে এমন কিছু প্রবন্ধ, গদ্য প্রকাশিত হয়, যা সাধারণত অন্য বাণিজ্যিক, অবাণিজ্যিক এমনকি লিট্ল ম্যাগাজিনেও প্রকাশিত হয় না। Pragmatism-এর ওপর, বিজ্ঞানের ওপর ও পাব্‌লো নেরুদার ওপর প্রবন্ধগুলিতো আমি অন্য কোথাও পাব না। অসাধারণ সম্পাদন। অভিনন্দন রইল। শ্রদ্ধা, প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে।

নারায়ণ ঘোষ

শিক্ষক, মণীন্দ্রনগর হাইস্কুল/মুর্শিদাবাদ

বাংলা ব্যাকরণের তিনটি পরিভাষা ঃ অব্যয়, অব্যয়ীভাব ও পুরুষ

নির্মল দাশ

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ২০০৩ সালে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য এবং ২০০৪ সালে নবম-দশম শ্রেণির জন্য প্রথম ভাষা বাংলার সিলেবাস প্রকাশ করেছে। এই সিলেবাসে বাংলার অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ব্যাকরণের পাঠ্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই সিলেবাস প্রকাশিত হবার পর শিক্ষামহলে নানা প্রশ্ন উঠেছে। বিতর্ক সবচেয়ে ঘনীভূত হয়েছে ব্যাকরণের পাঠ্যক্রম নিয়ে। কারণ ব্যাকরণের নতুন পাঠ্যক্রমে একদিকে যেমন ব্যাকরণ রচনার পদ্ধতি পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (চিরাচরিত অবরোহী পদ্ধতির বদলে আরোহী পদ্ধতি), অন্যদিকে তেমনি ব্যাকরণের কিছু কিছু প্রথাগত পরিভাষা ও প্রসঙ্গ বর্জন করে নতুন পরিভাষা ও প্রসঙ্গ প্রবর্তন করা হয়েছে। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে ব্যাঘাত ঘটলে আপত্তি ওঠা অস্বাভাবিক নয়। তবে প্রশ্ন হচ্ছে এই আপত্তি কতটা যুক্তিযুক্ত এবং বর্জন-পরিবর্তন যা করা হয়েছে তা-ই বা কতটা যুক্তিপূর্ণ ?

এইসব প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। তবে এখানে শুধু দুটি-তিনটি প্রশ্নাধীন বিষয়কেই বেছে নেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট বিষয়গুলি ভিন্ন অবকাশে উত্থাপন করা যাবে।

মূল বিষয়ে যাবার আগে দেখা দরকার এই পরিবর্তন সম্পর্কে পর্ষদের কোনো ব্যাখ্যা আছে কিনা। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ২০০৩ সালে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য ব্যাকরণের যে সিলেবাস প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায় 'বাংলা ব্যাকরণের নতুন পাঠ্যক্রম সম্পর্কে কয়েকটি কথা' শিরোনামে একটি দুই পৃষ্ঠা (১২-১৩)র ভূমিকা আছে। এই ভূমিকায় ব্যাকরণের নতুন পাঠ্যক্রম সম্পর্কে পর্ষদের দিক থেকে কিছু বক্তব্য রাখা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে ঃ

> স্কুলের বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ব্যাকরণ একটি নীরস ও দুরূহ পাঠ্যবিষয়। অথচ এমনটা হবার কথা নয়। কারণ বাংলা ব্যাকরণে যা পড়ানো হয় তা তো তার মাতৃভাষা, যার ব্যবহার সে ব্যাকরণ পড়ার আগেই শুরু করে।.....তাহলে চেনা জিনিসকে এক দুরূহ ও কষ্টকর মনে করার কারণ কী ? এর প্রধান কারণ, ব্যাকরণের বিষয়বিন্যাসে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার অভাব, পড়ানোর বিষয় ও পদ্ধতিতে অনাবশ্যকভাবে সংস্কৃত ভাষার উপযোগী প্রসঙ্গ ও পরিভাষার অবতারণা এবং তদুপরি সংজ্ঞা, সূত্র, আলোচনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য, অপ্রচলিত ও অপরিচিত ভাষারীতির ব্যবহার। এই জন্য ব্যাকরণের পাঠ্যক্রম সংস্কার করতে গিয়ে জোর দেওয়া হয়েছে ব্যাকরণ-পাঠের স্বচ্ছন্দতার উপর। এ জন্য পাঠ্যতালিকা থেকে বহু অপ্রয়োজনীয় অথচ বহুকাল-প্রচলিত বিষয় বাদ দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানের আধুনিকতত্ত্বের ভিত্তিতে পুরোনো ধারণার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পুরোনো দুর্বোধ্য পরিভাষা বর্জন করে নতুন, সহজ ও স্বচ্ছতর পরিভাষা চালু করা হয়েছে। (পৃঃ ১২)

পর্ষদের এই ব্যাখ্যা সত্ত্বেও এখানে আর একটি প্রশ্ন অনিবার্যভাবে এসে পড়ে : তাহলে এতদিন যা চলছিল তাতে কি কোনো কাজ হয় নি ? পড়াশুনা তো মাথা খাটিয়ে কষ্ট করেই করতে হয়। আমাদের দেশে তো এ ব্যাপারে একটা কথা বহুদিন ধরে চলে আসছে : ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ — ছাত্রদের পক্ষে তাদের পড়াশুনাই তাদের তপস্যা। আর তপস্যার মন্ত্র তো দুর্বোধ্য ও দুরূহই হয়ে থাকে। তাকে সরল করার চেষ্টা আসলে তাকে তরল করার অপচেষ্টা নয় কি ? এতে তো পড়াশুনার সাত্ত্বিক গৌরবটাই নষ্ট হবার আশঙ্কা। — কথাটা হয়তো একদিক থেকে ঠিক, কিন্তু তা একটা সীমা ও সময় পর্যন্ত ঠিক, তারপরে আর নয়। কথাটা কতদিন ও কোন্ সীমা পর্যন্ত ঠিক — এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, শিক্ষায় যতদিন সমাজের একটা সংখ্যালঘু অথচ প্রভাবশালী অংশের অধিকারই স্বীকৃত থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই কথা সমাজের ওই অংশের সীমার মধ্যে ঠিক বলে বিবেচিত হবে। শিক্ষার এই শ্রেণিনির্ভর একচেটিয়া অবস্থা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজব্যবস্থায় তো ছিলই, এদেশে ইংরেজদের শাসনকালে তাদের আনা মানবতাবাদের প্রচার ও প্রসারের পরেও দেশে

এই অবস্থার পরিবর্তন হয় নি। স্বাধীনতার পরেও এ অবস্থার কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয় নি, কারণ ইংরেজরা চলে গেলেও তাদের ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার আমরা বহন করে চলেছি স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পরেও, যদিও সংবিধানে স্বাধীনতার দশ বছরের মধ্যে শিক্ষার অধিকার সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ঠিক এই সময়ে অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় দেশের সমাজব্যবস্থায় কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয় নি একথা ঠিক। কিন্তু গত বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক জুড়ে দেশে যে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন চলেছিল তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া হয়েছে সুদূরপ্রসারী। সাক্ষরতা আন্দোলনের সাফল্যের মাত্রা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু সত্যের খাতিরে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই আন্দোলন শিক্ষাকে শ্রেণিবিশেষের একচেটিয়া অধিকারের জায়গা থেকে মুক্ত করতে পেরেছে। সমাজের নিরন্ন নিরক্ষর পরিবারেও এখন শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। নিজেরা শিক্ষার সুযোগ না পেলেও ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পাক — এটাই এখনকার অর্থাৎ একবিংশ শতকের সূচনাপর্বের অন্যতম সামাজিক অভিপ্রায়। তাই স্কুলে ভর্তির সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্কুল ছেড়ে দেওয়ার সমস্যা পাশাপাশি থাকলেও এখন প্রতিবছর যে ৫/৬ লক্ষ ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিরক্ষর দম্পতির সন্তান অর্থাৎ প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া। এদের সাফল্য ও সাফল্যোত্তর আশা-নিরাশার খবর তো এখন গণমাধ্যমগুলির চর্চার অন্যতম প্রধান প্রসঙ্গ। এই ছেলেমেয়েদের কাছে শিক্ষা কোনো আত্মকেন্দ্রিক সমাজবিচ্ছিন্ন 'তপশ্চর্যা' নয়, শিক্ষা তাদের কাছে জীবনসংগ্রামের প্রস্তুতি, বই তাদের কাছে সংগ্রামের হাতিয়ার। এটা শুধু এইসব প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়াদেরই দৃষ্টিভঙ্গি নয়, উন্নয়নমুখী ভারতের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর কাছে শিক্ষা এখন পৌরাণিক তপস্যা নয়, শ্রেণিবিভক্ত সমাজের কঠোর বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এক সমাজসচেতন আধুনিক লড়াইয়ের অঙ্গ, যে লড়াইয়ে জয়ী হতে পারলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই মানোন্নয়ন হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এখন শিক্ষাভাবনা, শিক্ষাপরিকল্পনা, শিক্ষাপরিচালনা, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যক্রমের বিন্যাসের ক্ষেত্রে নানা সময়োপযোগী পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে। শিক্ষাকে তাই এখন মোটামুটি দুটি স্তরে ভাগ করা হয় : প্রারম্ভিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা — এর সঙ্গে সহযোগী হিসাবে আছে বৃত্তিশিক্ষা। প্রারম্ভিক শিক্ষার শুরু শিশুশ্রেণি থেকে, শেষ মাধ্যমিক স্তরে ; আর উচ্চশিক্ষার শুরু উচ্চমাধ্যমিক স্তর থেকে, আর শেষ (শেষ না বলে পরিণতি বলাই বোধ হয় ভালো) স্নাতকোত্তর স্তরের পরবর্তী নানা স্বীকৃত গবেষণাকর্মে। উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষার নানা পর্যায়ে বিষয়গত ও পদ্ধতিগত প্রয়োজনে তার ভাষা ও পরিভাষা স্বচ্ছ ও সর্বজনবোধ্য না হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু প্রারম্ভিক স্তরে তো শিক্ষার সবটাই ভূমিকাধর্মী, এখানে শ্রেণিনির্বিশেষে শিক্ষিত ও নিরক্ষর পরিবারের ছেলেমেয়েরা একযোগে পরবর্তী উচ্চশিক্ষার ও বৃত্তিশিক্ষার উন্নততর স্তরে যাওয়ার উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিকভাবে নানা বিষয়ে কিছু সাধারণ জ্ঞান অর্জন করে। এই স্তরের শিক্ষার বিষয়ের মধ্যে যেমন একটা সর্বব্যাপিতা আছে, তেমনি এই শিক্ষার পদ্ধতির মধ্যেও একটা সর্বত্রগামিতার লক্ষ্য নিহিত থাকে। তাই এই স্তরের শিক্ষার ভাষা ও পরিভাষাতেও একটা সর্বাঙ্গীণ স্বচ্ছতা ও সর্বজনীন সহজবোধ্যতা অনেক বেশি পরিমাণে কাম্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যদি বাংলা ব্যাকরণের নতুন পাঠ্যক্রমে 'সংজ্ঞা, সূত্র, আলোচনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য, অপ্রচলিত ও অপরিচিত ভাষারীতির ব্যবহার' বর্জন করে 'ব্যাকরণপাঠের স্বচ্ছন্দতার উপর' জোর দেয় এবং 'অনেকক্ষেত্রে পুরানো দুর্বোধ্য পরিভাষা বর্জন করে নতুন, সহজ ও স্বচ্ছতর পরিভাষা চালু' করে তবে তাতে আপত্তি করার বদলে তাকে অভিনন্দন জানানোই হবে সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচায়ক।

।।২।।

আগেই বলা হয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ব্যাকরণের পাঠ্যক্রম নিয়ে যা বিতর্ক উঠেছে তার দু'তিনটি প্রশ্নাধীন বিষয়ই এই প্রবন্ধের বিবেচ্য। দু'তিনটির মধ্যে এই পরিচ্ছেদে 'অব্যয়' আর 'অব্যয়ীভাব' নিয়ে আলোচনা করা যাক।

পর্ষদের ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণের পাঠ্যক্রমে ৩(ক) অংশের নির্দেশিকায় 'শব্দের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগে' শ্রেণিনাম হিসাবে 'বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া (সমাপিকা ও অসমাপিকা), ক্রিয়াবিশেষণ, সংযোজক, আবেগসূচক ও আলঙ্কারিক' শব্দগুলি উল্লিখিত হয়েছে। এখানে লক্ষ করতে হবে শ্রেণিনামের তালিকায় প্রচলিত অন্য নামগুলি থাকলেও 'অব্যয়' নামটি অনুপস্থিত, এবং তিনটি নতুন নাম (সংযোজক, আবেগসূচক ও আলঙ্কারিক) সংযোজিত। পাঠ্যক্রমে 'অব্যয়' শব্দ বর্জন ও শব্দের শ্রেণিনাম হিসাবে তিনটি নতুন শব্দের সংযোজনের কারণ হিসাবে পাঠ্যক্রমের ২৫-২৭ পৃষ্ঠায় (টীকা নির্দেশ ৩) দীর্ঘ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে :

> যেসব শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি হয় বাক্যের অর্থপ্রকাশের ব্যাপারে তাদের সকলেরই সক্রিয়

ভূমিকা (function) থাকে। এই সক্রিয়তার ভিত্তিতেই ব্যাকরণে শব্দের শ্রেণিনাম দেওয়া হয়েছে : বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়া, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ। এই সঙ্গে সংস্কৃত ও সংস্কৃতানুসারী প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে শব্দের আর একটি শ্রেণিনাম দেওয়া হয়েছে 'অব্যয়'।....সংস্কৃত ব্যাকরণে বাক্যের যেসব শব্দের কোনো 'ব্যয়' বা রূপান্তর হয় না তাকেই 'অব্যয়' পদ বলা হয়।....'অব্যয়' শব্দে সংশ্লিষ্ট শব্দের রূপের একটা পরিচয় পাওয়া গেলেও তার ক্রিয়াকর্মের পরিচয় পাওয়া যায় না। অথচ প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে যেসব শব্দকে সচরাচর 'অব্যয়' বলা হয় প্রয়োগে তাদের সক্রিয়তা সুস্পষ্ট। প্রচলিত ব্যাকরণের উদাহরণ অনুসারে 'এবং, ও, আর, যদি, কিন্তু, বরং, নচেৎ' ইত্যাদি এবং 'আহা মরি মরি', 'বাঃ', 'ইস' ইত্যাদি এবং 'খাও না'/ 'যাও না' বাক্যের 'না' ও 'তুমি তো যাবে' বাক্যের 'তো' ইত্যাদি অব্যয়। এই শব্দগুলির রূপান্তর হয় না ঠিকই, কিন্তু শব্দগুলির ভূমিকাগত (functional) পরিচয় তাদের রূপান্তরহীনতার বদলে বাক্যগঠন ও বাক্যের অর্থপ্রকাশে তারা যে ভূমিকা নেয় তার মধ্যে নিহিত। শব্দের অন্য শ্রেণিগুলির নামকরণে যখন তাদের রূপগত অবস্থানের বদলে ভূমিকাগত পরিচয়কেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তখন এই তিন শ্রেণির শব্দের নামকরণের ক্ষেত্রে তাদের রূপগত অবস্থানের উপর নির্ভর করার যুক্তি কী? এখানেও তো শব্দগুলির ভূমিকাগত অবস্থানের দিক থেকে নামকরণ সম্ভব 'অব্যয়'-এর মতো অকেজো ও অবান্তর পরিভাষা বাদ দিয়ে। পূর্বোক্ত শব্দগুলির.... মাধ্যমে.... বাক্যের অর্থে একটা.... মাত্রা যুক্ত হয়। এইসব শব্দ ব্যবহার না করলে সে মাত্রায় পৌঁছানো যায় না। কাজেই এদের গায়ে 'অব্যয়'-এর মতো একটি নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় নামের ছাপ এঁকে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। তার বদলে এদের যথাক্রমে 'সংযোজক', 'আবেগসূচক' ও 'আলঙ্কারিক' আখ্যা দিলে বাক্যে এদের ভূমিকা চিনে নেওয়া সহজ হয়। এইসব যুক্তির ভিত্তিতে শব্দ তথা পদের শ্রেণিবিভাগে 'অব্যয়'-এর ধারণা ও অন্তর্ভুক্তি বর্জন করা হল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে 'শব্দ বা পদের শ্রেণিবিভাগে অব্যয়-এর ধারণা ও অন্তর্ভুক্তি বর্জন' করার ব্যাপারে পর্ষদ যে যুক্তি দিয়েছে তা কতটা যুক্তিযুক্ত? এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় বাংলা শব্দের শ্রেণিবিভাগে 'অব্যয়' শব্দটির ব্যবহার কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদেরও অনেক আগে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে (১৩০৮/১৯০১) প্রশ্ন তুলেছিলেন। এই প্রবন্ধে শাস্ত্রী বলেছিলেন :

> তাঁহাদের (সংস্কৃত ব্যাকরণকারদের) সংস্কার 'নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত' — বিভক্তিযুক্ত না হইলে ধাতু ও শব্দ শাস্ত্রে প্রয়োগ করা যায় না; সুতরাং ধাতুর উত্তর তিবাদি বিভক্তি এবং সর্বপ্রকার শব্দের উত্তর সুবাদি বিভক্তি হয়, এই তাঁহাদের ব্যবস্থা; তাঁহারা অব্যয়ের উত্তর বিভক্তি করিয়া লোপ করিবেন; কিন্তু বিনা বিভক্তিতে শব্দ প্রয়োগ করিতে পারা যায়, ইহা কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন না। কিন্তু বাঙ্গালা ব্যাকরণকারেরা বলিলেন, অব্যয়ের উত্তর বিভক্তি হয় না। সুবুদ্ধি বালক যদি জিজ্ঞাসা করে, 'রাম রাবণকে মারিলেন', 'কেশব আম খাইলেন', — এসকল স্থানে 'রাম', 'কেশব' ও 'আম' কেন অব্যয় শব্দ হইবে না, তাহা হইলেই ব্যাকরণকারেরা অবাক।

শাস্ত্রীর এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় বাংলা শব্দের পদবিচারে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম সর্বাংশে প্রয়োজ্য নয়। এ নিয়ে স্বতন্ত্র বিচার-বিবেচনার অবকাশ আছে। বস্তুত বাংলা ব্যাকরণে পদনাম হিসাবে যেসব শব্দের প্রচলন আছে, তার সবগুলিই সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে ধার করা হয়েছে এবং দেখা যায় 'অব্যয়' বাদে অন্য পদনামগুলির প্রয়োগ সার্থক, কারণ পদের এইসব নামের মধ্যেই বাক্যে সংশ্লিষ্ট শব্দ/পদটি কী কাজ করে তার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন,

বিশেষ্য : 'বিশেষ্য' শব্দের মূল অর্থ যাকে বিশেষিত (particularise) করা হয়। সুতরাং বিশেষ্য = to be particularised। বাক্যের যেসব শব্দে কোনো বস্তু, প্রাণী, ভাব ইত্যাদিকে বিশেষিত বা নির্দিষ্ট করা হয় সেগুলি বিশেষ্য। সুতরাং 'বিশেষ্য' পদনামে এই ধরনের শব্দের ভূমিকা সুপরিস্ফুট।

সর্বনাম : বিভিন্ন সংস্কৃত ব্যাকরণকার ও ভাষ্যকার 'সর্বনাম' শব্দটির নানা অর্থ করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য অর্থ বা তাৎপর্য হচ্ছে : 'সর্বেষাং যন্নাম তৎ সর্বনাম' (মহাভাষ্য ১.১.২৭) অর্থাৎ যা সার্বিক নাম (universal naming) তা-ই সর্বনাম। অর্থাৎ সর্বনামও একটি নামপদ, কিন্তু এই নামপদ 'বিশেষ্য' নয় এই কারণে যে এই পদের দ্বারা কোনো ব্যক্তি/প্রাণী/বস্তু/ভাবকে বিশেষিত (particularise) করা হয় না, এই পদের দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রাণী/বস্তু/ভাবকে বিশেষিত করার

বদলে ওই শ্রেণির সব ব্যক্তি/প্রাণী/বস্তু/ভাবকে সার্বিক বা নির্বিশেষভাবে বোঝায়। যেমন, যদি প্রসঙ্গহীনভাবে 'সে' শব্দ ব্যবহার করা যায় তবে তাতে কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে বোঝাবে না, বোঝাবে লিঙ্গ-বয়স-নির্বিশেষে যে-কোনো ব্যক্তি। তেমনি 'আমি' বা 'তুমি' শব্দ ব্যবহার করলে নির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তিকে বোঝাবে না। 'আমি' বলতে বোঝাবে লিঙ্গ-বয়স-নির্বিশেষে যে-কোনো বক্তা এবং 'তুমি' বলতে বোঝাবে লিঙ্গ-বয়স-নির্বিশেষে যে-কোনো শ্রোতা। একইভাবে 'এটা', 'ওটা', 'ইহা', 'উহা' ইত্যাদি শব্দে নির্দিষ্ট কোনো কিছুকে বোঝাবে না, বোঝাবে যে-কোনো মনুষ্যেতর প্রাণী, যে-কোনো বস্তু বা ভাব। সুতরাং সর্বনাম হচ্ছে বিশেষের বদলে নির্বিশেষের সার্বিক সংজ্ঞা (universal connotation)। তাই বাক্যে পদের ভূমিকা নির্ধারণের দিক থেকে 'সর্বনাম শব্দটি পদনাম হিসাবে অর্থবহ ও যুক্তিযুক্ত।

ক্রিয়া ঃ 'ক্রিয়া' শব্দটির সাধারণ অর্থ কাজ। বাক্যের যে শব্দে কোনো কিছু করা বা হওয়ার কাজ বোঝায় তাকে বলা হয় ক্রিয়াপদ। সুতরাং পদনাম হিসাবে 'ক্রিয়া' শব্দটির প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত।

বিশেষণ ঃ 'বিশেষণ' শব্দটির মূল অর্থ বিশেষিত করার কাজ। বিশেষিত করার কাজটা করা হয় কোনো বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। বাক্যের যে শব্দে কোনো বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয় তাকে বলা হয় বিশেষণ। সুতরাং 'বিশেষণ' শব্দটিও পদনাম হিসাবে সার্থক।

ক্রিয়াবিশেষণ ঃ বিশেষণ যেহেতু বৈশিষ্ট্যসূচক পদ, সেজন্য 'ক্রিয়াবিশেষণ' ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য বা ধরন বোঝায় এমন পদ। সুতরাং বাক্যে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়ার ধরন বোঝানোর দিক থেকে 'ক্রিয়াবিশেষণ' পদনামটি যুক্তিযুক্ত।

অব্যয় ঃ 'অব্যয়' শব্দের মূল অর্থ যার 'ব্যয়' নেই। সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষায় 'ব্যয়' = পরিবর্তন। এদিক থেকে ব্যাকরণের পরিভাষায় বাক্যে যে পদের 'ব্যয়' বা রূপপরিবর্তন হয় না তাকেই বলে অব্যয়। কিন্তু 'অব্যয়ে'র এই সংজ্ঞায় এই শ্রেণির পদের একটা রূপগত পরিচয় পাওয়া গেলেও বাক্যে এর কাজ কী তা ধরা পড়ে না। তাই 'পদনাম' হিসাবে 'অব্যয়' শব্দটি অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ। এছাড়া, অন্য আর একদিক থেকেও পদনাম হিসাবে বাংলায় 'অব্যয়' শব্দটির ব্যবহার কতদূর যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার দরকার আছে। কারণ সংস্কৃতে যেসব শব্দ 'অব্যয়' হিসাবে চিহ্নিত, রূপান্তর হয় না বলে সেগুলি স্থায়ীভাবে অব্যয়। কিন্তু প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে যেসব তৎসম পদকে সংস্কৃতের অনুসরণে 'অব্যয়' হিসাবে চিহ্নিত করা হয় তার অনেকগুলিই ক্রিয়াবিশেষণ হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য। এছাড়া সংস্কৃতে যেসব শব্দ স্থায়ীভাবে 'অব্যয়' হিসাবে চিহ্নিত, বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি অন্যপদ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। যেমন 'অকস্মাৎ', 'হঠাৎ' শব্দদুটি সংস্কৃতে স্থায়ীভাবে অব্যয়, কিন্তু বাংলায় যখন বলা হয় 'ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা' তখন 'অকস্মাৎ' আর অব্যয় নয়, বিশেষ্য। আবার বাঙালি কবি যখন তাঁর মাতৃভাষায় লেখেন 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত', তখন 'হঠাৎ' আর অব্যয় নয়, বিশেষণ। বাংলা ভাষার এই প্রয়োগগত নমনীয়তার জন্য বাংলায় কোনো শব্দকে সংস্কৃতের আদর্শে চিরকালের মতো 'অব্যয়' নামের তকমা দেওয়া কঠিন। এখানে সংস্কৃত আদর্শের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের বদলে খোলাখুলি প্রয়োগের বিচারেই তাদের পদনাম নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত। সুতরাং পর্ষদের নতুন পাঠ্যক্রমে যে 'অব্যয়' নামটি বর্জনের কথা বলা হয়েছে তা যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়। তবে এখানে একটা কথা আছে। পর্ষদের ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যক্রমে 'অব্যয়' শব্দটি বর্জন করে তার জায়গায় সংযোজক, আবেগসূচক ও আলঙ্কারিক—এই তিনটি শব্দ ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যক্রমের (পৃষ্ঠা ১৮-১৯) ১৪নং নির্দেশিকায় 'বাক্যে অন্বয়ের বৈচিত্র্যসূচক শব্দাবলি (বিশেষ্য-সর্বনাম-বিশেষণ-ক্রিয়াবিশেষণ-ক্রিয়ার অতিরিক্ত)' এই শিরোনামে ১৪নং ধারার (ক), (খ) ও (গ) অংশে এই ধরনের শব্দের বিশদ বিবরণ আছে। 'ক' অংশে আছে ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে উল্লিখিত সংযোজক, আবেগসূচক এবং আলঙ্কারিক শব্দ ও শব্দগুচ্ছের প্রয়োগবৈচিত্র্য, 'খ' অংশে আছে, (১) সম্বোধনসূচক, (২) সাদৃশ্যসূচক, (৩) প্রশ্নসূচক, (৪) না বা অসম্মতিসূচক, (৫) সমর্থন বা সম্মতিসূচক, (৬) সংশয়সূচক শব্দ এবং 'গ' অংশে আছে 'সাপেক্ষ শব্দজোড় (যেই.........অমনি ; হয়.......নয়। নয়তো, যদিও.....তবু ; কী.....কী ইত্যাদি)'। নতুন পাঠ্যক্রমের (ক), (খ) এবং (গ) অংশে যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছের কথা বলা হয়েছে প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণগুলিতে তা দীর্ঘদিন ধরে 'অব্যয়'-এর শ্রেণিবিভাগ বলেই বর্ণিত হয়ে এসেছে। এখন 'অব্যয়' শব্দটি বর্জন করলেও এই ধরনের শব্দের প্রয়োগ ও প্রয়োগগত শ্রেণিবিভাগের প্রয়োজনীয়তা বর্জিত হচ্ছে না। সুতরাং এই ধরনের শব্দের শ্রেণিবিভাগ ও তার শ্রেণিনামগুলি বজায় রেখে তাদের একটা সাধারণ নাম (generic term) দেওয়া দরকার যা হবে 'অব্যয়ে'র বিকল্প কিন্তু 'অব্যয়ের' মতো নিষ্ক্রিয় নয়, পদের অন্য শ্রেণিনামগুলির মতোই পদের ক্রিয়াসূচক (functional)। কী হবে সেই সাধারণ নাম? দু'ভাবে এই প্রশ্নের মীমাংসা করা যেতে পারে ঃ (১) অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি বা অনুসর্গ-এর মতো কোনো

অর্থবহ কিন্তু অপ্রচলিত বা অচেনা শব্দ তৈরি করে দেওয়া, (২) পদের কাজ বোঝায় এমন কোনো চেনা ও স্বচ্ছ শব্দ ব্যবহার করা। পরিভাষার ব্যাপারে স্বচ্ছতাই যেখানে আমাদের কাম্য সেখানে দ্বিতীয় বিকল্পটিই বোধহয় গ্রহণযোগ্য। তাহলে দেখতে হয় এখানে এই ধরনের শব্দ/পদের কাজ কী? ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যক্রমে বলা হয়েছে এই ধরনের শব্দের কাজ হচ্ছে বাক্যের অর্থে একটা মাত্রা যোগ করা এবং নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যক্রমে এই ধরনের 'শব্দাবলি'কে বলা হয়েছে 'বাক্যে অন্বয়ের বৈচিত্র্যসূচক' (এরমধ্যে সংযোজক, আবেগসূচক ও আলঙ্কারিক শব্দগুলিও অন্তর্ভুক্ত)। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, এই ধরনের শব্দের কাজ হচ্ছে বাক্যের অর্থে ও অন্বয়ে একটা অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করা। অর্থাৎ যোগ করাই এই ধরনের শব্দের কাজ—এমন সংজ্ঞা মেনে নিলে এদের সামগ্রিক বা সাধারণ (generic) নাম দেওয়া যেতে পারে 'যোজক শব্দ/পদ'। নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যক্রমে উল্লিখিত ১৪ (ক), (খ) ও (গ)-এর শ্রেণিনামগুলি আসলে 'যোজক শব্দ/পদে'রই বিস্তৃত শ্রেণিবিভাগ। তাহলে বলা যায়, বাংলায় পদের প্রাথমিক শ্রেণিবিভাগ বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ, যোজক এবং

তবে এখানে বলা দরকার, শুধু 'অব্যয়ীভাব'ই নয়, বাংলায় সমাসের কাঠামো, শ্রেণিবিভাগ, ব্যাসবাক্য ইত্যাদি নিয়ে বিশেষভাবে পুনর্বিচার করা দরকার। বিশেষত বাংলা ব্যাকরণে যেসব গতানুগতিক ব্যাসবাক্য দেওয়া হয় তা শুধু গতানুগতিকই নয়, তা যথাযথ কিনা তাও ভাবার বিষয়। বাংলা ব্যাকরণে 'রাজপথ' শব্দের ব্যাসবাক্য দেখানো হয় 'পথের রাজা' এবং বলা হয় পূর্বপদ পরে বসায় (অর্থাৎ পূর্বপদ পরনিপাতের ফলে) 'রাজা'র পর 'পথ' বসেছে। কিন্তু এই বিশ্লেষণ কি ঠিক? কালিদাসের কাব্যে 'রাজপথ' অর্থে 'নরেন্দ্রমার্গ' শব্দ পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায় 'রাজপথ'-এর প্রকৃত ব্যাসবাক্য হচ্ছে 'রাজার পথ' (অর্থাৎ রাজা ও রাজপুরুষদের চলাচলের পথ)। এখনকার 'ভি আই পি রোড' শব্দটা মাথায় রাখলে 'রাজপথে'র প্রচলিত ব্যাসবাক্যের যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। এইরকম কর্মহীন গুণহীন, ধনহীন, দাবিহীন,—এই সব শব্দের প্রচলিত ব্যাসবাক্য —দ্বারা হীন ; সমাসের নাম পুরোনো মতে তৃতীয়া তৎপুরুষ, নতুন মতে করণ তৎপুরুষ)। কিন্তু বাংলার 'হীন' শব্দের প্রচলিত অর্থের প্রেক্ষিতে এই ব্যাসবাক্য খুবই কৃত্রিম মনে হয়। বাংলা ব্যাকরণে ব্যাসবাক্যের 'বাংলাপনা' আনার জন্য এ ব্যাপারে একটু ভাবার দরকার

যোজক পদ

সংযোজক | আবেগ সূচক | আলঙ্কারিক | সম্বোধন সূচক | সাদৃশ্য সূচক | প্রশ্নসূচক | না বা অসম্মতিসূচক | সমর্থন বা সম্মতিসূচক | সংশয় সূচক | সাপেক্ষ শব্দজোড়

আছে। এখানে আরও একটা কথা ভাবার আছে। বাঙালির জীবনযাত্রায় এখন বেগ বা দ্রুততা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছে, অন্যান্য প্রযুক্তির সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তির অভাবিত বিস্ফোরণ এই দ্রুততার বেগকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করছে। এই দ্রুততার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাংবাদিকতা তথা গণ-মাধ্যমের ভাষাতেও বড়ো বাক্যাংশকে ছোটো করার প্রবণতা বাড়ছে। এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকতার সঙ্গে তীক্ষ্ণতা এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে জ্ঞাপন-চাতুর্যের মেলবন্ধন এখনকার সাংবাদিকতার ভাষায় বড়ো ব্যাপার হয়ে দেখা দিচ্ছে। ব্যাকরণের সংজ্ঞা অনুসারে সমাস হচ্ছে বহু পদকে একপদে পরিণত করার প্রক্রিয়া। প্রযুক্তিবাহিত দ্রুততার বেগ এখন সমাস করার প্রক্রিয়ার মধ্যেও সঞ্চারিত হচ্ছে। ফলে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন সমাসবদ্ধ শব্দ যা আগে কখনও ব্যবহৃত হয়নি। সমাস তৈরির ক্ষেত্রে এই দ্রুততাধর্মী নতুন প্রবণতার কথা মাথায় রেখে তার উপযুক্ত ব্যাসবাক্য তৈরি করার কথাও নতুন করে ভাবতে হবে। ভাবতে হবে পাঁচতারা (হোটেল) ঝাঁ চকচকে

অব্যয়ীভাব সমাস

সম্ভবত অব্যয়-বর্জনের সূত্র ধরেই নবম-দশম শ্রেণির নতুন পাঠ্যক্রমে 'অব্যয়ীভাব' সমাসকেও বর্জন করা হয়েছে। বর্জনের কারণ হিসাবে পাঠ্যক্রমে বলা হয়েছে ঃ

> সমাসের ক্ষেত্রে 'অব্যয়ীভাব' বাদ দেওয়া হল। কারণ বাংলায় এ ধরনের কোনো সমাসের চল নেই। সংস্কৃতে 'অব্যয়ীভাব' শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে 'যা আগে অব্যয় ছিল না তার অব্যয় হয়ে ওঠা'। সংস্কৃতে এমন কিছু শব্দ আছে যা আদিতে অব্যয় না হলেও সমাস হবার পর তা অব্যয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাংলায় এইসব সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দ চালু আছে, কিন্তু তাদের প্রয়োগ অব্যয়ের মতো নয়। প্রয়োগে কোথাও তা বিশেষ্য...., কোথাও বিশেষণ...... কোথাওবা ক্রিয়াবিশেষণ.......। আবার এর অনেকগুলির গঠন বাংলা তৎপুরুষ ও বহুব্রীহির নিয়মেও দেখানো যায়।

বস্তুত অব্যয়ীভাব সম্পর্কে পর্ষদের বিশ্লেষণ খুবই যুক্তিযুক্ত।

(গাড়ি), চটজলদি (খাবার) গড়াপেটা (ম্যাচ) ইত্যাদি শব্দের ঠিক ঠিক ব্যাসবাক্য কেমন হবে ? 'জ্যামজমাট' 'যৌনকর্মী', 'পার্শ্বশিক্ষক', 'গাড়িবোমা', 'করসেবা,' 'সোজাসাপটা' এইসব নতুন শব্দের ব্যাসবাক্য কী ? ব্যাসবাক্য করার সময় গতানুগতিক ছাঁচের বদলে এমন ছাঁচ ব্যবহার করা দরকার যাতে অর্থের যাথার্থ্যের সঙ্গে বাংলাভাষার বৈশিষ্ট্যও বজায় থাকে।

।।৩।।

বাংলা ব্যাকরণের নতুন সিলেবাসের সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় প্রথাগত 'পুরুষ' শব্দের বদলে 'পক্ষ' শব্দের ব্যবহার। এই ব্যবহার সম্পর্কে পর্ষদের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ

> 'পক্ষ' শব্দটি ব্যাকরণে প্রচলিত 'পুরুষ' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের কারণ 'পুরুষ' শব্দটিতে একাধিক অর্থ প্রকাশ পায়। .... 'পুরুষ' শব্দের এই অর্থবৈচিত্র্য এই শব্দের দ্রুত বা তাৎক্ষণিক অর্থগ্রহণের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। ....এই সূত্রে ব্যাকরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত 'পুরুষে'রও একটি বদলি শব্দ চালু করলে এ বিষয়ের চর্চা সহজসাধ্য হয়। বস্তুত স্কুলপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণের প্রায় পৌনে দুশো বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় স্কুলপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণের গোড়ার দিককার লেখকেরা 'পুরুষ' ও তার শ্রেণিবিভাগের প্রচলিত নামগুলিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ...... এই নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন তখনই অনুভূত হয়েছিল, কিন্তু বাংলা স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের বাজারে কট্টর সংস্কৃতপন্থী পণ্ডিতদের ক্রমবর্ধমান ও সংগঠিত চাপের ফলে এই পরিবর্তনের চেষ্টা বেশি দূর এগোয় নি। কিন্তু বর্তমানে যখন শিক্ষিত বাঙালি সমাজে সংস্কৃত ও বাংলা যে দুটো আলাদা ভাষা এ সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন পরিবর্তনের জন্য পূর্বসূরিদের এই অপূর্ণ ইচ্ছার সূত্র ধরেই 'পুরুষ' ও তার শ্রেণিনামের জায়গায় নতুন, সহজবোধ্য ও স্বচ্ছ শব্দ ব্যবহার করা সঙ্গত মনে হয়। .... দেখা যায়, ভাষায় যত বাক্য ব্যবহার করা হয়, তাতে কোনো-না-কোনো পক্ষের কথা বলা হয়। .... বক্তা বাক্যে কোন্ পক্ষের কথা বলছে তা বোঝানোর বৈশিষ্ট্যকে সংস্কৃত ও সংস্কৃতানুসারী ব্যাকরণে 'পুরুষ' বলা হয়েছে। .... তথাকথিত 'পুরুষ' শব্দে যখন উদ্দেশ্যের পক্ষ বোঝা যায় তখন 'পুরুষ'-এর বদলি শব্দ হিসাবে 'পক্ষ' শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া শ্রেণিনামের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সর্বনামের প্রাধান্য অনুসারে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষের বদলে যথাক্রমে 'আমি-পক্ষ', 'তুমি-পক্ষ' ও 'সে-পক্ষ' ব্যবহার করা যেতে পারে (ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যক্রম, পৃষ্ঠা ২৭-২৯)।

পর্ষদের ব্যাখ্যায় বোঝা যাচ্ছে, 'পুরুষ' শব্দটির অর্থগত অস্বচ্ছতার জন্যই তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছতর শব্দ হিসাবেই 'পুরুষ'-এর বদলে 'পক্ষ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যাকরণের পরিভাষার ব্যাপারে পর্ষদ যে স্বচ্ছতার নীতি গ্রহণ করেছে, সেদিক থেকে 'পুরুষ'-এর তুলনায় 'পক্ষ' শব্দটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। কিন্তু কোনো কোনো মহল থেকে এই পরিবর্তনের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। প্রতিবাদীদের বক্তব্য হচ্ছে, ব্যাকরণের পরিভাষা হিসাবে 'পুরুষ' শব্দটি শিক্ষিত বাঙালি সমাজে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত, তাই এই পরিভাষিক শব্দের অর্থ সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালির কাছে কোনো অস্পষ্টতা বা দ্বিধাবোধ নেই। কাজেই অর্থগত অস্পষ্টতা বা বিবিধতার কারণ দেখিয়ে 'পুরুষ' শব্দটি বর্জন করার কোনো যুক্তি নেই।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ব্যাকরণের 'পুরুষ' শব্দটির অর্থ নিয়ে শিক্ষিত বাঙালি সমাজে সত্যিই কি কোনো অস্পষ্টতা, অনির্দিষ্টতা বা দ্বিধাবোধ নেই ? এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য শিক্ষিত বাঙালি সমাজে দীর্ঘকাল ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত দু'খানি বাংলা অভিধানের সাক্ষ্য নেওয়া যাক। এ দুটি অভিধানের একটি হচ্ছে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৩-৪৬) এবং অন্যটি হচ্ছে রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৭)। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অনুসারে 'পুরুষ' = "অস্মদাদিভেদে তিঙ্ বিভক্তির তিন তিনটির সংজ্ঞাবিশেষ, প্রথম °, মধ্যম °, উত্তম °, পা. ১.৪.১০১।" অন্যদিকে 'চলন্তিকা' অনুসারে 'পুরুষ' "আমি তুমি সে ইঃ-র ভেদ (উত্তম-, মধ্যম-, প্রথম-)"। অর্থাৎ 'শব্দকোষ' অনুসারে 'পুরুষ' হচ্ছে ক্রিয়াবিভক্তির শ্রেণিভেদ আর 'চলন্তিকা' অনুসারে 'পুরুষ' হচ্ছে 'সর্বনামে'র শ্রেণিভেদ। এছাড়া 'শব্দকোষে' 'পুরুষ'-এর ক্রমবিন্যাস সংস্কৃতের অনুসরণে প্রথম, মধ্যম ও উত্তম ; কিন্তু 'চলন্তিকা'য় 'পুরুষ'-এর ক্রমবিন্যাস সংস্কৃতের অনুগামী নয়, বরং তার বিপরীত ঃ উত্তম, মধ্যম, প্রথম। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে শিক্ষিত বাঙালি সমাজে ব্যাকরণের 'পুরুষ' শব্দটির অর্থ সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট নয়, বরং দ্বিধাগ্রস্ত এবং এ ব্যাপারে সংস্কৃতের আদর্শ থেকে সরে আসতেও শিক্ষিত বাঙালি সমাজ অপ্রস্তুত নয় (কারণ, 'চলন্তিকা'য় 'পুরুষ'-এর যে ক্রমভঙ্গ করা হয়েছে তা নিয়ে শিক্ষিত

বাঙালি সমাজে কেউ কখনও প্রতিবাদ করেনি)। ব্যাকরণের 'পুরুষ'-এর ব্যাপারে এটাই যদি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের এক সময়ের মানসিক অবস্থান হয় তবে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে পর্ষদ যদি এ কালের শিক্ষার্থীদের সহজবোধ্যতার প্রয়োজনে সংস্কৃত থেকে আরও সরে এসে স্পষ্টতর পরিভাষার সন্ধান করে তবে তাতে আপত্তি করার যুক্তি কী ? একমাত্র অন্ধ পশ্চাদ্‌গামিতা ছাড়া আপত্তির আর কোনো কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য তো স্বেচ্ছায় অন্ধত্ববরণ নয়, অন্ধত্ব দূর করে জ্ঞানের উদ্দীপন এবং পশ্চাদ্‌গামিতার বদলে অগ্রগামিতা। সুতরাং শিক্ষার স্বার্থে 'পুরুষের' স্বচ্ছতর বদলি শব্দের প্রবর্তন কোনো- ভাবেই দোষাবহ মনে হয় না। তাছাড়া, সংস্কৃত ব্যাকরণের ইতিহাসেও তো দেখা যায় একই বিষয় বা প্রকরণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহৃত হওয়ার নজির রয়েছে।

যাই হোক, বিষয়টির আরও গভীরে গিয়ে পর্যালোচনা করা যাক এবং এই প্রসঙ্গে ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণে ব্যবহৃত 'পুরুষ' বোধক 'person' শব্দটির উৎপত্তি ও প্রয়োগের বিষয়টিও বিবেচনা করা যাক। Oxford English Dictionary, Vol. XI (2nd edition, 1989, Clarendon Press, Oxford)-এ দেখা যায় ইংরেজি ব্যাকরণে person শব্দটির ব্যবহার শুরু ১৫২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে, ওই সময় কোনো কোনো ব্যাকরণে person শব্দটির বানান 'parson' হিসেবেও পাওয়া যায়। Person শব্দটি এসেছে মধ্য-ইংরেজির persone শব্দ থেকে। মধ্য-ইংরেজিতে persone শব্দটি আবার এসেছে ল্যাটিন ভাষার persona শব্দ থেকে, ল্যাটিনে persona শব্দের মূল অর্থ অভিনেতার মুখোশ (এই অর্থের সঙ্গে গ্রিক নাট্যকলার সংস্রব আছে, প্রাচীন গ্রিসে অভিনেতারা নিজেদের ভূমিকা বা চরিত্র অনুসারে এক একরকম মুখোশ পরত)। এখনকার ইংরেজি অভিধানে ব্যাকরণে ব্যবহৃত person শব্দের অর্থ : Oxford Advanced Learnes' Dictionary (6th ed. 2nd reprint 2001) অনুসারে 'any of the three classes of personal pronouns', অন্যদিকে Webster's Encyclopaedic Unabridged Dictionary of English Language (1989) অনুসারে : 'A category found in many languages that is used to distinguish between the speaker of an utterance and those to or about whom he is speaking'। তাহলে ইংরেজিতে ব্যাকরণের person হচ্ছে বাক্যে বক্তা, বক্তব্য ও বক্তব্যের লক্ষ্যস্থলের মধ্যে পার্থক্য বোঝাবার একটা বৈশিষ্ট্য (category), যা বাক্যের সর্বনাম ও ক্রিয়ারূপের মধ্যদিয়ে ফুটে ওঠে। এই বৈশিষ্ট্যই বাক্যের সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের রূপগঠনে নির্ণায়ক ভূমিকা (role) গ্রহণ করে। বোঝা যাচ্ছে, এই নির্ণায়ক ভূমিকা (role) বোঝাবার জন্যই ইংরেজি ব্যাকরণের সূচনাপর্বে person শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল এবং মধ্য-ইংরেজিতে ভূমিকা (role) অর্থে persone শব্দটি চালু থাকায় ইংরেজি ব্যাকরণের গোড়ার দিকে বাক্যের নির্ণায়ক ভূমিকার নাম হিসাবে ল্যাটিন ব্যাকরণের অনুসরণে person শব্দটির ব্যবহারে কোনো অর্থগত অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা অনুভূত হয় নি। ব্যাকরণের অন্যতম category হিসাবে ইংরেজি-ভাষী শিক্ষিত সমাজে শব্দটি তাই অনায়াসে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে বিষয়টি এইরকম নয়।

ইংরেজি ব্যাকরণের person শব্দটি ল্যাটিন persona থেকে মধ্য-ইংরেজির persone-র মধ্যদিয়ে আধুনিক ইংরেজিতে বিবর্তিত হয়ে এসেছে, কিন্তু বাংলা ব্যাকরণে ব্যবহৃত 'পুরুষ' শব্দটি সংস্কৃত থেকে বিবর্তিত হয়ে আসে নি, এসেছে তৎসম শব্দ হিসাবে সরাসরি সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে। সংস্কৃত ভাষার প্রধান ব্যাকরণ 'অষ্টাধ্যায়ী'তে দেখা যায় ব্যাকরণকার পাণিনি (আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী) সংশ্লিষ্ট সূত্রে (১.৪.১০১) 'পুরুষ' শব্দটি ব্যবহার করেন নি। তবে ওই সূত্রে তিনি তিঙ্ প্রভৃতি ক্রিয়াবিভক্তির প্রথম, মধ্যম ও উত্তম ক্রমনির্দেশ করেছেন। পরবর্তীকালে সর্ববর্মা (৭ম শতাব্দী) কাতন্ত্র ব্যাকরণে পাণিনির ক্রমগুলি উল্লেখ করে ক্রমগুলির একটা সাধারণ নাম (generic term) হিসাবে 'পুরুষ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এইজন্য The Astadhyayi of Panini গ্রন্থে (1988 Reprint) অষ্টাধ্যায়ীর ইংরেজি অনুবাদক ও সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বসু এই সূত্রটির ব্যাখ্যায় 'পুরুষ'কে 'triads of conjugational affixes' (Vol I, p-209) বলে উল্লেখ করেছেন। সর্ববর্মা তাঁর সূত্রে 'পুরুষ' শব্দটির উল্লেখ করলেও শব্দটি তাঁর নিজের সৃষ্টি হয়। 'অষ্টাধ্যায়ী'র অপর অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা Sumitra Mangesh Katre তাঁর Astadhyayi of Panini (1st Indian edition, 1989) গ্রন্থে বলেছেন : 'The word (purusa) associated with these triplets is considered by Paniniyas as a pre-Paninian Technical term' (p-102). প্রকৃতপক্ষে প্রাক্‌-পাণিনীয় শব্দশাস্ত্রের মধ্যে সম্ভবত যাস্ক (আনুমানিক ৮ম-৭ম খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ)-রচিত নিরুক্তেই 'পুরুষ' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যাকরণের পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 'নিরুক্তে' যাস্ক বিভিন্ন বৈদিক

মন্ত্রের শাব্দিক বিশ্লেষণ করেছেন। এই রকম একটি বিশ্লেষণে আছে ঃ

> তত্র পরোক্ষকৃতাঃ সর্বাভির্নামবিভক্তিভির্যুজ্যন্তে প্রথমপুরুষৈশ্চাখ্যাতস্য। .... অথ প্রত্যক্ষকৃতা মধ্যমপুরুষযোগাস্ত্বমিতি চৈতেন সর্বনাম্না। ....অথাধ্যাত্মিক্য উত্তমপুরুষযোগা অহমিতি চৈতেন সর্বনাম্না। (৭/২)

এর ইংরেজি অনুবাদ ঃ

Of these the indirectly addressed (hymns) are connected with all the cases of nouns and with the third person of the verb...Now the directly addressed stanzas are connected with the second person and with the pronoun tvam....Now the self-invocations are connected with the first person and the pronoun ahams' (ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত ঃ Technical Terms and Technique of Sanskrit Grammar, 1st Reprint edition, 2003, pp.153-154). নিরুক্তে 'পুরুষ' শব্দের উল্লেখ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পূর্বোক্ত গ্রন্থে বলেছেন ঃ

> It would appear from the Nirukta that purusa or person was first used with reference to the verb and then extended to pronouns and then to nouns (p.154).

তবে 'পুরুষ' শব্দটিকে ব্যাকরণের পরিভাষা হিসাবে যাস্ক প্রথম ব্যবহার করলেও শব্দটি তাঁর সৃষ্টি নয়। কারণ তাঁর আগেই 'পুরুষ' শব্দটি ভিন্ন অর্থে বৈদিক সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে ব্যবহৃত 'পুরুষ'-এর সঙ্গে বৈদিক মন্ত্রবাক্যের কোনো শাব্দিক বৈশিষ্ট্যের ক্রিয়াগত (functional) সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই সম্ভবত মন্ত্রবাক্যের ওই শাব্দিক বৈশিষ্ট্যকে 'পুরুষ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাহলে জানতে হয় ব্যাকরণের বাইরে সাধারণ সাহিত্যে 'পুরুষ' শব্দের অর্থ কী।

অভিধানে 'পুরুষ' শব্দের অন্তত তিনটি ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় ঃ

১. √পুর্ (= অগ্রগমন) + উষ (কুষন্) = অগ্রগামী [উণাদিসূত্র ৪·৭৪]।

২. √পৃ (= পূরণ করা) + উষ (কর্তৃ) = পূরণকারী।

৩. পুর (= দেহ) + √শী +অ (কর্তৃ) = দেহশায়ী, আত্মা [বাচস্পত্য অভিধান]।

বলা বাহুল্য, 'পুরুষ' শব্দের তিনটি ব্যুৎপত্তিতেই বৈদিক যুগের পুরুষপ্রধান ও অধ্যাত্মবাদী সমাজব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। এই সমাজব্যবস্থায় পুরুষের ভূমিকা ছিল অগ্রবর্তী, সমাজের নিয়ম-কানুন প্রণয়নে পুরুষই নিত প্রধান নির্ণায়ক ভূমিকা। এরই সাদৃশ্যে বাক্যশায়ী যে বৈশিষ্ট্য বাক্যের অভিমুখ (পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ ও আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আত্মমুখীন) নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ করে তখনকার শব্দশাস্ত্রে তাকেই 'পুরুষ' বলা হয়েছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা হিসাবে 'পুরুষ' শব্দ ব্যবহারের এটাই ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা।

প্রাচীনকালের সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা পুরুষপ্রধান ও অধ্যাত্মবাদী সমাজব্যবস্থার অঙ্গীভূত থাকায় ব্যাকরণের পরিভাষা হিসাবে 'পুরুষ' শব্দ ব্যবহারে কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের 'পুরুষ' শব্দটির ব্যবহারে গোড়া থেকেই কিছু অসুবিধা ঘটেছে। এই অসুবিধা একদিকে যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যখন স্কুলপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণ রচনার সূচনা হয়েছিল তখন একবার দেখা দিয়েছিল, আবার এই একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যখন 'সবার জন্য শিক্ষা' এই অঙ্গীকার মাথায় রেখে বাংলা ব্যাকরণ পাঠকেও সহজ, স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ করার চেষ্টা চলছে এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষাকে ধর্মীয় সংস্রব ও অন্যান্য বৈষম্যমূলক পক্ষপাত থেকে মুক্ত রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তখন ব্যাকরণে 'পুরুষ' শব্দটির ব্যবহারযোগ্যতা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা ব্যাকরণে 'পুরুষ' শব্দটি ব্যবহারের সমস্যা ছিল অন্যরকম। তখন যাঁরা বাংলায় বাংলা ব্যাকরণ লিখতেন তাঁদের সামনে বাংলা ব্যাকরণের কোনো প্রতিষ্ঠিত আদর্শ ছিল না। তখন বাংলা লেখার জন্য ইংরেজিতে কয়েকটি বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সব ব্যাকরণে ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণের তখনকার রীতিপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল। রামমোহনও প্রথমে সেই রীতিপদ্ধতি অনুসরণ করে ইংরেজিতে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লেখেন (১৮২৬), এরপর স্কুল বুক সোসাইটির অনুরোধে বাংলায় 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩) লেখার সময়ও তিনি ইংরেজি ব্যাকরণের আদর্শ অনুসরণ করেছেন। ইংরেজি ব্যাকরণে person মূলত সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ, তাই রামমোহনও তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণে' 'প্রতিসংজ্ঞা' (রামমোহন সর্বনামের বদলে 'প্রতিসংজ্ঞা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন)র শ্রেণিবিভাগকে 'পুরুষ' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তবে এখানে লক্ষণীয় এই যে, 'চতুর্থ অধ্যায়ে'র 'প্রতিসংজ্ঞার প্রকরণে' 'পুরুষে'র শ্রেণিনাম হিসাবে একবার-মাত্র 'উত্তম পুরুষ', 'মধ্যম পুরুষ' শব্দদুটি ব্যবহার করলেও (এখানে পূর্বোক্ত দুটি পুরুষের সঙ্গে 'তৃতীয় পুরুষ' শব্দটি

উল্লিখিত) বইয়ের আগাগোড়া সর্বত্র 'প্রতিসংজ্ঞা'র শ্রেণিবিভাগ হিসাবে ক্রমান্বয়ে 'প্রথম পুরুষ', 'দ্বিতীয় পুরুষ' ও 'তৃতীয় পুরুষ' শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন। বলা বাহুল্য, এগুলি যথাক্রমে ইংরেজি ব্যাকরণের 1st person, 2nd person এবং 3rd person-এর বঙ্গানুবাদ। অর্থাৎ রামমোহন 'পুরুষে'র আলোচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে শুধু 'পুরুষ' শব্দটি নিয়েছেন, কিন্তু পুরুষের ক্রমনির্দেশে সংস্কৃতের বদলে ইংরেজি ব্যাকরণের ক্রম অনুসরণ করেছেন। অন্যদিকে ওই সময়ের (১৮৪০) অপর বাংলা ব্যাকরণকার ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ, যিনি 'মুগ্ধবোধাভিধেয় সংস্কৃত ব্যাকরণের স্থূলার্থ সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া সাধুভাষায় সাধুভাষার .... ব্যাকরণসার সংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রস্তুত' করেছেন, তাঁর কাছে তাঁর ব্যাকরণে 'পুরুষ' শব্দটি ব্যবহারে অন্য সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তিনি সংস্কৃতপন্থী, সুতরাং তাঁর ব্যাকরণে 'পুরুষ' শব্দটির ব্যবহারই প্রত্যাশিত, কিন্তু তাঁর সমস্যা ছিল, সংস্কৃতের অনুসরণে 'পুরুষ' শব্দটি ব্যবহার করলে সংস্কৃত ব্যাকরণে 'পুরুষ'কে যেভাবে দেখানো হয়েছে তাঁকেও সেইভাবে দেখাতে হয়। ইংরেজিতে যেমন person মূলত সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ, সংস্কৃতে তেমনি 'পুরুষ' মূলত ক্রিয়াবিভক্তির ত্রিধাভাগ, এর সঙ্গে বচনের প্রশ্নটিও জড়িয়ে আছে, অথচ বাংলা ক্রিয়াপদের বৈচিত্র্যকে মাত্র তিনভাগে বিন্যস্ত করা যায় না এবং বচনের প্রশ্নটিও বাংলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এজন্য এই ক্ষেত্রে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের 'পুরুষ' শব্দটির প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ পুরোপুরি এড়িয়ে গিয়ে সরাসরি ইংরেজি ব্যাকরণের আশ্রয় নিয়েছেন এবং বিশেষ ভাবে 'পুরুষ' শব্দটির আনুষঙ্গিক দায় এড়াবার জন্য এক্ষেত্রে একেবারে ইংরেজি ব্যাকরণের 'person' শব্দের বঙ্গানুবাদ করে 'ব্যক্তি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং 'ব্যক্তি'র ক্রম হিসাবে ইংরেজি ব্যাকরণের অনুকরণে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়— এই ক্রম ব্যবহার করেছেন।

রামমোহন ও ভগবচ্চন্দ্রের দৃষ্টান্তে বোঝা যায় বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের 'পুরুষ'-এর ধারণা মিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে কিছু অসংগতি আছে। তবে 'ব্যাকরণ কৌমুদী'তে তিঙন্ত ব্যাকরণের গোড়ায় দেখা যায় 'পুরুষ'কে ত্রিধাবিভক্তি হিসাবে দেখিয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রথম-মধ্যম-উত্তম—এই ক্রমনামগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তার বিশদ ব্যাখ্যায় ইংরেজি ব্যাকরণের person-এর ক্রম অনুসরণ করে বলা হয়েছে : 'অস্মদ্ শব্দে উত্তম পুরুষ বুঝায় ; যুষ্মদ্ শব্দে মধ্যম পুরুষ বুঝায় ; তদ্‌ভিন্ন সমুদয় শব্দে প্রথম পুরুষ বুঝায়।' আসলে তখনকার ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি ছাত্রদের কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণের পাঠ সহজসাধ্য করার জন্যই ইংরেজি ও সংস্কৃত রীতির মধ্যে একটা কাজ- চালানো-গোছের সামঞ্জস্য করা হয়েছিল। সেই সামঞ্জস্যের আদর্শ সমকালীন বাংলা ব্যাকরণগুলিতেও অনুসৃত হয়েছিল এবং সেই আদর্শের অনুকরণ আজও অব্যাহত। প্রকৃতপক্ষে এই সামঞ্জস্যের মাধ্যমে একটা সত্য বেরিয়ে আসে যে, সময়ের প্রয়োজনে পূর্বাদর্শ থেকে সরে আসা মোটেই দোষাবহ নয় এবং পূর্বপুরুষেরাও কখনও তা মনে করেন নি। এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বাংলা ব্যাকরণের সাম্প্রতিক পাঠ্যক্রমে প্রথাগত 'পুরুষ' শব্দের বদলে 'পক্ষ' শব্দ ব্যবহারের বিষয়টি বিচার করতে হবে। বিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের নেতৃত্বে সারা পৃথিবীতে 'সবার জন্য শিক্ষা'র একটা দাবি উঠেছে এবং এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার লক্ষ্য, আদর্শ ও পদ্ধতি নিয়ে এখন নানা নতুন চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে, ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। সম্ভবত শিক্ষাসংক্রান্ত এই নতুন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যশিক্ষা পর্যদ বাংলা ব্যাকরণের পঠন-পাঠনে পুরোনো দিনের উচ্চবর্গীয় (elitist) ধ্যানধারণা বর্জন করে ভাষারীতির ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিভাষার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার নীতি গ্রহণ করেছে, এবং এই সূত্রে পাঠ্যক্রমে অস্পষ্ট পরিভাষা 'পুরুষ'-এর বদলে স্বচ্ছতর পরিভাষা 'পক্ষ' ব্যবহৃত হয়েছে এবং বিভ্রান্তিকর 'উত্তম পুরুষ', 'মধ্যম পুরুষ' ও 'প্রথম পুরুষ'-এর বদলে স্পষ্টতর পরিভাষা যথাক্রমে 'আমি-পক্ষ', 'তুমি-পক্ষ' এবং 'সে-পক্ষ' ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পর্ষদের এই নির্দেশ অনুসারে নতুন ব্যাকরণ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং সারা পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলিতে এইসব নতুন ব্যাকরণই পড়ানো শুরু হয়েছে। যাঁরা এইসব বই পড়াচ্ছেন, তাঁরা এই নতুন পরিভাষা নিয়ে কোনো আপত্তি করছেন না, বরং নতুন পরিভাষাকে কর্মরত শিক্ষকেরা সহজ মনে গ্রহণ করেছেন। শিক্ষক সংগঠনগুলিও এ ব্যাপারে কোনো প্রতিবাদ করেন নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কোনো কোনো অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং স্কুলশিক্ষার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নন এমন কোনো কোনো প্রবীণ অধ্যাপক নিতান্ত বয়োজ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত আপত্তি জানাচ্ছেন। এই আপত্তির পিছনে তাঁরা কোনো অ্যাকাডেমিক যুক্তি দেখাচ্ছেন না, তাহলে তাঁদের আপত্তির সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক কোথায় ?

যাই হোক, 'স্বচ্ছতা' ছাড়াও 'পুরুষ' শব্দটির পরিবর্তনের ব্যাপারে এখন আরও কিছু সময়োপযোগী প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে এখন সমস্ত স্কুলপাঠ্য বইতে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হচ্ছে। এই নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ

নাগরিকদের মনে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমানাধিকারের আদর্শ নিবিড়ভাবে সঞ্চার করা। এই জন্য ভাষা ও সাহিত্য ছাড়াও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যক্রমে ধর্মীয়, জাতপাত ও লিঙ্গবৈষম্যের বিষয়গুলি যাতে স্থান না পায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে। পাঠ্যক্রম তৈরির ব্যাপারে এই সাম্প্রতিক নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাকরণের পরিভাষা হিসাবে 'পুরুষ' শব্দটা কতটা উপযুক্ত তা বিশেষভাবে ভেবে দেখা দরকার। কারণ পরিভাষা হিসাবে 'পুরুষ' শুধু অস্বচ্ছই নয়, এর মধ্যে একদিকে যেমন পুরুষপ্রাধান্য তথা লিঙ্গবৈষম্য, অন্যদিকে তেমনি হিন্দু অধ্যাত্মবাদের প্রতিফলন আছে। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা ও লিঙ্গ-নিরপেক্ষতার দিক থেকে বিশেষভাবে স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ বইতে 'পুরুষ' শব্দটি বর্জন করাই যুক্তিসঙ্গত। তুলনায় 'পক্ষ' শব্দটি যেমন স্বচ্ছতর তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ ও লিঙ্গদ্যোতনাহীন। সুতরাং 'পুরুষ'-এর তুলনায় 'পক্ষ' শব্দের ব্যবহারই সময়োপযোগী। এছাড়া প্রথাগত উত্তম-মধ্যম-প্রথম পুরুষের চেয়ে আমি-পক্ষ, তুমি-পক্ষ ও সে-পক্ষের ব্যবহারই স্বচ্ছতার দিক থেকে বেশি উপযোগী। কারণ একই ছাত্র ইংরেজি ব্যাকরণে যেটাকে 3rd person বলে শিখছে, বাংলা ব্যাকরণে সেটাকেই প্রথম পুরুষ হিসাবে শিখছে। এক্ষেত্রে ইংরেজি 3rd শব্দের বাংলা অর্থ দাঁড়াচ্ছে প্রথম, যা ভাষাজ্ঞানের পক্ষে বিভ্রান্তিকর। অন্যদিকে 'আমি-পক্ষ', 'তুমি-পক্ষ' ও 'সে-পক্ষ' — এগুলি সমস্তই মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস (যথা, আমি-পক্ষ = আমি-আমরা সংক্রান্ত পক্ষ)। সংস্কৃত ব্যাকরণে একটি বিশেষ উদাহরণ দিয়ে সমগ্রের নাম দেওয়ার নীতি প্রচলিত আছে (যেমন, বহুব্রীহি সমাস = 'বহুব্রীহি' জাতীয় সমাস)। সেই রীতি অনুসারেই 'আমি-পক্ষ', 'তুমি-পক্ষ', 'সে-পক্ষ' ব্যবহারে আপত্তি থাকা উচিত নয়।

তবে বিষয়টির এখানেই শেষ নয়। যদি ভবিষ্যতে স্বচ্ছতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও লিঙ্গ-নিরপেক্ষতার দিক থেকে 'পক্ষ' শব্দের চেয়ে আরও উপযুক্ত শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে সেই শব্দকে 'পক্ষ'-এর জায়গায় বসাতে কোনো যুক্তিবাদী মানুষই আপত্তি করবেন না। কেউ কেউ অবশ্য ভগবচ্চন্দ্রের 'ব্যক্তি' শব্দটির ব্যবহারের পক্ষে মত প্রকাশ করছেন, কিন্তু 'ব্যক্তি' শব্দটি ধর্মনিরপেক্ষ ও লিঙ্গ-নিরপেক্ষ হলেও অর্থের দিক থেকে স্বচ্ছ ও একান্ত (exclusive) নয়। সুতরাং আপাতত 'পক্ষ' শব্দটিই চালু থাক। যাঁরা বলছেন সমস্ত পৃথিবীর বাংলাভাষী সমাজ কি এই ব্যবস্থা মেনে নেবে ?—তাঁদের উদ্দেশ্যে বিনীত নিবেদন, কোনো বড়ো কাজের সূচনা তো ছোটো জায়গা থেকেই করতে হয়। আর, এটা তো রবীন্দ্রনাথেরই সুচিন্তিত পরামর্শ।

বিদ্যালয় স্তরে পরিবেশ-শিক্ষা প্রসঙ্গে

জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ

সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ

ভূমিকা

কয়েক বছর পূর্বেই ভারতের মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত একটি রায়ে শিক্ষার সর্বস্তরেই পরিবেশ-শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই নির্দেশ সর্বত্র সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে না এই অভিযোগ ওঠায় গত বছরের ১৮ই ডিসেম্বর মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদকে (NCERT) নির্দেশ দেন ২০০৪-এর ১৪ই এপ্রিলের মধ্যে বিদ্যালয় শিক্ষার সর্বস্তরের জন্য মডেল সিলেবাস করে জমা দেবার জন্য যাতে ওই সিলেবাসের ভিত্তিতে ভারতের সব রাজ্যেই বিদ্যালয় স্তরে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পরিবেশ-শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা এই শিক্ষাবর্ষ থেকেই শুরু হতে পারে। NCERT ওই সিলেবাস আদালতে জমা দেবার পর সেটি গৃহীত হয়েছে এবং রাজ্যগুলির উপর দায়িত্ব বর্তেছে বিদ্যালয় স্তরে অবিলম্বে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পরিবেশ-শিক্ষা চালু করতেই হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ-শিক্ষা এবং কীভাবে বিভিন্ন সমস্যা কাটিয়ে উঠে এই শিক্ষা পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্ভব হতে পারে সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

পরিবেশ ও পরিবেশ-শিক্ষা

আমরা সকলেই জানি পরিবেশ হল ইংরেজি environment শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ। এই environment শব্দটি আবার এসেছে একটি প্রাচীন ফরাসি শব্দ environ থেকে, যার অর্থ encircling বা ঘিরে থাকা। অর্থাৎ আমাদের ঘিরে থাকা যা কিছুই আছে, যারা সব আছে তাদের সকলকে নিয়েই আমাদের পরিবেশ যার মধ্যে আমরাও অন্তর্ভুক্ত।

এই পরিবেশকে আমরা বিভিন্নভাবে দেখে থাকি, যেমন মহাবিশ্ব জাগতিক পরিবেশ, বিশ্ব পরিবেশ, স্থানীয় পরিবেশ, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি বহুতরভাবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার পরিবেশ এক ও অবিচ্ছেদ্য, ধারণার সুবিধার জন্যই কেবল একই পরিবেশকে ক্ষুদ্রতর বা বিভিন্নতর পরিবেশ সমূহের, অণু-পরিবেশ সমূহের সমষ্টি হিসেবে আমরা দেখে থাকি।

অনেকেই পরিবেশের যাবতীয় প্রাণ ও অপ্রাণ উপাদানসমূহ ছাড়াও আমাদের জীবনযাত্রার উপর প্রভাব ফেলে এমন যাবতীয় প্রক্রিয়া, উপাদানগুলির যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এসবকেও পরিবেশের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্তির পক্ষে।

পরিবেশ-শিক্ষা বলতে স্বভাবতই পরিবেশ-সম্পর্কিত শিক্ষার বিষয়টিই আমরা ভাবব। তবে আসলে পরিবেশ-শিক্ষা বলতে মূলত তিনটি বিষয়কে বোঝায় ঃ (১) পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষা (education about the environment), (২) পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষা (education through the environment) এবং (৩) পরিবেশের জন্য শিক্ষা (education for the environment)।

পরিবেশ-শিক্ষা কেন ?

কেন পরিবেশ-শিক্ষা এই বিষয়টি নিয়ে সম্ভবত কোনও দ্বিমতের অবকাশ নেই।

আমরা সকলেই জানি যে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানেই পরিবেশে যে অজস্র সমস্যা দেখা দিয়েছে, পরিবেশের যে অবক্ষয় স্পষ্টতই দৃশ্যমান তা থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে, আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে যথোচিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ ছাড়াও বিশ্বের আপামর জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিবেশ-সচেতনতা গড়ে তোলা অবশ্য প্রয়োজন। নতুবা আমাদের প্রিয় নীল গ্রহটির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে।

বিশ্বের দিকে দিকে জল, বায়ু, মৃত্তিকা দূষিত হয়ে পড়ছে। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং অন্যান্য কয়েকটি গ্যাসের (গ্রীন হাউস গ্যাসের) পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে ভূতাপমাত্রা বৃদ্ধির আশঙ্কা এবং পরিণামে মেরু অঞ্চলের সঞ্চিত বরফ গলে সমুদ্র জলতল স্ফীত হয়ে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ক্ষতিকারক

রাসায়নিকের আঘাতে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর বিশ্বের কোনও কোনও স্থানে ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে আসায় সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির বায়ুস্তর ভেদ করে বিপজ্জনক মাত্রায় ভূপৃষ্ঠে পৌঁছে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যার ফলে বহু অঞ্চলে অনেকেই চামড়ার ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। অপরদিকে বিভিন্ন স্থানে বনভূমি দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকায় মরু বিস্তারের সম্ভাবনা বাড়ছে, ভূমিক্ষয় দ্রুততর হচ্ছে, একদিকে খরা অন্যদিকে বন্যার সম্ভাবনা বাড়ছে। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিতে কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ কমে আসছে। পৃথিবীর খনিজ সম্পদ ভাণ্ডার জীবাশ্ম জ্বালানী ভাণ্ডার সহ দ্রুত নিঃশেষের পথে, জ্বালানী সঙ্কট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের অজস্র প্রজাতি ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত বা বিলুপ্তির সম্ভাবনায়, ফলে পার্থিব বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য নিদারুণভাবে বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।

এই ধরনের অজস্র সমস্যা আজ পার্থিব পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। উল্লেখ্য যে পার্থিব পরিবেশে এই যেসব সঙ্কট দেখা দিচ্ছে সেগুলির বড়ো অংশই প্রকটভাবে দৃশ্যমান হয়েছে গত প্রায় ষাট বছরে। (মনে রাখতে হবে পৃথিবীর ন্যূনতম বয়স সাড়ে চারশো কোটি বছর, পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি বছর আগে আর এই গ্রহে মানুষের আবির্ভাব প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে)।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রাক্তন মহাসচিব উ. থান্টের মতে পার্থিব পরিবেশে ঘনীভূত সঙ্কটের মূল কারণ তিনটি ঃ জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ন এবং প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ, বিশেষত এগুলি সুপরিকল্পিতভাবে না হওয়া। যাই হোক না কেন, পৃথিবীর পরিবেশ যাতে আর ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় সেজন্য পরিবেশ সম্পর্কিত এতাবৎ অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলির সুপারিশসমূহের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে আশু ব্যবস্থাদি নেওয়া অত্যাবশ্যক তো বটেই সেই সঙ্গে আপামর জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক পরিবেশ-সচেতনতা গড়ে তোলা জরুরী সব রকমের পন্থার মাধ্যমে, সর্বস্তরের সব ধরনের শিক্ষার মধ্যদিয়েও।

পরিবেশ-শিক্ষা কীভাবে

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয় শিক্ষার স্তরে পরিবেশ-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিতর্ক না থাকলেও কীভাবে এই শিক্ষা দেওয়া হবে সে বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ বিতর্ক ছিল ঃ পাঠ্যক্রমে একটি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয় হিসেবে পরিবেশ-সম্পর্কিত ধ্যানধারণা প্রদানের মাধ্যমে উপযুক্ত স্থানে (plug point-এ) পরিবেশ-সম্পর্কিত ধ্যানধারণা প্রদানের মাধ্যমে পরিবেশ-শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের রায় এবং নির্দেশ অনুসারে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের এ বিষয়ে নমুনা পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং সুপারিশের পর এই বিতর্ক এখন নিরর্থক হয়ে পড়েছে। এখন, আমাদের প্রচেষ্টা চালাতে হবে মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুসারে বিদ্যালয় শিক্ষার সর্বস্তরে কীভাবে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে, অবশ্যপাঠ্য হিসেবে পরিবেশ-শিক্ষার প্রচলন সম্ভব করা যায় সে সম্পর্কিত পরিকল্পনা করা ও সেটি দ্রুত রূপায়ণ করা।

তবুও ভারতের মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুসরণ করেই কী কী ভাবে পরিবেশ-শিক্ষা বিদ্যালয়গুলিতে দেওয়া সম্ভব সে বিষয়ে সামান্য আলোচনার প্রয়োজন আছে।

বিদ্যালয়ে পরিবেশ-শিক্ষা প্রদানের সম্ভাব্য প্রকরণ হতে পারে ঃ

১। পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচিতে পৃথক বিষয় হিসেবে,

২। পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচিতে ইতিপূর্বেই অন্তর্ভুক্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির মধ্যেই উপযুক্ত স্থান চিহ্নিত করে সেইসব স্থানে পরিবেশ-সম্পর্কিত ধ্যানধারণা প্রদানের মাধ্যমে,

৩। পরিবেশ-বিষয়ক প্রকল্প রূপায়ণ সহ সুপরিকল্পিত কিছু সহ-পাঠক্রমিক এবং পাঠ্যক্রমের বাইরেও সম্পাদনীয় কাজকর্ম পরিচালনার মাধ্যমে এবং

৪। ওইসব ব্যবস্থাগুলিরই মাধ্যমে।

ভারতের মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুসারে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ কর্তৃক বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের যে মডেল পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করেছেন এবং কীভাবে পরিবেশ-শিক্ষা প্রদান করা হবে সে সম্পর্কে যে সুপারিশগুলি রেখেছেন (যেগুলি মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট অনুমোদন করেছেন) সেগুলির কয়েকটি হল ঃ

(ক) প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে বিজ্ঞান-বিষয়ক পঠন-পাঠনের মাধ্যমেই পরিবেশ-শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে।

(খ) উচ্চ প্রাথমিক স্তরেও বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করে পরিবেশ-শিক্ষা দেওয়া যাবে।

(গ) নবম-দশম শ্রেণিতে এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে নির্দিষ্ট পৃথক বিষয় হিসেবে পাঠ্যক্রমে পরিবেশ-শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং এই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের রাজ্যের বর্তমান ব্যবস্থার সামান্য পর্যালোচনা প্রয়োজন।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ-শিক্ষা

আমাদের রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে সমগ্র শিক্ষাক্রম-পাঠ্যসূচি পরিকল্পিতই হয়েছে পারিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি (environmental approach) নিয়ে। পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সমস্ত বিষয়গুলির মাধ্যমেই পরিবেশ-শিক্ষার এবং পরিবেশ-সচেতনতা গঠনের উপাদান ও সুযোগ রাখা হয়েছে। যেমন, স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা বিষয়ের সঙ্গে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজের মধ্যে, পঠন-পাঠন নির্ভর বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে। তবে একেবারে পৃথক বিষয় হিসেবেই পরিবেশ-পরিচিতি রয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য, যে বিষয়টিতে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সমন্বিতভাবে শেখা ও শেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে। তৃতীয় শ্রেণি থেকে প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রকৃতি বিজ্ঞান বিষয়ে এবং সামাজিক পরিবেশ ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নবীকৃত শিক্ষাক্রম-পাঠ্যসূচিতে মূল্যবোধ গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে যেসব আবশ্যিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে পরিবেশ ভাবনা (concern for the environment) এবং পরিবেশের উপাদানগুলির সঙ্গে সুসমঞ্জস সম্পর্ক বিধান করে চলতে শেখার (learning to live together) উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ সম্পর্কে ছোটোখাটো প্রকল্পের পরিকল্পনা ও রূপায়নের নির্দেশিকাও এই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে রয়েছে।

অতএব উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমন কোনও বড়ো ধরনের সমস্যা দেখা দেবে না। তবে পরিবেশ সম্পর্কে এবং পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষার উপর এই স্তরে যতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে পরিবেশের জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বভাবতই হয়তো ঠিক ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় নি, পাঠ্য/কৃত্য বিষয়ে এই দিকটির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

প্রারম্ভিক শিক্ষাস্তরে

উচ্চ প্রাথমিক স্তরে বা নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) পরিবেশ-শিক্ষা সম্পর্কে প্রায় একই কথা প্রযোজ্য। এই স্তরে পৃথক বিষয় হিসেবে পরিবেশ-শিক্ষা পাঠ্যক্রমে না থাকলেও পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যেই বহুল পরিমাণেই পরিবেশ-শিক্ষার উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, বিশেষ করে জীবনবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান এবং ভূগোলের পাঠ্যসূচিতে যথাযথ স্থানে পরিবেশ-সম্পর্কিত ধ্যানধারণা প্রদত্ত হয়েছে — বিষয়টিতে আরও গুরুত্ব দেবার সুযোগ অবশ্যই রয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ-শিক্ষা

আসলে, সমস্যা হল নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাস্তরের ক্ষেত্রে, কারণ বলে দেওয়া হয়েছে নবম-দশম শ্রেণিতে এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে পৃথক আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পরিবেশ-শিক্ষার ব্যবস্থা করতেই হবে। এই অবস্থায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ্যক্রমে পরিবেশ-শিক্ষা পাঠ্যসূচি/কৃত্যসূচি সংযোজন ভিন্ন গত্যন্তর নেই। এ বিষয়ে কয়েকটি প্রধান সমস্যার মোকাবিলার কথা আমাদের ভাবতে হবে : (ক) পাঠ্যক্রম খুব বেশি ভারাক্রান্ত না করে কীভাবে পরিবেশ বিষয়টি রাখা যায়, (খ) কোন্ শিক্ষকেরা পরিবেশ বিষয়টি শেখাবেন এবং (গ) মূল্যায়ন ব্যবস্থা কীভাবে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যাবে, (ঘ) শ্রেণিদিবস আর না বাড়িয়ে এই নতুন বিষয়টি শেখা-শেখানোর ব্যবস্থা করা যাবে কীভাবে ইত্যাদি।

প্রথম সমস্যাটি সম্পর্কে কারও কারও পরামর্শ হল ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির মধ্যে পরিবেশ-শিক্ষার যে উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে, সেগুলিকে ওই বিষয়গুলি থেকে নিয়ে এসে পৃথক পরিবেশ-শিক্ষা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই প্রতিবেদকের মতে, প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবেশ-সম্পর্কিত যে বিষয়বস্তু বা ধারণা এসে গেছে সেগুলি সম্পূর্ণভাবে সেখান থেকে বাদ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনতরো দু-একটি বিষয়বস্তু সরিয়ে এনে পৃথক পরিবেশ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, আর মূল পরিবেশ-পাঠ্যসূচিকে খুব বেশি ভারাক্রান্ত না করে পরিবেশ-শিক্ষার কেবলমাত্র অত্যাবশ্যক উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয় হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তরে বলা যায় যে যেহেতু বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ-সচেতনতা গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য, তাঁদের পরিবেশ-বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তোলা উদ্দেশ্য নয়, কাজেই যে কোনও শিক্ষক/শিক্ষিকা বা সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাই এই বিষয়টি পড়াতে/শেখাতে পারবেন যদি কিনা সুপরিকল্পিতভাবে এ বিষয়টির পঠন-পাঠন পরিচালনা

সম্পর্কে তাঁদের অভিমুখীকরণের/স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। এ বিষয় পর্ষদকে/সংসদকে শিক্ষক সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনা করতে হবে যাতে শিক্ষক সমাজের মধ্যে এ বিষয়ে কোনওরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হয় এবং তাঁদের কাজের ভার খুব বেশি না হয়ে যায়।

মূল্যায়নের প্রশ্নটিতে যাবার আগে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষায় পরিবেশ-শিক্ষার কোন্ ধরনের উপাদানগুলি অবশ্যই থাকা দরকার সে সম্পর্কিত কিছু প্রস্তাব বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হল ঃ

- পরিবেশ-শিক্ষার উপাদানগুলি অবশ্যই শিক্ষাস্তর ভেদে বিভিন্ন রূপ হবে, তবে সকল স্তরেই পরিবেশ সম্পর্কে, পরিবেশের মাধ্যমে এবং পরিবেশের জন্য — এই তিনটি দিকের শিক্ষার আয়োজনই রাখতে হবে ; তৃতীয় দিকটি স্বাভাবিকভাবে ক্রমান্বয়ে নিম্ন থেকে উচ্চতর পর্যায়ে অধিকতর গুরুত্ব পাবে।
- সামাজিক এবং প্রাকৃতিক বা ভৌত পরিবেশ, অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে অভিন্ন পরিবেশ হিসেবে পরিবেশ-শিক্ষার ব্যবস্থা প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত সর্বস্তরেই রাখতে হবে।
- সর্ব পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতেই পরিবেশের নান্দনিক এবং সমস্যার দিক — উভয়দিকেরই প্রতিফলন কাম্য। পরিবেশ-সমস্যার মূলত তিনটি দিক, যথা পরিবেশ-দূষণ, প্রাকৃতিক পরিবেশ-সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহের দ্রুত অবলুপ্তি — এই সবগুলিই পাঠ্য/কৃত্যসূচিতে প্রতিফলিত করা প্রয়োজন।
- সামাজিক এবং প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রসমূহের ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা, একসাথে মিলেমিশে থাকতে শেখার বিষয়টি সিলেবাসে রাখা উচিত হবে।
- প্রতি স্তরের শিক্ষায় পরিবেশ-শিক্ষার সিলেবাসে এই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি (ক্রমান্বয়ে স্থানীয়, জাতীয় এবং বিশ্বপর্যায়ে) অবশ্যই উল্লেখিত হওয়া প্রয়োজন।
- শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়েই শিক্ষার্থীদের মানসিক এবং বৌদ্ধিক স্তর অনুযায়ী পাঠ্যবিষয় এবং প্রকল্প রূপায়ণ সহ কৃত্যবিষয়ও (activities) পরিবেশ-শিক্ষার সিলেবাসে রাখা দরকার।

সাধারণভাবে বিদ্যালয় শিক্ষার স্তরে পরিবেশ-শিক্ষার কয়েকটি সম্ভাব্য উপাদানের বিষয় উল্লেখিত হল। একথা বলাই বাহুল্য যে শিক্ষার স্তর অনুযায়ী স্থির করতে হবে কোন্ স্তরে কোন্ উপাদানগুলি এবং সেগুলির কতটুকু রাখা প্রয়োজন। কোথাও কোথাও সংযোজন, কোথাও কোথাও বা বিয়োজনের প্রয়োজন অবশ্যই হবে। এখানে সামগ্রিকভাবে একটি রূপরেখা মাত্র উপস্থাপিত হল ঃ

(১) **পরিবেশ ঃ** এর অর্থ এবং সংজ্ঞা, সজীব এবং জড় উপাদানসমূহ, বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ সমস্যা এবং সেগুলির মূল উৎস বা কারণসমূহ, মানব সভ্যতার বিকাশ ও পরিবেশের পরিবর্তন।

(২) **প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রসমূহ ঃ** বাস্তুতন্ত্রগুলির ভারসাম্য বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা এবং তার সম্ভাব্য ক্ষতিকারক ফলাফল, বনভূমির বাস্তুতন্ত্র, জলাভূমির বাস্তুতন্ত্র, সামাজিক বাস্তুতন্ত্র।

(৩) **জনসংখ্যা এবং পরিবেশ ঃ** পরিবেশের উপর জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির প্রভাব, দারিদ্র্য, প্রাচুর্য্য ও ভোগবাদ এবং পরিবেশ, উন্নয়ন, প্রযুক্তি ও পরিবেশ-টেঁকসই (sustainable) উন্নয়ন।

(৪) **প্রাকৃতিক সম্পদরাজি ঃ** পূরণযোগ্য ও অপূরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ, প্রাকৃতিক সম্পদগুলির বিলুপ্তির সমস্যা, জলসঙ্কট সম্ভাবনা, শক্তির সাধারণ উৎসগুলি এবং শক্তি সঙ্কট, অপ্রচলিত বা অপ্রথাগত শক্তি উৎসসমূহ।

(৫) **পরিবেশ-দূষণ ঃ** বায়ুদূষণ-অম্লবৃষ্টি, ধোঁয়াশা/গ্রীন হাউস এফেক্ট, ওজোনস্তর পাতলা হয়ে যাওয়া, জলদূষণ, শব্দ দূষণ, মৃত্তিকাদূষণ এবং মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাস/প্লাস্টিক দ্রব্যাদির অবাধ ব্যবহারে মৃত্তিকার ক্ষতি।

(৬) **পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য ঃ** জনস্বাস্থ্যের উপর পরিবেশ দূষণের প্রভাব, অন্যতর পরিবেশ সমস্যার প্রভাব। বায়ুবাহিত, জলবাহিত রোগব্যাধি, মাটিতে কীটনাশক, অজৈব সার ব্যাপকভাবে অপব্যবহারের কুফল।

(৭) **পরিবেশ-সম্পর্কিত মারাত্মক কয়েকটি দুর্ঘটনা ও পরিবেশ-সম্পর্কিত আইন ঃ** প্রচলিত আইনসমূহ, অনুসরণীয় আচরণবিধি, কয়েকটি দুর্ঘটনা, ভারতে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পরিবেশ আন্দোলনের ঘটনা।

প্রকল্প এবং অন্যবিধ দু-একটি প্রস্তাবিত কাজ হতে পারে ঃ

- **পরিবেশ সমীক্ষা ঃ** (শিক্ষার স্তর অনুযায়ী নিকট পরিবেশ, গ্রাম/শহরের ওয়ার্ডের পরিবেশ, বৃহত্তর পরিবেশ) জনসংখ্যার অবস্থা, মানুষের পেশা, জল সরবরাহ ব্যবস্থা, নিকাশী ব্যবস্থা, জঞ্জাল অপসারণ ব্যবস্থা, গাছপালা-

বাগবাগিচা-পার্ক-বনভূমি এসবের অবস্থা, শিল্প কলকারখানা, যানবাহন ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ক।

- **ছোটোখাটো কিছু পরীক্ষাদি ঃ** জল আম্লিক না ক্ষারীয়, বায়ু আম্লিক কিনা, বায়ুতে বিষাক্ত কিছু আছে কিনা এসব বিষয়ক পরীক্ষা, মাটি পরীক্ষা, শব্দদূষণের মাত্রা পরীক্ষা।
- **কিছু কর্মসূচি পালন ঃ** বৃক্ষরোপণ ও সঠিক রক্ষণ, বাগান তৈরি, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক প্রদর্শনীর আয়োজন, মডেল প্রদর্শনী ইত্যাদি।
- **পর্যবেক্ষণ ঃ** গোবর গ্যাস প্লান্ট, সৌরশক্তির প্রয়োগ, বনজঙ্গল, বন্যপ্রাণী-উদ্ভিদ, চাষের ক্ষেত, শিল্প কারখানা, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি।
- দু-একটি পারিবেশিক অসুখের উৎস সন্ধান ইত্যাদি ইত্যাদি।

মূল্যায়ন

প্রারম্ভিক পর্যায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে (অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) পরিবেশ-শিক্ষার মূল্যায়ন আন্তর্মূল্যায়নেই সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে। তবে পাঠ্য অংশের মূল্যায়নে (নম্বর সহ) পরোক্ষ গ্রেড পদ্ধতি (৫ বিন্দুমাত্রিক স্কেলে) এবং পরিবেশ-সম্পর্কিত প্রকল্প সহ কৃত্য (সম্পাদনীয় কাজকর্ম) অংশের ক্ষেত্রে (নম্বর প্রদান ব্যতীত) প্রত্যক্ষ গ্রেড পদ্ধতি (৪ বিন্দুমাত্রিক স্কেলে) অনুসৃত হতে পারে। এছাড়া সার্বিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি এই পর্যায়ে অবশ্যই কাম্য। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে বহিপরীক্ষা আদৌ রাখা হবে কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক চলছে। তবে এই প্রতিবেদকের নিছকই ব্যক্তিগত মত হল অন্যান্য বিষয়ের মতো এ বিষয়টিরও বহির্মূল্যায়ন হওয়া উচিত পাঠ্য অংশের ক্ষেত্রে পরোক্ষ গ্রেড পদ্ধতি অনুসরণ করেই, আর পরিবেশ-সম্পর্কিত করণীয় কাজকর্মের ক্ষেত্রে আন্তর্মূল্যায়ন হওয়া উচিত ৪ বিন্দুমাত্রিক পরোক্ষ গ্রেড পদ্ধতিই অনুসরণ করে (একসাথে মিলেমিশে কাজ করতে পারা, নেতৃত্ব দেবার সামর্থ্য, প্রকল্প রূপায়ণে বা অন্যবিধ কাজকর্মে দক্ষতা প্রদর্শন, কাজকর্মের গুণগত মান, আচার আচরণগত পরিবর্তন এসব নিয়মিতভাবে লক্ষ্য করে গ্রেড প্রদান করা যেতে পারে। বহিপরীক্ষা যদি আদৌ গ্রহণ করা হয় এবং সেক্ষেত্রে যদি পরিবেশ-শিক্ষা বিষয়ে পূর্ণমান ৫০ রাখা হয় তবে ৪০ নম্বর লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে এবং ১০ নম্বর প্রকল্প এবং অন্যবিধ কাজকর্মের জন্য রাখা যেতে পারে। (১০০ নম্বরের পত্র হলে এই নম্বর বিভাজন হতে পারে ৮০+২০)।

প্রান্তীয় মন্তব্য

বিদ্যালয়ে পরিবেশ-সম্পর্কিত যেসব বিষয় এখানে কিছুটা আলোচিত হল সে সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সংসদ বা পর্ষদগুলি, একথা বলাই বাহুল্য। তবে বিদ্যালয় শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকলেই, বিশেষ করে শিক্ষক সমাজ যাতে এই মুহূর্তেই চিন্তাভাবনা শুরু করেন এবং তাঁদের সুচিন্তিত মতামত বা পরামর্শ প্রদান করেন মূলত সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই প্রবন্ধের অবতারণা। ভারতের মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের রায় অনুসরণের বাধ্যবাধকতা ছাড়াও পরিবেশ বিষয়টি যথাসম্ভব গুরুত্ব দিয়ে যথাযথভাবে যাতে এর পঠন-পাঠন পরিচালিত হতে পারে সেজন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার কথা আমাদের এখুনই ভাবতে হবে।

- শিক্ষার দাবী জাতীয় দাবী।
- শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাজেটের দশ শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে।
- শিক্ষাকে রাজ্য তালিকায় ফিরিয়ে দিতে হবে।

ব্লকস্তরে প্রাক্-মামলা সালিশী বোর্ড চাই গরিব মানুষের স্বার্থেই

সত্য সাউ

প্রাক্-কথা

২রা আগস্ট, ২০০৪ তৃণমূল কংগ্রেস বিধানসভায় পেশ করা "ব্লকস্তরে প্রাক্-মামলা সালিশী বোর্ড বিল, ২০০৪"-এর বিরোধিতায় অন্যায্য বাংলা বন্ধ ডেকেছিল। ২রা আগস্টের অনৈতিক বাংলা বন্ধে পশ্চিমবাংলার জনগণের বৃহত্তর অংশ খারিজ করেছিল। তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রের বি জে পি-পরিচালিত এন ডি এ সরকারের অন্যতম শরিক ছিল। বি জে পি-পরিচালিত এন ডি এ বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন না থাকলেও তৃণমূল কংগ্রেস এখনো এই জোটের শরিক। অথচ পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার বিলটি ২০০২ সালে বিধানসভায় পেশ করার আগে বিলটির খসড়া প্রতিলিপি কেন্দ্রীয় বি জে পি-জোট সরকারের কাছে পাঠায়। কারণ এই ব্যাপারে কেন্দ্রের সরকারের কোন আপত্তি আছে কিনা জানার জন্য। ২০০৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারীকে একটি পত্র দেন কেন্দ্রীয় সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারী পি পি মুরলীধরণ। ঐ পত্রে রাজ্য সরকারকে পরিষ্কার লিখে দেওয়া হয়েছিল 'ব্লকস্তরে সালিশী বিল' বিধানসভায় পেশ করার ব্যাপারে ভারত সরকারের কোন আপত্তি নেই। অথচ এন ডি এ সরকারের অন্যতম শরিক দল হয়ে তখন আপত্তি না তুলে বর্তমানে বিলটির বিরোধিতায় কোমর কষে নেমে পড়েছে।

স্বাধীনতার পর ১৯৫৭ সালে পঞ্চায়েত আইনে গ্রাম্যস্তরে সালিশী ও বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সেখানে বিচারে আইনজীবীদের থাকা নিষিদ্ধ আছে। ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ন্যায় পঞ্চায়েতের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। ন্যায় পঞ্চায়েতে নির্বাচনের দ্বারা বিচারক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। সেখানেও আইনজীবীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

১৯৭৬ সালে ইন্দিরা গান্ধীর সময় সংবিধান সংশোধন করে ৩৯(ক) অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়েছে। অনুচ্ছেদটিতে সম-সুযোগের মাধ্যমে বিচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৩৯(ক) অনুচ্ছেদের পথ ধরেই ১৯৮৭ সালে "লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি এ্যাক্ট" চালু হয়েছিল। উক্ত আইনে লোক আদালতের মাধ্যমে মামলা মহকুমা স্তর পর্যন্ত মিটিয়ে ফেলার বিধান রয়েছে। 'লিগ্যাল সার্ভিস এ্যাক্ট-৮৭' চালু হয়েছিল রাজীব গান্ধীর কংগ্রেসী রাজত্বে। আজকের তৃণমূল নেত্রী ও নেতারা তখন কংগ্রেস দলভুক্ত ছিলেন অথচ তখন এর কোনপ্রকার বিরোধিতা করেন নি।

তৃণমূলী বন্ধের পেছনের রাজনীতি

তাহলে আজ তৃণমূল কংগ্রেস, বি জে পি এবং রাজ্য কংগ্রেস 'ব্লক স্তরের সালিশী বিলের' বিরোধিতায় নামলো কেন? এর পশ্চাতে রাজনীতিটাই বা কি?

২০০৪ সালের ১০ই মে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র ভারতবর্ষের চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। কেন্দ্রে বি জে পি (বকলমে আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরঙ দল) পরিচালিত এন ডি এ সরকার 'ফিল গুড ফ্যাক্টর', 'ইণ্ডিয়া সাইনিং' প্রভৃতি আওয়াজ তুলে পুনরায় দিল্লীর গদীতে আসীন হওয়ার জন্য লোকসভার পূর্ণ মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই নির্বাচনের ডাক দেয়। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় বিধানসভার নির্বাচনে তাদের জোট জয়লাভ করায় তারা এই ধারণার বশবর্তী হয়েছিল যে তারা অতি সহজেই লোকসভা নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়ে যাবে। ফল হয়েছিল বিপরীত। তারা ৫% ভোট পূর্বের তুলনায় কম পায় এবং পূর্বের তুলনায় শতাধিক আসনেরও ঘাটতি হয়। অর্থাৎ বি জে পি-জোট কেন্দ্রের ক্ষমতা থেকে ছিটকে যায়।

ভারতবর্ষের জনগণ তাদের অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন যে, কেন্দ্রে বি জে পি-জোট শাসনের অর্থই হলো জনজীবনে

রুজি, রুটি, বাসস্থান এবং শিক্ষার উপর আক্রমণ, অধিকার হরণ, সংখ্যালঘু নিধন এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিকট নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ। উদারীকরণ-বেসরকারীকরণের অজুহাতে লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে জলের দরে বিক্রি, কলকারখানা বন্ধ করে লক্ষ লক্ষ বেকার সৃষ্টি করা, হিন্দুরাষ্ট্র গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শিশু-ছাত্রদের মগজ ধোলাই করার জন্য শিক্ষাকে গৈরিকীকরণ এবং ইতিহাসকে বিকৃতিকরণ, গুজরাটে সংখ্যালঘু নিধন, শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত বিরোধী অর্থনৈতিক অবস্থান গ্রহণ এবং ধর্মনিরপেক্ষ ও পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে জোটনিরপেক্ষ নীতি পরিত্যাগ করার ফলে চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে জনগণের রায় তাদের বিরুদ্ধে চলে যায়। চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের লক্ষ্য ছিল তিনটি।

এক ; বি জে পি-পরিচালিত এন ডি এ সরকারের নজিরবিহীন অপশাসনের জন্য এদেরকে নির্বাচনে পরাস্ত করতে হবে।

দুই ; বামপন্থীদের লোকসভায় আরও শক্তিবৃদ্ধি করতে হবে।

তিন ; কেন্দ্রে জনদরদী ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গঠন করতে হবে। নির্বাচনে জনগণ সুস্পষ্টভাবে বি জে পি-জোটের বিরুদ্ধে জনদরদী-ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গঠনের রায় দিয়েছে এবং লোকসভায় বামপন্থীদের আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করে ভারতীয় রাজনীতিতে বামপন্থীদের গুরুত্ব ও অবস্থান সুদৃঢ় করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে ২৬ বছরের অধিককাল একনাগাড়ে বামফ্রন্ট রাজ্য সরকার পরিচালনা করছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় উদ্ভূত ফল, কেন্দ্রের লাগাতার বঞ্চনা ও অসহযোগিতা, সর্বোপরি বি জে পি-জোট পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের উদারীকরণ, বে-সরকারীকরণ, বেকারীকরণ এবং সাম্রাজ্যবাদী ও বৃহৎ পুঁজিপতি তোষণ নীতির ফলে এরাজ্যে হতদরিদ্র, নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, এমনকি উচ্চ-মধ্যবিত্তের উপর আর্থিক বোঝা বেড়েছে। সাম্রাজ্যবাদ ও বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থে পরিচালিত সংবাদমাধ্যমগুলি কেন্দ্রের সর্বনাশা নীতিগুলিকে আড়াল করে সমস্ত দায়ভার বামফ্রন্ট সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলে। এটা করা হয়েছিল চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে। লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা তো যায়ই নি, উপরন্তু বি জে পি-তৃণমূল জোট জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে এ রাজ্যে একটিমাত্র আসনে জয়লাভ করেছিল। তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবাংলায় পায়ের নীচের হারানো জমি ফিরে পাওয়ার জন্য বি জে পি'র সমর্থনে অন্যায্য এবং অনৈতিক বাংলা বন্ধ ডেকেছিল। তৃণমূলের বাংলা বন্ধ ডাকার পিছনে এটাই রাজনীতি।

কংগ্রেসীদের অবস্থান

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসীদের অবস্থান হাস্যকর। কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মণিশঙ্কর আয়ার সালিশী বিলকে কলকাতায় বসে সমর্থন করলেও রাজ্য কংগ্রেস তৃণমূল-বি জে পি'র সাথে এক হয়ে বিলটির বিরোধিতায় নেমে পড়েছে। মুখে তারা বাংলা বন্ধ সমর্থন না করলেও তাদের কর্মীদের রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বন্ধের সমর্থনে এগিয়ে আসতে দেখা গিয়েছিল। ১৬ই জুলাই, শুক্রবার, তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস বিধায়করা বিলের বিরোধিতায় বিধানসভা কক্ষ ত্যাগ করে এবং বিধানসভা লবিতে সালিশী বিলের প্রতিলিপি পোড়ান। তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস-নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিল এই বিলের সক্রিয় বিরোধিতায় নেমে পড়েছে। তাদের কাছে এই বিল গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ আইনজীবীরা আতঙ্কিত। এই বিল গৃহীত হলে তাদের হাতে আসা মামলার সংখ্যা কমে যাবে।

বিলটি আনার কারণ

বিলটি কেন আনা হচ্ছে সেই সম্পর্কে খসড়া মুখবন্ধে বলা হয়েছে ঃ "লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটিজ" আইনে ব্লকস্তরে প্রাক্-মামলাপর্বে বিবাদ মেটানো বা মামলাপর্বে আদালতের বাইরে বিবাদ মেটানোর কোন সংস্থান নেই। রাজ্যের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কথা ভেবে এই কারণেই ব্লকস্তরে এই সালিশী বোর্ড তৈরীর জন্য একটি আইনের প্রয়োজন আছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৯৫ সাল থেকে বিভিন্ন রাজ্যে বহু 'লোক আদালত' চালু হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় আদালতে আসার আগে বহু বিরোধ লোক আদালতে মিটে যাচ্ছে। ব্যয়বহুল, দীর্ঘসূত্রী জটিল পদ্ধতির আদালতী বিচারের বিকল্প হিসাবে 'লোক আদালত' ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। পশ্চিমী দুনিয়ায় 'লোক আদালতে'র বিষয়টা সাড়া ফেলে দিয়েছে। বাণিজ্যিক দেওয়ানী কার্যবিধিতে নতুন ৮৯ ধারা সংযোজিত হয়েছে যাতে আদালতের সিদ্ধান্তের আগে আপোস আলোচনার সুযোগ থাকে।

কিন্তু এই লোক আদালতগুলি মহকুমা স্তরের নিচে যেতে পারে না। অথচ আমাদের মতো গ্রাম-প্রধান দেশে গ্রামভিত্তিক সালিশী ব্যবস্থাকে আইনী স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে সেগুলিকে গ্রামের প্রভাবশালী পরম পাকা

ব্যক্তিদের হাত থেকে এবং গ্রাম্য কায়েমী স্বার্থের অক্টোপাশ থেকে মুক্ত করে উন্নতমানের আইনী ব্যবস্থার মধ্যে আনা জরুরী।

সালিশী বোর্ডের কাঠামো ও বিষয়বস্তু

রাজ্য লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি এবং জেলা প্রশাসনের পরামর্শমত ও সুপারিশক্রমে পঞ্চায়েত সমিতি সালিশী বোর্ড গঠন করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি এমন একটি সংস্থা যার শীর্ষে আছেন হাইকোর্টের বিচারপতিরা এবং জেলার ক্ষেত্রে জেলার বিচারকরা। তাছাড়া, বোর্ডের সদস্যদের যোগ্যতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়া আছে এই বিলে। বড় ব্লক হলে একাধিক বোর্ড গঠন করা যাবে।

বোর্ডে একজন সালিশীকারী, একজন শিক্ষণপ্রাপ্ত সালিশী আইন উপদেষ্টা এবং একজন আইনজ্ঞ থাকবেন। বোর্ডের সেক্রেটারী হবেন স্থানীয় বি ডি ও বা তাঁর অধীনস্থ কোন অফিসার। বোর্ডের সদস্যদের দু'বছরের জন্য নিয়োগ করা যাবে।

বোর্ডের কোন সদস্যকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা পঞ্চায়েত সমিতির হাতে থাকবে।

যথেষ্ট কারণ ছাড়া কোন সদস্য যদি পরপর তিনটি সভায় গড়হাজির হন, কোন সদস্য যদি কোন কারণে দণ্ডিত হন এবং পঞ্চায়েত সমিতি যদি মনে করে, তাতে তাঁর নৈতিক বিচ্যুতি ঘটেছে, কেউ যদি শারীরিক বা মানসিকভাবে সদস্যপদের অযোগ্য বিবেচিত হন, যদি তাঁর পদের অপব্যবহার করেন তাহলে পঞ্চায়েত সমিতি সংশ্লিষ্ট সদস্যকে সরিয়ে দিতে পারবে।

পঞ্চায়েত সমিতির নিয়ন্ত্রক তার সভাপতি। বোর্ডের আওতায় গর্হিত ফৌজদারী বিষয় ছাড়া সব বিরোধ আসতে পারে। বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যা, জমি জায়গা সমস্যা, বাড়ীওয়ালা-ভাড়াটে সমস্যা, গ্রাম্য ঝগড়া, মারপিট প্রভৃতি সালিশী বোর্ডের আওতায় আসতে পারে। এই বোর্ড বাধ্যতামূলক নয়। কেউ চাইলে এর সহায়তা নিতে পারেন। কেউ ইচ্ছা করলে বোর্ডের সহায়তা না নিয়ে সরাসরি আদালতে যেতে পারেন। কোন ব্যক্তি সালিশীর পর সালিশী প্রক্রিয়ায় সন্তুষ্ট না হলে তাঁর আদালতে যাবার অধিকার সব সময় থাকছে।

সালিশী মীমাংসায় যে কোন পক্ষ আইনজীবীদের সহায়তা নিতে পারবেন। একপক্ষ সহায়তা নিলে অন্যপক্ষও আইনজীবীর সহায়তা নিতে পারবেন।

সালিশী বিলের মূললক্ষ্য বিরোধ নিষ্পত্তি, মামলা নয় ; অর্থাৎ আপোস, চিরশত্রুতা নয়।

ভারতবর্ষে সালিশী প্রথায় বিরোধ নিষ্পত্তি অতি প্রাচীন প্রথা। পৃথিবীর নানা প্রান্তে এই ব্যবস্থা চালু আছে। এই বিলের মূললক্ষ্য হলো ঃ গ্রাম্য সালিশী ব্যবস্থাকে আইনী স্বীকৃতি দেওয়া, যোগ্য লোক দিয়ে সালিশী করানো। গ্রামের দরিদ্র মানুষকে মামলার জন্য অযথা হয়রানি, সময় ও অর্থের অপচয়ের হাত থেকে বাঁচানো। এটা স্মরণ রাখা দরকার ৯৫ ভাগ গ্রাম্য বিরোধ সালিশীর মাধ্যমে মিটে যায় কিন্তু এই সালিশীর কোন আইনী স্বীকৃতি থাকে না। প্রস্তাবিত বিল অনুযায়ী সেই গ্রাম্য সালিশীকে আইনের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং যাঁরা সালিশী করবেন তাঁদের যোগ্যতার মাপকাঠি ঠিক করে এই সালিশী ব্যবস্থার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিরোধী বি জে পি, তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস এই বিলের বিরোধিতায় বার কাউন্সিলকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। বিরোধীদের বক্তব্য বিলটি সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক, দলীয় স্বার্থ মজবুত করার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। তৃণমূল কংগ্রেসের মতে, এই বিল আইনে পরিণত হলে 'বিরোধী রাজনীতি করলেই সি পি আই (এম) গ্রামে গ্রামে সবাইকে জেলে পুরে দেবে। সালিশী বিল এসমার চেয়েও ভয়ঙ্কর, এমারজেন্সির চেয়েও ভয়ঙ্কর, এই বিল ফাঁসির বিল।' এই বিলের উদ্দেশ্য নাকি আদালতের, আইনজীবীদের এবং মানুষের আদালতে যাওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া।

এই অসত্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগগুলি নিয়ে গ্রামবাংলার জনগণের দ্বারা পরিত্যক্ত তৃণমূল কংগ্রেস বামফ্রন্ট সরকারের পেশ করা সালিশী বিলের বিরোধিতায় গ্রামে গ্রামে লেটো গানের আসর বসাতে চাইছে।

সালিশী বোর্ড গঠনের পক্ষে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিমত

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং সুপ্রিম কোর্টের অভিজ্ঞ বিচারপতিরাও মনে করেন আদালতের বিকল্প হিসাবে দরিদ্র মানুষের স্বার্থে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে আইনী সালিশী ব্যবস্থা থাকা দরকার। 'সুপ্রিম কোর্ট কেসেস' নামের একটি সাপ্তাহিকীর গত ১৪ই জুন সংখ্যায় 'জুডিসিয়াল রিফর্মস ইন জাস্টিস ডেলিভারি সিস্টেম' শিরোনামে প্রকাশিত একটি লেখায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সত্যব্রত সিন্‌হা বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে সারা দেশেই সালিশী ব্যবস্থাকে চালু করার কথা বলে মন্তব্য

করেছেন, 'একশো কোটি মানুষের দেশ আমাদের। মৌলিক প্রশ্নটাই হলো, এত মানুষকে সুবিচার দেওয়ার জন্য বিচারব্যবস্থার কাঠামোটা কি হবে?' তাঁর মতে, 'সুবিচার দেওয়ার পথে প্রধানতম বাঁধাই হলো বিচারে বিলম্ব'। তিনি বলেন, 'আমাদের অবশ্যই এমন কিছু ব্যবস্থা দরকার যাতে ১৫ শতাংশের বেশি বিরোধের মামলা শেষপর্যন্ত যেন আদালতের কাছে না আসে। উন্নত দেশগুলিতে তাই করা হচ্ছে। আপোস মীমাংসা, মধ্যস্থতা, সালিশী ইত্যাদি পদ্ধতিতে যেখানে বেশীরভাগ বিরোধের মীমাংসা করে ফেলা হচ্ছে।' রাজ্যের আইনমন্ত্রী নিশীথ অধিকারী বিচারপতি সিন্‌হার মতকে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, ভারতে ৫ কোটির বেশী মামলা জমে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও জমে আছে ১৮ লক্ষের বেশী মামলা। এই অবস্থায় বিচার ব্যবস্থা যাতে ভেঙে না পড়ে তার জন্যই বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা জরুরী। তিনি আরও বলেছেন, সালিশী বিল নিয়ে আইনজীবীদের ভুল বোঝান হচ্ছে যে এতে তাদের পেশা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মোটেই না। আইনজীবীদের উজ্জ্বলতর নূতন ভূমিকায় নামতে হবে। আদালতে প্রচলিত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বিচার ব্যবস্থায় আইনজীবীদের যেরকম ভূমিকা আছে, সালিশীতেও তেমনি ভূমিকা থাকবে। একশো বছর আগের আব্রাহাম লিঙ্কনের উদ্ধৃতি স্মরণ করিয়ে আইনমন্ত্রী বলেন, 'যখনই সুযোগ পাবেন, আপনার প্রতিবেশীদের মামলায় যেতে নিরুৎসাহিত করুন, আপোসে মীমাংসা করতে বলুন। মনে করিয়ে দিন, সামান্য লাভ করতে গিয়ে তিনি সময় নষ্ট করে এবং আর্থিক দিক থেকে অনেক বেশী লোকসান করবেন। শান্তি প্রতিষ্ঠার সৈনিক হিসাবে একজন আইনজীবীর কাছে মহৎ মানুষ হওয়ার অনেক বেশী সুযোগ রয়েছে।' আইনমন্ত্রী গান্ধীজীর উদ্ধৃতিটি তুলে ধরেছেন, "আমার আইন পেশার কুড়ি বছরের সময়কালের একটা বিরাট অধ্যায় কেটেছে কয়েক শো মামলার ব্যক্তিস্তরে মীমাংসা করে দিতে। এতে আমি কোন কিছুই হারাই নি, এমনকি টাকা পয়সাও নয়। অবশ্যই হারায় নি আমার আত্মাকে।"

এব্যাপারে আইন কমিশনের পরামর্শ হলো, ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ গ্রামীণ মামলা গ্রাম ন্যায়ালয়েই নিষ্পত্তি করতে হবে যাতে জেলা ও মহকুমা আদালতগুলি জটিল দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলায় মনোনিবেশ করতে পারে। গ্রামে সবার অংশগ্রহণে নমনীয় পদ্ধতিতে শাস্তিদান ব্যতিরেকে মীমাংসা করার যে পদ্ধতি আছে, গ্রামের মানুষ তার মাধ্যমেই দ্রুত, ন্যায়সংগত এবং কম খরচে নিষ্পত্তি পেতে পারেন।

এরপরও তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস এবং বার কাউন্সিল সালিশী বিলকে বামফ্রন্টের জনবিরোধী চক্রান্ত বলবেন?

আদালত মানুষের জন্য, মানুষ আদালতের জন্য নয়

এটা মনে রাখা দরকার, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত নগরকেন্দ্রিক বিচার ব্যবস্থায় জটিল পদ্ধতির ব্যয়বহুল, দীর্ঘসূত্রী বিচার ব্যবস্থাকে গ্রামের গরীব মানুষেরা বিরোধ মীমাংসার মাধ্যম হিসাবে কখনই গ্রহণ করেন নি। ভৌগোলিক অবস্থানও মূলত শহরকেন্দ্রিক এবং মহকুমা শহরের নীচে কোন আদালত নেই। ফলে গ্রামের গরীব মানুষদের কাজ ছেড়ে শহরে ছোটাছুটি করা সম্ভব হয় না। আদালত বড়লোকদের তামাশা দেখার জায়গা। আজকেও তাবৎ মামলার ৮৭ শতাংশের ক্ষেত্রে বাদী সমাজের বিত্তবান শ্রেণির মানুষ। তাছাড়া গ্রামের গরিব মানুষরা উকিল, মুহুরি এবং ফোড়েদের দ্বারাও লুণ্ঠিত হয়। বস্তুতপক্ষে গ্রাম্য সালিশী ব্যবস্থাকে আইনী স্বীকৃতি দিলে এবং তার মান উন্নীত করলে গ্রামের সাধারণ মানুষ কম হয়রান হবেন। এই উপলব্ধি থেকেই রচিত হয়েছে ব্লক পর্যায়ে সালিশী বোর্ড গঠন বিল। 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদা' বন্ধ করতেই এই বিল।

ভুলে গেলে চলবে না আদালত মানুষের জন্য, মানুষ আদালতের জন্য নয়। যাঁরা বিরোধিতা করছেন তাঁরা আসলে মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে চাইছেন।

তৃণমূল কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধীদের সালিশী বিলের বিরোধিতা পশ্চিমবাংলার দরিদ্র গ্রামীণ জনগণ কখনই মেনে নেবেনা। জনগণের মনের ইচ্ছার কথা না পড়তে পারলে অচিরেই এরা নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে আনবে।

তথ্যসূত্র ঃ গণশক্তি পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ই জুলাই কমিটির ইস্তাহার।

স্মরণীয় তাঁরা

তুষার পঞ্চানন

আই এসসি পরীক্ষা দেবো। শরীরটা বেশ খারাপ। ডাক্তার বিশ্রাম নিতে বলেছেন। কিন্তু মন মানে না। মাষ্টারমশাইরা আন্দোলনে নামছেন—সর্বত্র প্রচার চলছে। সত্যপ্রিয় রায় এবং অনিলা দেবীর নাম শুনেছি রাজ্য নেতৃত্ব হিসাবে। কিন্তু বালুরঘাটের নেতা কে? আমার মাষ্টারমশাইদের মধ্যে কে নেতৃত্ব দিচ্ছেন! তাছাড়া কর্মবিরতি মানেই বা কি! ধর্মঘট তো শুনেছি। কিন্তু কর্মবিরতি! মনটা বড় আন্‌চান্ করতে লাগলো! দুপুরে এক ফাঁকে পালালাম। সবাইকে নিয়ে মিটিং হবার কথা আদর্শ স্কুলে। গিয়ে তো অবাক। নেতা আমাদের পণ্ডিতমশাই—ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। আলাভোলা মানুষ। নাকের নস্যিগুঁড়ো জামার বুকে ছড়াছড়ি। অবাক হলাম তাঁর সুন্দর বক্তৃতা শুনে। ছাত্রদের পক্ষ থেকে আমাকে কিছু বলতে বললেন। আমিও বললাম—সমর্থন জানালাম—ছাত্ররা যে মাষ্টারমশাইদের পাশেই থাকবেন এটা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলাম। যতদূর মনে পড়ে, সেই সভায় ফটিকদা অর্থাৎ ভবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মবিরতি এবং ধর্মঘটের পার্থক্য তাঁর মতো বুঝিয়ে বলেন। চুয়ান্নর সেই স্মরণীয় দশদিনের কথা সবাই জানেন। বিশেষ করে মন্টুবাবুর (শচীন মজুমদার) লেখা বই প্রকাশিত হবার পর পশ্চিম দিনাজপুর জেলার খবরও সবাই জেনেছেন। তখন ঐ জেলার এ বি টি এ সম্পাদক ছিলেন শ্রদ্ধেয় হেমপ্রসন্ন চক্রবর্তী। তিনি কালিয়াগঞ্জে শিক্ষকতা করতেন। ছোটোখাটো দেখতে হলে কি হবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মানুষ। সুখের বিষয় এই যে পরবর্তীকালে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখা করার সৌভাগ্য হয়েছিল। জেলা উত্তর-দক্ষিণে বিভক্ত হবার আগে পর্যন্ত তিনিই সম্পাদক ছিলেন। তাঁর পরে সম্পাদক হন শচীন মজুমদার। হেমদা গত ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ প্রয়াত হয়েছেন। দুঃখের কথা তাঁর আগেই প্রয়াত হন শচীন বাবু। আমার পণ্ডিতমশাইও হেমদার আগেই আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আমি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবার পর তিনি আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। ছাত্রকে শিক্ষকের অভিনন্দন! তাঁর পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র সমিতির একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। প্রয়াত মাষ্টারমশাইদের উদ্দেশ্য জানাই প্রণাম।

সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী তো অনেক উচ্চস্তরের মানুষ। তাঁদের সঙ্গে যে কখনও সভায় বসে মত বিনিময়ের সুযোগ পাবো তা কল্পনাও করিনি। আমি অনেক দেরীতে শিক্ষকতায় এসেছি। আগে সরকারি কর্মচারী ছিলাম। সেখানকার আন্দোলনে সমৃদ্ধ হয়ে আমি শিক্ষক আন্দোলনে যোগ দিই। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসীদের দ্বারা পরিচালিত একটি গ্রামের হাইস্কুলে যোগ দিলাম। নিয়মিত মাস পয়লা বেতনপ্রাপ্তির অভিজ্ঞতা থেকে একেবারে সাপ্তাহিক দক্ষিণা গ্রহণের প্রতিযোগিতা—এ এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। সবাইকে কিন্তু খুব সহজেই সমিতির সদস্য করা গেল। ২/১ জনকে নিয়ে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে অনশনেও এসেছিলাম। দূর থেকে সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী, মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী প্রমুখ নেতাদের দেখলাম—বক্তৃতা শুনলাম। তারপর এল ছেষট্টি সালের কর্মবিরতি। আমার চাকরি এক বছর হয় নি। অনেকেই নিষেধ করেছিল, আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিতে বারণ করেছিল। স্কুলে তো কর্মবিরতি চলছেই। মন মানে না। শেষ দলে মেদিনীপুরে ঢুকে পড়লাম। প্রথমদিন আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সত্যপ্রিয় রায়। এস্‌প্লানেড ইস্টে সভা করে তারপর আইন অমান্য করলেন—কাগজে পড়েছি। শেষদিনে মেদিনীপুর থেকে আমরা এলাম। অবস্থানের জায়গায় অমিতাভ সেন, সমরেশ সেন সব নাম লেখাচ্ছেন। সমিতি বিল্ডিং-এ খেতে এসেছিলাম। মনে আছে—খিচুড়ি আর লেবু। অমৃতের স্বাদ পেয়েছিলাম। আর জীবনের উত্তুঙ্গ প্রেরণা পেয়েছিলাম অনিলাদির বক্তৃতায়। তিনি ওজস্বিনী ভাষায় আমাদের—তাঁর সৈনিকদের—আইন অমান্য আন্দোলনে এগিয়ে যাবার আহ্বান জানালেন। তাঁর সে ভাষা — অশ্রুসজল কণ্ঠে অগ্নিবর্ষী ভাষণ—এ ভাবা যায় না। তাঁর এই ধরনের এক ভাষণ শুনেছিলাম। চন্দ্রকোণা টাউনের এক গ্রামে নির্বাচনী সভায়। সত্যিই তিনি অতুলনীয়। তিনি প্রয়াত হয়েছেন ২৪.২.২০০৩। আর আইন অমান্য আন্দোলনে আমার এক পরমপ্রাপ্তি শ্রদ্ধেয় রথীনদার স্নেহসম্পৃক্ত মধুর সান্নিধ্য। আর পেয়েছিলাম আমার স্কুলের মাষ্টারমশাই অম্বিকা ভাদুড়ীর আকস্মিক সাক্ষাৎ। আমাদের স্কুলের জনপ্রিয় অঙ্কের শিক্ষক কলকাতা চলে এসেছিলেন আমাদের স্কুলের কাজ ছেড়ে দিয়ে। তারপর এতদিন পরে আলিপুর স্পেশাল জেলে দেখা হল। কি সৌভাগ্য আমার। আবার তাঁরই অনুপ্রেরণায় রাত জেগে রিহার্সাল দিয়ে জেলের মধ্যে নাটক করলাম। কি বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে—কোন দাবিই মেটে নি। কারারুদ্ধ সদস্যদের সামলানো দায়। রথীনদা সব্যসাচীর মতো একসঙ্গে সবাইকে সামলাচ্ছেন।

সেই রথীনদার সঙ্গে একই সম্পাদকমণ্ডলীতে ঠাঁই পাবো তা কি কখনও ভেবেছি। আর একজনের কথা বলা হয় নি। গোলোকদার কথা। শ্রদ্ধেয় গোলোকপতি রায় — সমস্ত সভা-সম্মেলনে তাঁকে ছাড়া চলে না। তাঁর জলদ্গম্ভীর কণ্ঠস্বর সবাইকে নাড়িয়ে দেয়। আত্মভোলা এই মানুষটি ছিলেন সমিতির প্রাণ। প্রয়োজনে ভর্ৎসনা করেছেন, আবার আদর করে কাছে টেনে নিয়েছেন। তাঁর ভোলা মন নিয়ে হাসিঠাট্টা হয়েছে তারই সামনে। আবার মধুপুরের ওয়ার্কিং কমিটির সভার পরে তাঁর সেই তাসখেলা আর জ্বলন্ত সিগারেট তোষকে চেপে দেওয়া—সবই মনে পড়ে। শুনেছি তিনি ট্রেনের কামরায় বসে কাপে চা খেয়ে কাপটিকে মাটির ভাঁড়ের মতোই বাইরে নিক্ষেপ করেছিলেন। ১৯৭৮-এর ১১ই ফেব্রুয়ারী শ্রদ্ধেয় সত্যপ্রিয় রায় আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। বামফ্রন্ট সরকার এলো আর তিনি চলে গেলেন। কত কাজ করার ছিল। তখন তিনি ছিলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রশাসক। এর আগে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের তিনি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। সে তো তিনমাসের ব্যাপার। সমিতির এই প্রাণপুরুষের সান্নিধ্য খুবই অল্পসময়ের জন্য পেয়েছিলাম বর্দ্ধমান সম্মেলনের মধ্যে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করতে গিয়ে। এমন সুন্দর বুঝিয়ে কথা বলার মানুষ আর পাবো না। তাঁর সঙ্গে সভা করতে গিয়ে তাঁর ক্ষুরধার যুক্তির সম্মুখীন হয়েছি। কত শিখেছি। ভোলার নয়। যেমন অনিলাদির কাছে শিখেছি প্রত্যেকের চিঠির উত্তর দেবার অভ্যাস। সাধ্যমত সে অভ্যাস এখনও বজায় রেখে চলেছি। এই নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল জেলার কর্মী হিসাবে। সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী, গোলোকপতি রায়, রথীন্দ্রকৃষ্ণ দেব সবার কাছেই উপদেশ পেয়েছি, শিক্ষা পেয়েছি। লিখতে বসলে অনেক কথা মনে পড়ে। কিন্তু বন্ধনহীন গ্রন্থি তো খুব একটা কাজে লাগে না। কিন্তু তবু নিজের ভুলে হয়তো সবার প্রতি সঠিক বিচার করতে পারি না। কিন্তু কত মানুষের বিচিত্র উক্তি সরস মন্তব্য স্মৃতিপটে উঁকি মারে। তাদের অনেকেই নেই। কিন্তু কিভাবে তাঁদের স্মরণ করি! তাই বিরত হচ্ছি। শুধু আমার মনের মানুষ, প্রাণের মানুষ ঋদ্ধিবান পুরুষ রথীনদার কথা বলেই স্মৃতিচারণা শেষ করবো। রথীনদার এক ভ্রমণ কাহিনী শিক্ষা ও সাহিত্যে প্রকাশিত হতো। আমার বড় মেয়ে তা মন দিয়ে পড়তো। একবার কলকাতার এক সভায় তাঁকে নিয়ে এসেছিলাম। রথীনদার সঙ্গে তাঁর কথোপকথন এক মধুর দৃশ্য অসম দুই বন্ধু যেন মজার গল্প করে চলেছেন—তাঁর এই লেখার ক্ষমতার কথা অনেকেই হয়তো জানেন না।

আলিপুর স্পেশাল জেলের রথীন দেবের কথা আগেই বলেছি। সে এক অপরূপ অভিজ্ঞতা। কিন্তু যে কোন সভাতেই রথীনদার উপস্থিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর বক্তব্য কেউ না শুনে থাকতে পারে না। তাঁর নাম আগে শুনেছিলাম কাউন্সিলার হিসাবে। দুষ্কৃতিদের দ্বারা এই মিষ্টভাষী, অকৃতদার, জননেতার আক্রান্ত হবার খবরে আমরা বিচলিত হয়েছি। কিন্তু তিনি বিচলিত হন নি। নিজের কর্তব্যপথ থেকে কেউ তাঁকে সরাতে পারে নি। সেই তাঁরই সান্নিধ্যে আমি এসে পড়লাম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে। হঠাৎ গোলোকদা প্রয়াত হলেন ১০ই ফেব্রুয়ারী '৮৪ । তিনি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। জরুরী সভা ডাকা হলো। সভাপতির পদ ছেড়ে রথীনদা হলেন সাধারণ সম্পাদক। অরুণদা হলেন সভাপতি। আর অরুণদার জায়গায় আমি দায়িত্ব পেলাম সহকারী সাধারণ সম্পাদকের। রথীনদার আমলে বাঁকুড়া সম্মেলন ও সিউড়ি সম্মেলন হয়েছে। এই মধ্যবর্তী সময়ে সমিতি অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। তারমধ্যে স্মরণীয় ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউট হলে দুদিন ধরে মে-দিবস উদ্‌যাপন এবং রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন। সমিতির উদ্যোগে 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ করেন কলকাতার শিক্ষয়িত্রীরা। এ ঘটনা সবারই মনে থাকবে। এই সময় রথীনদার উপদেশ, পরামর্শ এবং সাহায্য যা পেয়েছিলাম তা ভোলার নয়। চিরযুবা রথীনদা আমার সক্রিয়তার উৎস। আমার শিক্ষক, আমার কমরেড তিনি প্রয়াত হলেন ২৬.৫.৮৮।

আর একজনের কথা না বলে শেষ করতে পারছি না। তিনি আমাদের শশীদা। বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য, নেতা। তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। চট্টগ্রামের বিপ্লবী আন্দোলনের ফসল শ্রীযুক্ত শশিমোহন ভট্টাচার্য্য তাঁর সরল জীবনযাপনে এবং ততোধিক সরল বাক্যবিন্যাসে সবাইকে মুগ্ধ করতেন। অবিভক্ত বঙ্গদেশে তিনি চট্টগ্রামেই শিক্ষকতা করতেন। পরে এপারে এসে হুগলীর মাহেশে শিক্ষকতা করেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয়। জরুরী অবস্থার কঠিন দিনে তাঁর স্কুলেই কয়েকদিন রাত্রিযাপন করেছিলাম। আমি যখন সম্পাদকমণ্ডলীতে এলাম শশীদা শিক্ষা ও সাহিত্যের সম্পাদক, অমিতাভ সেন যুগ্ম সম্পাদক। সভার মধ্যে বিভিন্ন মন্তব্যে তাঁকে চিনেছি। মতাদর্শের প্রতি এমন দৃঢ় আনুগত্য আজকাল তো দুর্লভ। আগেই বা কত দেখা যেত জানি না। স্পেডকে স্পেড বলতে তিনি কখনও পিছপাও হন নি। তিনি যখন শিক্ষা শিবিরে সমিতির ইতিহাস বলতেন—শুনতাম—কিন্তু তাঁর ভূমিকার কথা খুব কমই শুনেছি। সেই শশীদাও চলে গেলেন গত ৩০শে জানুয়ারী, ২০০৪। তাঁকে শেষ দেখা দেখতে শ্রীরামপুর গিয়েছিলাম। সত্যপ্রিয় রায়, গোলোকপতি রায়, রথীন্দ্রকৃষ্ণ দেবের শেষযাত্রায় পদব্রজে অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু এখানে সে সুযোগ ছিল না। সশ্রদ্ধ প্রণাম আর চোখের জলে তাঁকে বিদায় জানালাম।

বর্তমান শিক্ষাভাবনা

মিত্রা ভট্টাচার্য

আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়, যাঁকে আধুনিক ভারতের স্থপতি বলা হয়। উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজীর মাধ্যমে যুক্তিনির্ভর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করা যাতে আমাদের দেশের মধ্যযুগীয় অন্ধকারকে ভাঙা যাবে। সেইদিক দিয়েই শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রথম ইউরোপীয় নবজাগরণের ফসল আহরণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

কিন্তু ইংরাজ শাসকরা প্রধানত কেরানী তৈরী করার শিক্ষাই চালু করেন। এই শিক্ষাব্যবস্থার ঔপনিবেশিক চরিত্র নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। এই দেশকে শাসন ও শোষণ করার জন্য যতটুকু এবং যে প্রকৃতির শিক্ষা দরকার বিদেশী শাসকরা ঠিক সেটুকুই করতে চেয়েছিল। পাঠক্রম-পাঠ্যসূচিতে সেইজন্য ভাষাশিক্ষাই প্রধান হয়ে উঠেছিল। (মাধ্যমিক স্তরে ৫৫০ নম্বর ছিল ভাষাশিক্ষার জন্য। ইংরাজী ২৫০, বাংলা ২০০, সংস্কৃত ১০০। এছাড়া গণিত ১০০, ইতিহাস ১০০, ভূগোল ৫০) জনশিক্ষার প্রসারের নীতি অনুসৃত হতো না। ফলে সমাজের দুর্বল অংশের মানুষের শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশাধিকার ছিল না। স্বচ্ছল আলোকপ্রাপ্ত পরিবারের মধ্যেই শিক্ষার সুযোগ সীমাবদ্ধ ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা অবহেলিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই কারণেই এই শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে, এই শিক্ষা জীবনের উপযোগী নয়, প্রয়োজনের উপযোগী নয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও কিন্তু ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থাকেই অনুসরণ করা হয়েছে। সমাজের প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কবিহীন, বাস্তবতার সাথে যোগসূত্রহীন শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত মানুষের সুযোগ সৃষ্টিকারী এই শিক্ষাব্যবস্থা স্বাধীন ভারতের শাসককুল সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিকে উপেক্ষা করে চালু রেখেছেন। Education should be integrated with national life, the needs and aspirations of the people, and should be developed into an instrument of change to solve the problems of our toiling people — বাস্তবে কিন্তু তা হলো না। আজকের বিজ্ঞান প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির দুনিয়ায় গণতান্ত্রিক এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া দেশ আজকে দুনিয়ার মুখোমুখি হতে পারবে না।

অথচ দেশে একটার পর একটা শিক্ষা কমিশন গঠন হয়েছে। সর্বস্তরে সর্ববৃহৎ কমিশন কোঠারী কমিশন একেবারে বুনিয়াদি স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছিলেন। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন, লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র কমিশনের পর এটিই ছিল জাতীয় স্তরে যথার্থ আলোচনার ভিত্তিতে গঠিত কমিশন। এই কমিশনের উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হলো জি ডি পি'র ৬ শতাংশ শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটলো না। শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় বাজেটে ব্যয় কখনোই শতকরা ২.৫ ভাগের বেশী উঠল না। এন ডি এ সরকারের আমলে আবার তা শতকরা ২ভাগেরও তলায় গিয়ে ঠেকেছে। স্বাধীনতার পর থেকে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে পেতে বর্তমানে দেশে জাতীয় উৎপাদনের ৪.০২ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় হচ্ছে।

উল্লেখ্য ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম ৫৮তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণদান কালে বলেছেন, শিক্ষায় জাতীয় আয়ের ছয় থেকে সাত শতাংশ ব্যয় করা হোক। কেন্দ্রের সংযুক্ত প্রগতিশীল জোট সরকার ন্যূনতম অভিন্ন কর্মসূচিতে শিক্ষায় জাতীয় আয়ের অন্তত ছয় শতাংশ বরাদ্দ করার কথা ঘোষণা করেছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম এবারের বাজেটে দুই শতাংশ হারে সেস বসিয়ে চার থেকে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বাড়তি সংগ্রহ করে তা মিড-ডে-মিল সহ প্রাথমিক শিক্ষায় পরিকাঠামোর উন্নতিতে ব্যয় করবেন বলেছেন। এখন চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও দায়বদ্ধতা।

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাচ্ছি :

একদিকে কোনো জাতীয় শিক্ষানীতি গড়ে উঠল না, অন্যদিকে ষাটের দশক থেকে শিক্ষা সংকোচনের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ওপর আক্রমণ নেমে এল। শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকার অন্তর্গত করা হয়েছে। ১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি শিক্ষাকে মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থবাহী এবং জনশিক্ষাকে গুরুত্বহীন ঘোষণা করে। প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অথচ প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা কখনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিকল্প হতে

পারে না। আমাদের মতো দেশে পরিপূরক হতে পারে মাত্র। বর্তমানে বিশ্বায়ন, বেসরকারীকরণ ও উদারীকরণের দাপটে সাধারণের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রচণ্ড সংকটের মুখোমুখি। সাম্রাজ্যবাদের মতে পরিষেবা থেকে সরকারকে হাত ওঠাতে হবে। শিক্ষা যেহেতু একটি পরিষেবা তাই কেন্দ্রীয় সরকার এর দায়িত্ব অস্বীকার করতে চাইছে। এর প্রধান কারণ হলো 'গ্যাটস' (জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন্ সার্ভিসেস)। 'গ্যাটস'-এর সদস্যসংখ্যা ১৪৩ কিন্তু শিক্ষাকে পণ্যে রূপান্তরিত করার চুক্তিতে সাক্ষর করেছে ভারত সহ ৪০টি দেশ। তারই ফলে বিদেশ থেকে ভারতে শিক্ষা নামক 'পণ্য' আমদানি হচ্ছে। এখন আমাদের দেশে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষা বেঁচে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে হাজির হচ্ছে। সরকার-পোষিত বিদ্যালয়গুলি এই মুনাফার আগ্রাসনের মধ্যে পড়েছে। পাঠক্রম-পাঠ্যসূচির বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারতের জাতিসত্তার অনুভূতি — 'বহুত্ববাদী সহনশীলতা' ও 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' এই চিরাচরিত ধারণাকে নস্যাৎ করে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে 'ভারতীয়', 'ধর্মীয়' এবং 'জাতীয়তাবাদী' রূপ দেবার চক্রান্তে শিক্ষার পাঠক্রমে নানা অবাঞ্ছিত জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। পাঠ্যপুস্তকে নানা বিকৃত তথ্য সন্নিবেশিত হচ্ছে। এই ধরনের শিক্ষা দেশে সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে উৎসাহিত করছে এবং ফ্যাসিস্ত চিন্তাভাবনা আমাদের সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অঙ্কুরিত হচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই আক্রমণ যা সাধারণের জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে সংকটের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধেই বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতি। একে নিয়েই আমাদের লড়াই করতে হবে। আর এই শিক্ষানীতিটা হলো সমাজের দরিদ্রতম মানুষের কাছে শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়া। একে সফল করতে গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার জন্য লড়াই আমাদের কাজ।

আমাদের মনে রাখতে হবেঃ

১) শিক্ষাকে জাতীয় জীবনের সঙ্গে সংহতিমূলক হতে হবে।
২) শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্তরকম বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হবে।
৩) যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ যুক্তিসমৃদ্ধ অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলতে হবে।
৪) শিক্ষার ফসলকে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়াস চালাতে হবে।

শিক্ষার এই লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছাতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থাই প্রকৃষ্ট উপায়। এই কারণেই আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে রক্ষা করতে হবে। তাই পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির উন্নয়ন শিক্ষার মানের গুণগত উন্নয়ন, শিক্ষাব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ — এই কর্মসূচি নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এই শিক্ষাভাবনা নিয়েই আমাদের এগোতে হবে। মনে রাখতে হবে গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক, জীবনমুখী শিক্ষার লড়াই অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু আজকের বিকল্প এটাই। সকলের জন্য শিক্ষা, শিক্ষাকে রাজ্য তালিকায় ফিরিয়ে আনার লড়াই, দরিদ্রতম মানুষের কাছে শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়ার কাজ আমাদের করতেই হবে।

এই শিক্ষাভাবনাকেই গত সম্মেলনের পর থেকে আমরা সমিতির সদস্যবন্ধুদের কাছে ধারাবাহিকভাবে নিয়ে যাচ্ছি। যখন শ্রেণিশিখনের ওপর আক্রমণ নেমে আসছে, এর গুরুত্বকে নস্যাৎ করে দূরগত শিক্ষার যৌক্তিকতা বোঝানো হচ্ছে সেই সময়ে শ্রেণিশিখনের মর্যাদা রক্ষা করা ও তার গুরুত্ব বৃদ্ধি করার প্রয়াস চালাতে হবে। সমাজে সর্বত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষার লড়াই-এর সাথে একাত্ম হয়ে শিক্ষক/শিক্ষাকর্মী হিসাবে বিদ্যালয়কে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি নির্দ্ধারণ, Comprehensive Annual Calender তৈরী, স্টাফ কাউন্সিল, একাডেমিক কাউন্সিল ইত্যাদিকে যথাযথভাবে কার্যকরী করে তুলতে হবে। প্রকৃত শিখন দিবস ২০০-র বেশী করা সুনিশ্চিত করতে হবে।

বর্তমান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যপ্রয়াসের প্রয়োজনীয় উপাদান এবং সামর্থ নানাভাবে সঙ্কুচিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সহযোগিতামূলক সঙ্ঘবদ্ধতার পরিকল্পনার প্রয়াস দরকার। এর আভাস আমরা কোঠারী কমিশনের সুপারিশে 'প্রতিবেশী বিদ্যালয়ে'র আলোচনায় পাই। বর্তমানে বিদ্যালয়-গুচ্ছ ৮/১০টি বিদ্যালয়কে যুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। পারস্পরিক সহযোগিতা, যৌথ কর্মসূচির ভিত্তিতে বিদ্যালয়গুচ্ছের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুচ্ছ পরিচালনা করতে হবে। তার জন্য প্রথম পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির অভিযান চালাতে হবে।

পশ্চিমবাংলার বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি শ্রেণিশিখনের একটি বড় সমস্যা বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিশিখনের ধারাবাহিকতার মধ্যদিয়ে এই সমস্যার সমাধান করেই ছাত্রছাত্রীর 'সংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করতে হবে'। এই

কাজের উপযোগী গণতান্ত্রিক, মানবিক পাঠ্যসূচি বিদ্যালয়স্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

বর্তমানে উন্মত্ত ভোগবাদী মানসিকতা মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক, মূল্যবোধহীন, সংকীর্ণ, স্বার্থপর করে গড়ে তুলছে। সারাদেশের পরিস্থিতি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন বিকাশের অনুকূল নয়। শিক্ষাক্ষেত্রও কলুষিত হয়ে পড়ছে। 'শিক্ষার মধ্যে পণ্যমানসিকতা এসে পড়ার ফলে শ্রেণিশিখনের গুরুত্বকে খর্ব করে এর বিশ্বাসযোগ্যতাকে লঘু করা হচ্ছে। অর্থের বিনিময়ে প্রশ্নের উত্তর লাভের বাণিজ্যিক প্রয়াসকে শিক্ষার জন্য অপরিহার্য বলে প্রচার করা হচ্ছে।' এর জন্য প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনেকাংশ দায়ী। 'সারা বছর শেখার শেষে পরীক্ষার উত্তরপত্রে 'নোটবই' থেকে মুখস্থ লেখার মধ্যেই তার মূল্যায়ন করা, কৃতিত্ব দেওয়া আদৌ সঙ্গত কিনা ভাবতে হবে'। মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার সাধন করতে হবে। পরীক্ষার মূল দুটো উদ্দেশ্য হওয়া দরকার — ১) to assess the standard of the students before promoting them to the next higher class, ২) to find out in which subject or topic the student is weak and to help him in rectifying it at the appropriate time.

বর্তমান মুখস্থনির্ভর অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। Periodic internal পরীক্ষার অংশকে বাইরের পরীক্ষার সাথে যুক্ত করা যায় কি না ভাবতে হবে।

এই সমস্ত বিষয়ে সচেতনা সৃষ্টির অভিযান এই সময়ের আশু কর্তব্য। এই সচেতনতা সৃষ্টির অভিযান সফলভাবে চালাতে পারলে পরবর্তী পর্যায়ে সক্ষমতা সৃষ্টিতে কৃতকার্য হওয়া সম্ভব। এই সক্ষমতা সৃষ্টির অভিযানকে পরিচালনা করতে পারলে আমাদের প্রাসঙ্গিক শিক্ষাভাবনা কর্মসূচিকে পরবর্তী স্তরে উন্নীত করা সম্ভব হবে। স্বতঃসঞ্জাত শৃঙ্খলাবোধ, বৃত্তিগত নৈতিকতার বিধিই শিক্ষকতা পেশার মর্যাদা রক্ষা করে এর অবস্থানকে উন্নত করতে পারে।

প্রতিটি সদস্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী বন্ধুকে এই কাজে উপযুক্তভাবে সংগঠিত করতে গেলে সমিতির গঠনতন্ত্র, সংগঠন এবং শিক্ষাভাবনার সঙ্গে তাকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। গঠনতন্ত্রের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলিকে প্রতিটি সদস্যের 'জীবনাচরণে প্রতিফলিত করার উপযোগী প্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে'। সর্বস্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে নিবিড় মানবিক সম্পর্ককে কার্যকরীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই এই কাজে আমরা সফল হব।

মাধ্যমিক শিক্ষাবিস্তারের সমস্যা ঃ সমাধানে সাংগঠনিক উদ্যোগ

অপরেশ ভট্টাচার্য্য

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক সমস্যা আছে। এই মৌলিক সমস্যা সমাধানে সমাজের সকল অংশের মানুষকে যুক্ত করে সমাধানের প্রচেষ্টা বর্তমান পরিস্থিতিতে সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য। কারণ, শিক্ষা একটি সামাজিক বিষয়। সমাজের সকল মানুষের শিক্ষাগ্রহণের মধ্যদিয়ে সচেতন হওয়ার অধিকার আছে। এই কাজে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সকল সদস্যবন্ধুকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষাবিস্তার আন্দোলনের মৌলিক সমস্যার উৎসমুখ সম্পর্কে অভিভাবক, শিক্ষার সাথে যুক্ত শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ এবং সমাজের সকল অংশের মানুষের মধ্যে সচেতনভাবে সম্যক ধারণা সৃষ্টি করতে হবে। সমস্যার উৎসমুখ উদ্‌ঘাটিত হলে সমাধানের পথও পাওয়া যাবে। সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছোতে গেলে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক ভূমিকা ধারাবাহিকভাবে পালন করতে হবে।

সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের কাজে সমিতির সকল সদস্যবন্ধুদের যুক্ত করতে হলে সমিতির সাংগঠনিক পরিকাঠামোর প্রত্যেক স্তরে যৌথ নেতৃত্বে ও যৌথ সিদ্ধান্তে কর্মসূচি গ্রহণ, পর্যালোচনার মধ্যদিয়ে তাকে কার্যকরী করা অত্যন্ত জরুরী। সকল সদস্যবন্ধুদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করা ছাড়া এই কাজে সাফল্য সম্ভব নয়। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে পুরোনো সদস্যবন্ধু বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের সদস্যবন্ধুদের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি মনোনিবেশ ঘটাতে বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণে মনোনিবেশ প্রয়োজন।

এই রাজ্যে শিক্ষাবিস্তারের সমস্যা একাধিক। কারণ পশ্চিমবঙ্গে পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের নেতিবাচক নীতি। সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারে কংগ্রেসের অনীহার কারণে সমস্যা প্রকট রূপ ধারণ করেছিল। রাজ্যে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তাদের অপরিসীম সার্বিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক নীতি গ্রহণের ফলে বিগত ২৭ বছরে রাজ্যে শিক্ষায়তনের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার অঙ্গনে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সে তুলনায় শিক্ষার পরিকাঠামো সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতার জন্য খুবই অপ্রতুল। তাসত্ত্বেও যে পরিকাঠামো বর্তমান, তাকেই ব্যবহার করে শিক্ষাপ্রসারের যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া রাজ্যে বিগত ২৭ বছর ধরে প্রচলিত আছে, তাকে অক্ষুণ্ণ এবং উন্নত করার জন্য সমিতিকে তার সাংগঠনিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বিগত ৪র্থ ত্রি-বার্ষিক জেলা সম্মেলনে প্রত্যেক জেলার প্রতিবেদনে এই সমস্যা উল্লিখিত হয়েছিল। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা তাঁদের আলোচনায় অনেক ইতিবাচক দিক উল্লেখ করেছিলেন। বিগত তিন বছরে জেলা কমিটিগুলি বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মসূচির মধ্যদিয়ে শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলনকে অনেকটা গতিশীল করার প্রয়াস গ্রহণ করেছে। শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলনে এই গতিবেগ আনয়নের ক্ষেত্রে সমিতির সদস্যবন্ধুরা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছেন। এই অগ্রগতি অব্যাহত থাকলেও এখনো অনেক দূর আমাদের এগোতে হবে। তবে আমরা দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করতে পারি, বর্তমান সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হলে শুধু শিক্ষাবিস্তারের সামাজিক সমস্যা কেন, সমাজের কোন মৌলিক সমস্যার সমাধান হতে পারে না। ফলে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের আন্দোলনকেই প্রধান লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করে আমাদের আশু সমস্যার সমাধানে সাংগঠনিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস সরকারের শিক্ষাবিস্তারের নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকার কথা পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে। এরই ফলশ্রুতি শিক্ষায় অর্থ বরাদ্দ হ্রাস ; সংবিধানের রাজ্য তালিকার পরিবর্তে শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকায় আনা। এছাড়া কংগ্রেস সরকার ৬-১৪ বছর পর্যন্ত বালক-বালিকাদের স্বাধীনতার ১০ বছরের মধ্যে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের সাংবিধানিক নির্দেশ অমান্য, সুনির্দিষ্ট জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে অনীহা প্রকাশ, সর্বোপরি, কেন্দ্রে শিক্ষামন্ত্রকের পদ অবলুপ্তি ঘটিয়ে দেশে শিক্ষাব্যবস্থার পশ্চাদ্‌পদতার সৃষ্টি করেছিলেন। এই কারণেই আজ সারা বিশ্বের নিরক্ষর মানুষের অর্ধেকের বেশি ভারতবর্ষে বসবাস করেন।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি ধারাবাহিকভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের

কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত করে শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলনের অগ্রগতিকে অব্যাহত রেখেছে। তৎকালীন কেন্দ্র ও রাজ্য কংগ্রেস সরকারের নেতিবাচক জনস্বার্থ বিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ৫০-এর দশকের প্রথম থেকে ৭০-এর দশক পর্যন্ত ধারাবাহিক গণ-আন্দোলনের মধ্যদিয়ে ৭০-এর দশকের শেষের দিকে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা হয়। সর্বজনীন শিক্ষা সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যদিয়ে এই রাজ্যের অধিবাসী অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্তি পাওয়ার স্বাদ গ্রহণে সক্ষম হয়েছে।

শিক্ষাবিস্তারের সমস্যা ও সমাধানের বিষয়টিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে

১। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার বিগত বছরগুলিতে শিক্ষাসহ রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের গতিবেগকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করলেও আর্থিক সঙ্কটের সমস্যাসহ নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকার তার সীমাহীন আর্থিক, সাংবিধানিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রাজ্যে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়ার ব্যবস্থা করা, কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের বেতন, ভাতা, অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতির জন্য সমস্তপ্রকার আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ, নতুন নতুন নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগে নতুন পদ সৃষ্টি, প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ বাবদ আর্থিক অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে কার্যকরী করে প্রায় ৭৫ শতাংশ ভূমি সংস্কার-এর মধ্যদিয়ে সাধারণ মানুষকে অর্থনৈতিক স্বনির্ভর করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন বামফ্রন্ট সরকার। এর ফলে পিছিয়ে-পড়া সাধারণ মানুষেরও শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই শিক্ষায়তনগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই সমস্যার পাশাপাশি ৯০-এর দশকের প্রথম থেকে কেন্দ্রের তৎকালীন কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের আর্থিক সংস্কারনীতি গ্রহণ এবং যা দ্রুততার সাথে বিগত ৪/৫ বছরের মধ্যে বি জে পি-জোট সরকারের সেই সংস্কার নীতিকে কার্যকরী করার ফলশ্রুতি — সারা দেশের আর্থিক সংকট। এই সংকটের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গেও পড়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মদতপুষ্ট আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থার সৃষ্ট এই সংকট মোকাবিলার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে বিকল্প ব্যয় সংকোচের নীতি গ্রহণ করতে হয়েছে সাময়িকভাবে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন যতখানি অভিপ্রেত ছিল তা হয় নি। শিক্ষাকর্মী নিয়োগে সাময়িকভাবে বিধিনিষেধ প্রয়োগ করতে হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের মাসিক বেতন প্রদানে বিলম্ব হচ্ছে। সরকারী কর্মচারীরা ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা যেখানে জুলাই, ২০০৩ থেকে পেয়েছেন, সেক্ষেত্রে রাজ্যের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের জানুয়ারী, ২০০৪ থেকে দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী সমর্থিত কংগ্রেস নিয়ন্ত্রণাধীন সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা সরকার বিশেষ করে কংগ্রেস দল তাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণ নিয়ে শিক্ষার বাজেটে ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব রেখেছেন। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোর্চার অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির প্রস্তাবকে গ্রহণ করে জাতীয় উৎপাদনের ৬ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দের প্রতিশ্রুতিও ঘোষিত হয়েছে। এছাড়া সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক নিয়মে রাজ্যগুলির প্রাপ্য অর্থ নিয়মিত দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছেন। এই প্রস্তাবগুলি আন্তরিকভাবে কার্যকরী হলে উপরিউক্ত আর্থিক সমস্যা সমাধানের পথ কিছুটা হলেও প্রশস্ত হবে।

এত আর্থিক সমস্যার মধ্যেও বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদে নিয়োগের ব্যবস্থা বিদ্যালয় কৃত্যক আয়োগের (এস এস সি) মাধ্যমে অব্যাহত রেখেছেন। যদিও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তর, বিদ্যালয় কৃত্যক আয়োগের দপ্তর ও বিদ্যালয়ের মধ্যে শূন্যপদের তালিকা প্রেরণ ও নির্বাচিত প্রার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষায়তনে নিয়োগের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক যোগাযোগের অভাবে শূন্যপদে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগে বিলম্ব হচ্ছে। দপ্তরগুলির নিবিড় সমন্বয়ের মধ্যদিয়ে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হলে শূন্যপদে নিয়োগের অযথা জটিলতা দূর হবে। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী থাকলেও আর্থিক সীমাবদ্ধতার জন্য যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে সমিতিকে এই ব্যাপারে ধারাবাহিকভাবে রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষায়তনগুলির বর্তমানে যে পরিকাঠামো রয়েছে, সেই পরিকাঠামোকে ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার দায়িত্ব

নীতিগতভাবে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সদস্য/সদস্যাবন্ধুদের প্রভাবিত করতে হবে।

২। স্বাধীনতার পর প্রায় তিন দশকেরও বেশি সময় কেন্দ্রে ও রাজ্যে কংগ্রেস দল শাসন ক্ষমতায় আসীন ছিল। তাদের শ্রেণিগত অবস্থান থেকেই দেশে শিক্ষাবিস্তারে অনীহা প্রকাশ করেছে। দেশের শিক্ষাবিস্তারে তারা চরম অব্যবস্থার সৃষ্টি করেছিল। এর প্রতিফলন পড়েছিল রাজ্যেও। ৭০-এর দশকের শেষের দিক থেকে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার বিগত দুই দশকেরও বেশি সময় পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের সৃষ্ট অবস্থাকে দূর করে রাজ্যের শিক্ষানুরাগী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষাবিদ্, সর্বোপরি বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর সংগঠনগুলির সাহায্য ও পরামর্শ নিয়ে একটি বিকল্প শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও তা কার্যকরী করার প্রয়াসকে অব্যাহত রেখেছেন।

শিক্ষাবিস্তারের এই শুভ প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখতে গেলে শিক্ষার উন্নতমানের প্রতিও নজর দিতে হবে। রাজ্য সরকারের বিকল্প শিক্ষানীতিকে সফল করতে হলে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ও মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ এই তিনটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রশ্নে পরিকল্পিত উদ্যোগ ও তাকে কার্যকরী করার প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রাখতে হবে। সমাজের উপযোগী মনস্তাত্ত্বিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠক্রম-পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনা, প্রয়োজনে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে হবে। এই পাঠক্রম-পাঠ্যসূচি সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঠিকভাবে অবহিত করার জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই ব্যাপারে জাতীয় ও রাজ্যস্তরে শিক্ষা গবেষণা পর্ষদের সহযোগিতা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।

শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রশ্নে প্রচলিত পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিকেও উন্নত করা প্রয়োজন। বিদ্যালয়স্তরে একটি শিক্ষাবর্ষে ক'টি পরীক্ষা হওয়া উচিত, এবংবিধ বিষয় সম্পর্কে উক্ত তিনটি স্বশাসিত সংস্থা সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা করে রাজ্যে সকল মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা বিদ্যালয়ে একইরকম ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে। প্রতি বছর মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসার পরীক্ষার্থী সংখ্যা বিশেষত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে রাজ্যে দুটি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গঠনের মধ্যদিয়ে পরীক্ষা পরিচালনার বিষয়টি ভেবে দেখার প্রয়োজন। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফলপ্রকাশে পূর্বের তুলনায় কিছুটা অগ্রগতি ঘটলেও ইদানিংকালে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রায়শই অভিযোগ পাওয়া যায়। ত্রুটিপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে দেয়। লক্ষ্যণীয়, উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রেও এক অংশের শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে অনীহার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, পরীক্ষা পরিচালন প্রশাসনেও বিভিন্ন গলদ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে পেপার সেটার, মডারেটর ও পরীক্ষা পরিচালন প্রশাসন প্রায়ই সমালোচিত হচ্ছেন। শিক্ষার উন্নততর মানের প্রশ্নে কাঙ্খিত স্থলে পৌঁছোতে হলে উপরিউক্ত সমস্যাগুলি সতর্কতা ও দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরী বিষয়।

২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা স্তরে নতুন পাঠ্যসূচি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বর্তমান শিক্ষাবর্ষ থেকে নতুন পাঠ্যসূচি প্রণয়ন সম্ভব হয় নি। মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা স্তরে নতুন পাঠ্যসূচি চালু করা সম্ভব হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রকাশকদের একাংশের অসহযোগিতা ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রশাসনের কিছুটা গাফিলতির কারণে এই স্তরে নতুন পাঠ্যসূচি প্রণয়ন সম্ভব হয় নি। সিদ্ধান্ত হয়েছে ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে অবশ্যই নতুন পাঠ্যসূচি চালু হবে।

মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রম-পাঠ্যসূচি প্রণয়নে অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং মাদ্রাসা স্তরে কিদোয়াই কমিটির সুপারিশ কার্যকরী হয়েছে। আমাদের সমিতির উদ্যোগে জেলা ও রাজ্যস্তরে মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকের সকল বিষয়ের উপর কর্মশালা হয়েছে। কর্মশালার সুপারিশ পর্ষদ ও সংসদে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু জেলাস্তরে মাদ্রাসা শিক্ষার কোনো বিষয়ের উপরে কর্মশালা সম্ভব না হলেও কিদোয়াই কমিটির কাছে মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে একটি ইতিবাচক প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছিল। সুখের বিষয়, তিনটি স্তরের নতুন পাঠ্যসূচিতেই তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এই নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঠিকভাবে সচেতন করে শ্রেণিকক্ষের পাঠদানকে বিজ্ঞানভিত্তিক করে তোলার লক্ষ্যে পর্ষদ, সংসদ ও মাদ্রাসা বোর্ড একেবারে বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সকল বিষয়-শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই তিনটি সংস্থার ইতিবাচক উদ্যোগের সাথে সমিতিগত উদ্যোগকে সঠিকভাবে

ফলপ্রসূ করতে পারলে রাজ্যের শিক্ষার মানোন্নয়নের কাঙ্খিত স্থলে পৌঁছোনোর অন্তত একটা দিকনির্দেশ পাওয়া সম্ভব।

৩। পেশাগত গণ-সংগঠনে সদস্যদের সামগ্রিক অথবা ব্যক্তিবিশেষের বৃত্তিগত অধিকার বা দাবীগুলিকে সমাধানের ধারাবাহিক প্রয়াস গণ-সংগঠনকে চালিয়ে যেতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার বিগত ২৭ বছর ধরে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর আর্থিক উন্নয়নের প্রশ্নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পর পর তিনটি পে-কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীকে সরকারী কর্মচারীর সমান আর্থিক সুযোগ-সুবিধাদানের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করার চেষ্টা করে চলেছিল। গত ১৯৯১ সাল থেকে তৎকালীন কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার যে বিশ্বায়নের নতুন আর্থিক সংস্কারনীতি গ্রহণ করেছিল, পরবর্তীকালে বি জে পি নিয়ন্ত্রণাধীন এন ডি এ-জোট সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে বিশ্বায়নের সেই অর্থনীতি কার্যকরী করে। ফলে সারা ভারতবর্ষে প্রবল আর্থিক সংকটের সৃষ্টি হয়। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকারকে আইনসঙ্গত অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণ রাজ্য সরকারকে কঠিন আর্থিক সংকটে ফেলে দেয়। এছাড়া বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী অনুদান প্রদানের যে প্রশাসনিক-আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সব মিলিয়ে রাজ্য সরকারের সীমাবদ্ধতা ক্রমবর্ধমান। বি জে পি-জোট সরকারের সমমনোভাবাপন্ন বেশ কয়েকটি রাজ্য সরকার এই আর্থিক সংকট মোকাবিলা করার প্রয়াসে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের আরোপিত শর্তগুলি কার্যকরী করার জন্য কর্মচারী, শিক্ষকসহ সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষের অর্জিত পেশাগত অর্থনৈতিক অধিকারের উপর আক্রমণ শাণিত করেছে। উদাহরণ হিসেবে তামিলনাড়ু, কেরল, অন্ধ্র, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এইসব রাজ্যে কর্মচারী-শিক্ষকদের মহার্ঘভাতা বন্ধ হয়েছে। মূল বেতনের সাথে বাৎসরিক অর্থ বৃদ্ধির আইন বাতিল, অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন, গ্র্যাচুইটি, কমিউটেশন প্রভৃতি নিষিদ্ধ করা সহ প্রায় ১৬ দফা আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির অর্জিত অধিকার বাতিল করা হয়েছিল। প্রতিবাদে তামিলনাড়ু ও কেরলের শিক্ষক-কর্মচারীরা আন্দোলন সংগঠিত করলে শাস্তিস্বরূপ ২ লক্ষ কর্মচারী ও শিক্ষককে ছাঁটাই করা হয়। এমনকি সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণির ধর্মঘটের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয়।

পরিস্থিতি এক হওয়া সত্ত্বেও ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যে। বি জে পি-জোট সরকার সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকটকে কাটিয়ে তোলার জন্য এই দুটি রাজ্য সরকার বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার বিকল্প ব্যয় সংকোচের নীতি সাময়িকভাবে গ্রহণ করে। ফলে গত ২০০২ সালের জুন-জুলাই মাস থেকে রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর মাসিক বেতনপ্রাপ্তি দশ তারিখের পরিবর্তে কুড়ি তারিখ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা ৫৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা পেলেও গত ২০০৩ সালের জুলাই মাস থেকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা ৪৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন। রাজ্যের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী এই ৪৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা ২০০৪ সালের জানুয়ারী মাস থেকে পাচ্ছেন। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর গ্র্যাচুইটি ও কমিউটেশন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হলেও বর্তমানে এই অর্থ পাওয়ার সরকারী আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। তবে কমিউটেশন বাবদ অর্থ প্রাপ্তি সাময়িক বন্ধ থাকলেও মাসিক পেনশন পাচ্ছেন এবং অবসরগ্রহণের মাসেই তিনি পেনশনের চূড়ান্ত অনুমোদনপত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হয় নি। গ্র্যাচুইটি চালু তবে শিক্ষা অধিকর্তার দপ্তর, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তর (মাধ্যমিক), মহকুমাস্তরের সহকারী ও অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তরের আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতার কারণে বেশ কিছু পেশাগত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ঐগুলি সমাধানে সমিতির আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলেও এখনো সামগ্রিক সাফল্য পাওয়া যায় নি। এছাড়া বেশ কিছু যুক্তিসঙ্গত পেশাগত দাবী এখনো অপূর্ণ আছে। যেমন, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা চিকিৎসাজনিত কারণে যে ছুটি পেয়ে থাকেন তার ঊর্ধ্বসীমা বিলোপ, ২৫ বছর চাকুরীকাল হলে পূর্ণ পেনশন পাওয়ার অধিকার, '৯১ সালের শিক্ষাবর্ষ থেকে যে সকল দুই শ্রেণিযুক্ত বিদ্যালয় চার শ্রেণিযুক্ত বিদ্যালয়ে অনুমোদন পেয়েছে সেইসব বিদ্যালয়ের সংগঠক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর আর্থিক অনুমোদন পাওয়ার প্রশ্নে শিক্ষা অধিকর্তা দপ্তরের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ১৯৮১-১৯৮৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে B.Ed ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থা, চতুর্থ পে-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কীম চালু করা অর্থাৎ ৮-১৬-২৪ বছর অন্তর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ক্রমান্বয়ে একটি করে বিশেষ ইনক্রিমেন্ট পাওয়ার সুযোগ সম্পর্কিত সরকারী আদেশনামা প্রকাশ, শিক্ষাকর্মীর অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য বিশেষ আর্থিক সুবিধাদানের বিষয় ইত্যাদি। এছাড়া অতি সম্প্রতি রাজ্য সরকার কর্মরত অবস্থায় মৃত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর পোষ্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে চাকুরী

পাওয়ার যে সরকারী আদেশনামা চালু ছিল, তা সাময়িকভাবে কার্যকরী করা স্থগিত রেখেছেন। এই ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই অধিকার ছিল সমিতির দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফসল। অর্জিত অধিকারের উপরে সরকারের হস্তক্ষেপ সমিতি কিছুতেই মেনে নেবে না। সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই অর্জিত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হলে সমিতিকে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে হবে।

৪। ২০০৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭১·৬৪ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। নিঃসন্দেহে মাধ্যমিক পরীক্ষার এই ফলাফল বামফ্রন্ট সরকারের বিকল্প শিক্ষানীতির একটি ইতিবাচক দিক। একথা অনস্বীকার্য যে, বিগত ২৭ বছরে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার হার ও মান দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামীদিনে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১০০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হলে মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন সফল হবে। মাদ্রাসা এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও প্রতি বছর সাফল্যের হার বৃদ্ধি বামফ্রন্ট সরকারের বিকল্প শিক্ষানীতির সাফল্য। এই সাফল্যকে ছোট করে দেখার অর্থ হচ্ছে সত্যের অপলাপ করা। কারণ সারা বিশ্বে এই মুহূর্তে নিরক্ষর মানুষের অর্ধেকের বেশি ভারতবর্ষের বাসিন্দা। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার এই সাফল্য অবশ্যই উৎসাহব্যঞ্জক।

দুঃখের বিষয় রাজ্যের সংবাদ মাধ্যমগুলি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাপ্রসারের এই সাফল্য তাদের শ্রেণিগত অবস্থান থেকে মেনে নিতে পারছে না। তাদের মতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এই রাজ্যে এত বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে প্রাইভেট ট্যুইশান। সংবাদ মাধ্যমগুলির মতে গ্রাম ও শহরের মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে অনাগ্রহী। পরিবর্তে 'কোচিং ক্লাসে' অথবা 'বাড়িতে প্রাইভেট ট্যুইশান' দিতে বেশি আগ্রহী। সংবাদমাধ্যম ও তথাকথিত একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী প্রতিনিয়ত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সম্পর্কে এই অপপ্রচার অব্যাহত রেখেছেন। সমাজ থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বিচ্ছিন্ন করার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। শুধু তাই নয়, এই প্রচারের মধ্যদিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে রাজ্য সরকার অনুমোদিত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান নিম্নগামী। সংবাদমাধ্যমের মতে, এর প্রধান কারণ, রাজ্য সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত ভুল নীতি এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে অনীহা। আসলে সংবাদমাধ্যম সাধারণের বিদ্যালয় ব্যবস্থা ধ্বংস করে শিক্ষায় বেসরকারী পুঁজির বিনিয়োগ কায়েম করে শিক্ষাকে বিত্তবানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। ইতোমধ্যে সারা দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে ১৫,১৯৬ কোটি টাকা বেসরকারী পুঁজি খাটছে। তাই এই ধারাবাহিক কুৎসা।

এই রাজ্যে সরকার অনুমোদিত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার। এদের মধ্যে একটি ছোট অংশের শিক্ষক-শিক্ষিকা কোচিং ক্লাস বা প্রাইভেট ট্যুইশান করেন। এই চিত্র আবার শহরের তুলনায় গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেশ কম। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, দুই/তিন শতাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রাইভেট ট্যুইশান বা কোচিং ক্লাসের সঙ্গে যুক্ত। অবশিষ্ট বেশিরভাগ মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়মিত আন্তরিকভাবেই শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাঁরা সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন। সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোগত কিছু সমস্যা থাকলেও প্রচলিত পরিকাঠামোকে ব্যবহার করে তাঁরা দায়িত্ব পালনে একনিষ্ঠ বলেই বিগত ২৭ বছরে রাজ্যে শিক্ষার পরিবেশ আশাতীত উন্নত হয়েছে। অর্থাৎ রাজ্যের শিক্ষার হার ও মান একটা ইতিবাচক স্থান অধিকারে সক্ষম হয়েছে। এই সাফল্য যেন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নেতিবাচক প্রচারের শিকার না হয়। এই ব্যাপারে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে।

কোনো শিক্ষক-শিক্ষিকা যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করেন বা উপশিক্ষকতার মতো একটি অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তবে তা অবশ্যই সমগ্র শিক্ষক সমাজের কলঙ্ক বলেই বিবেচিত হবে — সন্দেহ নেই। শিক্ষকতা পেশা নয়, বৃত্তি। অতএব প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে তাঁর বৃত্তিগত দায়িত্ব পালনে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতেই হবে।

রাজ্য সরকার কিছুদিন পূর্বে কর্মরত মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী অন্য কোন পথে আর্থিক উপার্জন কর্মে যুক্ত থাকতে পারবেন না, এ বিষয়ে সরকারী নির্দেশনামা প্রকাশ করেছিল। ঐ নির্দেশনামায় কিছু ত্রুটি থাকায় বর্তমানে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীর বৃত্তিগত নৈতিকতা সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশ অনুযায়ী একটি নির্দেশনামা প্রণয়নের প্রস্তুতি নিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একটি ছোট অংশের শিক্ষক-শিক্ষিকা সম্পর্কে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে অনীহার যে অভিযোগ উঠেছে তা সমগ্র শিক্ষক সমাজকেই তাদের দায়বদ্ধতার বিষয়টি সুনিশ্চিত করে অভিযোগ থেকে মুক্ত হবার বিষয়ে সচেষ্ট

হতে হবে। সবাই অবগত আছেন, শিক্ষাদানের মতো একটি মহৎ কর্তব্য পালনে অনীহার বিষয়টি আইন করে সমাধান সম্ভব নয়। কারণ, শিক্ষক শ্রদ্ধার সঙ্গে দান না করলে, ছাত্রেরও শ্রদ্ধার সঙ্গে তা গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরী হয় না। সমগ্র সমাজ শিক্ষক সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান না হলে কাঙ্খিত সাফল্যলাভ সম্ভব নয়। এই বিষয়ে সমিতিকে সাংগঠনিক উদ্যোগ নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের মেলবন্ধনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

৫। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতি

শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে স্বাধীনতার পর থেকে জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ না করা। একটা জাতির যদি তার দেশের বৈচিত্র্য অনুযায়ী শিক্ষানীতি না থাকে এবং শাসকশ্রেণি তার শ্রেণিগত অবস্থান থেকে শিক্ষাবিস্তারে অনীহা প্রকাশ করে, বা স্বাধীনতার ১০ বছরের মধ্যে ১৪ বছর পর্যন্ত বালক-বালিকাদের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার সাংবিধানিক দায়িত্ব না পালন করে, অথবা ১০টি পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেলেও কোন পরিকল্পনায় শিক্ষায় আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধির প্রশ্নে উদাসীন থাকেন, কিংবা শিক্ষাকে সংবিধানের রাজ্য তালিকা থেকে যুগ্ম তালিকায় নিয়ে গিয়ে অঙ্গরাজ্যগুলির শিক্ষানীতি গ্রহণের অধিকার কেড়ে নেয়, তবে সে দেশের শিক্ষার হাল যা হওয়া উচিৎ ভারতেরও তাই হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বড় সংকট ঘনীভূত হয়েছে বি জে পি নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চার সরকারের শাসনকালে। বিগত প্রায় ৬ বছর শাসন ক্ষমতায় ছিল। এই সময়ে বি জে পি সংঘ পরিবারের সদস্য হিসেবে তাদের যে রাজনৈতিক মতাদর্শ হিন্দুত্ব, বা হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি কার্যকরী করার জন্য ভারতবর্ষের বর্তমান প্রজন্মকে মিথ্যা বিকৃত ইতিহাস, জ্যোতিষশাস্ত্র, পুরোহিততন্ত্র পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে পাঠ্যসূচিকে সাম্প্রদায়িকীকরণের ষড়যন্ত্র ও বেসরকারীকরণের প্রয়াস চালিয়ে গেছে।

আশার কথা, চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনের জনাদেশে কংগ্রেস নিয়ন্ত্রণাধীন প্রগতিশীল সংযুক্ত মোর্চা বাইরে থেকে বামপন্থীদের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করেছে। ইতিমধ্যে প্রগতিশীল সংযুক্ত মোর্চা সরকার মানুষের স্বার্থে যে অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বাস্তবে তার ইতিবাচক প্রতিফলন হবে — ভারতবর্ষের জনগণের এটাই প্রত্যাশা। এই অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি থেকে ইতিমধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তার মুখ্য কয়েকটি বিষয় উল্লেখ্য ঃ

● জাতীয় উৎপাদনের (GDP) ৬ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা দীর্ঘদিনের উপেক্ষিত দাবী পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে এবং ঐ সম্পদের অন্তত অর্দ্ধেক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হবে। তার জন্য জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের ব্যবস্থা হয়েছে।

● গত ৬ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট করার যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চালানো হয়েছিল, তা থেকে মুক্ত করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বৃত্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার সুরক্ষিত করা, অর্থাভাবে এই শিক্ষার সুযোগ থেকে কোন মেধাবী শিক্ষার্থী যেন বঞ্চিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া, ইতিহাস গবেষণার জাতীয় পরিষদ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ ইন্দিরা গান্ধী ইনস্টিটিউট অব্ কালচার-এর প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা নিয়োগের সময় শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বৃত্তিগত দক্ষতাই একমাত্র বিবেচ্য হবে, এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং এইগুলি কার্যকরী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

● যে সকল সাম্প্রদায়িক উপাদানের দ্বারা বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠক্রমকে গত ৬ বছর ধরে সাম্প্রদায়িকতার আধিক্যে কলুষিত করা হয়েছে, তা দূর করতে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রাথমিক-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য মধ্যাহ্নকালীন আহার প্রদানের জাতীয় কর্মসূচি প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতির কথাও উল্লিখিত হয়েছে। অপুষ্টিজনিত দুর্ভোগের শিকার যাতে কোনো শিশুকে না হতে হয় তার জন্য সু-সমন্বিত শিশুবিকাশ প্রকল্পের অঙ্গনকে প্রসারিত করে সকল শিশুকে তার আওতায় আনার সংকল্প এই কর্মসূচিতে উল্লিখিত হয়েছে। এই অভিন্ন কর্মসূচিতে জাতীয় সমরশিক্ষা প্রকল্প, শারীরশিক্ষা, খেলাধূলার সুযোগ সকল বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পরিমাণে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

● সুখের কথা, দীর্ঘদিন পরে 'কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ' গঠিত হয়েছে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা জয়া হাসান এবং অধ্যাপক গোপাল সুরুর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে সি এ বি ই কমিটি অন রেগুলেটারি মেকানিজম ফর দি টেক্সট্ বুক। সব রাজ্যে সরকারি বিদ্যালয় ছাড়াও সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা

বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক পরীক্ষা করবে এই কমিটি। ৬মাসের মধ্যে এই কমিটি রিপোর্ট দেবে। এর কাজ হবে সারা দেশে নজরদারি করা যাতে কোথাও সংবিধান বিরোধী পাঠক্রম চালু না হয়।

● এছাড়া ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করার জন্য সংসদে একটি বিল আনা হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কপিল সিবালকে এজন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার রক্ষা নিয়ে গঠিত হয়েছে আরও একটি কমিটি। এই কমিটির প্রধান হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস। উল্লেখ্য, এন ডি এ শাসনকালে 'মডেল অ্যাক্ট ফর ইউনিভার্সিটি অব দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরী ইন ইণ্ডিয়া' বিলের সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

● এক ধর্মান্ধ-মতান্ধ-উগ্র সংকীর্ণতাবাদী হিংস্র শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় জনগণ কেন্দ্রে একটি বিকল্প সরকার গঠন করেছে। স্বাভাবিক কারণে এই সরকারের কাছে মানুষের অনেক প্রত্যাশা। জনগণের প্রত্যাশাকে মর্যাদা দিতে আশা করা যায় সরকার তার প্রতিশ্রুতি মাফিক কাজ করবে। শিক্ষার প্রশ্নে প্রগতিশীল সংযুক্ত মোর্চা সরকার তার কর্মসূচির মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা আশাব্যঞ্জক এবং অভিনন্দনযোগ্য। অতীতে কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতির পরিণাম দেখে মানুষ আশাহত এবং অনেকক্ষেত্রে অনৈতিকভাবে প্রবঞ্চিতও হয়েছেন। ভিন্ন পরিস্থিতিতে বর্তমান সরকারকে সেজন্য প্রতিশ্রুতি পূরণে সতর্ক, কর্তব্যে দৃঢ়, মানুষের কাছে অধিক পরিমাণে দায়বদ্ধ হতে হবে।

● চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে জনাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত প্রগতিশীল সংযুক্ত মোর্চা সরকার গঠিত হয়েছে এবং বামপন্থীরা সরকারের বাইরে থেকে সমর্থন করলেও নিয়ামক শক্তির ভূমিকা পালন করছে। এই নতুন পরিস্থিতিতে এই সরকারকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব বামপন্থীদের বহন করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল এই সরকারকে টিকিয়ে রেখে জনস্বার্থবাহী অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ এবং ভারতবর্ষের মানুষের স্বার্থে তা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে এই সরকার যদি কোন নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সঠিক জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকারকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্বও বামপন্থীদের। এই পরিস্থিতিতে আমাদের সমিতিকেও সতর্কভাবে প্রতিনিয়ত পরিস্থিতির উপরে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পরিস্থিতি উপযোগী সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

Pragmatism ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দর্শন

অধ্যাপক দিলীপ নারায়ণ ঘোষ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

Cash-Value, Truth Knowledge = What Pays, What Works

স্পষ্টতই এই লোকগুলি solipsism-এর বস্তাপচা বুলি আওড়ানো ছাড়া নতুন কিছুই বলছে না। James ভূয়সী প্রশংসা করছেন Bishop Berkeley'র। বস্তুকে (matter) এমন সাংঘাতিকভাবে ধূলিসাৎ করেছেন Berkeley যে তার নাম পরবর্তীকালের সমস্ত দর্শনে প্রতিধ্বনিত হয়েছে — বলছেন James[৩২]. Berkeley কি বলতে চাইলেন আমাদের তার বর্ণনা James দিচ্ছেন ঃ

"বস্তুকে (substance) ধূলিসাৎ করুন — উনি (Berkeley) আমাদের বল্লেন। বিশ্বাস করুন যে ঈশ্বর (god), যাকে আপনি বলতে পারেন এবং যার সান্নিধ্যে আপনি আসতে পারেন (can understand and approach), আপনাকে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতটা প্রত্যক্ষভাবে পাল্টিয়েছেন। তার স্বর্গীয় authority'র বলে আপনি এটাকে confirm করবেন এবং এতে মদত দেবেন (back it up).....sensationগুলিই হচ্ছে বস্তুর একমাত্র পরিচয়....".

মহাউৎসাহের সঙ্গে James ঘোষণা করছেন যে "বস্তুর ওপর Berkeley'র আক্রমণ (criticism).....পুরোপুরি pragmatistic". সুতরাং James নিজেই বলছেন যে pragmatism হচ্ছে subjective idealism — Dewey'র ভাষায় metapharsis of idealism. এখন James-এর এই Berkeleyan pragmatism হচ্ছে Dewey'রও দর্শন এবং John Dewey আমাদের বলছেনও যে ঃ

"আমার দৃঢ় ধারণা যে আমাদের দর্শনচিন্তা (our philosophising) বহুলাংশে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই করতে হবে এবং পরিশেষে এর থেকে এমন পরিপূর্ণ এক দর্শনের উৎপত্তি হবে যেটা বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলবে এবং শিক্ষা, নীতি মূল্যবোধ (morals) এবং ধর্মের প্রকৃত চাহিদাগুলিও মেটাবে।"[৩৩]

যাই হোক, এটা সন্দেহাতীত যে Wright-Peirce-James-Dewey'দের pragmatism অবক্ষয়ী ভাববাদী solipsism-এর দর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন solipsismটা মার্কিন কোন ব্যাপার নয়। এটা ইউরোপের সৃষ্টি। Peirce-James-Deweyরা এটার আগে মার্কিন একটি ছাপ লাগিয়েছেন পৌষ সংক্রান্তিতে গরুর গায়ে ছাপ মারার মত। উপরে উদ্ধৃত Peirce-এর বক্তব্যে লক্ষ্য করুন যে Peirce কেবলমাত্র 'effects'-এর কথা বলছেন না। উনি বলছেন সেই সমস্ত 'effects which might have practical bearings'. একমাত্র 'passive' ব্যতিরেকে আর অন্য কোন বিশেষণের দ্বারা experience'কে বিভূষিত করার প্রয়োজনের কথা চিন্তা করেন নি Bishop Berkeley. কিন্তু Peirceদের কাছে experience কেবলমাত্র passive হলেই চলবে না। তার practical bearingsও থাকতে হবে। পাশের ঘরে একটা চেয়ার রয়েছে — এটার অর্থ Berkeley'র কাছে হচ্ছে এই যে যদি 'আমি' পাশের ঘরটিতে যাই তবে চেয়ারটা 'আমি' দেখতে পাব। Peirce-Jamesরা বলছেন যে এটাই যথেষ্ট নয়। পাশের ঘরে একটা চেয়ার রয়েছে — এর অর্থ হচ্ছে যে যদি 'আমি' পাশের ঘরে যাই তবে 'আমি' যে শুধু চেয়ারটাই দেখতে পাব তাই নয়, চেয়ারটাতে বসতে পারব, বসে ধূমপান করতে পারব, ইত্যাদি practical bearings. 'Esseist percipi' বলেই ক্ষান্ত হলেন Bishop Berkeley. Peirceরা এটাকে বানালেন 'To exist is to be practical'. "Logic, Senses বা অতীব তুচ্ছতম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, যে কোন কিছু গ্রহণে ইচ্ছুক pragmatism এই দর্শন, এমনকি অলৌকিক অভিজ্ঞতাকে পর্যন্ত সমাদরে গণ্য করে শুরুমাত্র যদি practical consequences থাকে এসবের" — বলছেন James.[৩৪] "আমাদের দর্শনচিন্তা বহুলাংশে এই দৃষ্টিকোণ থেকে" দেখে মন্তব্য করলেন Dewey ঃ

"বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার থেকে বেশী প্রয়োজন হচ্ছে বস্তুকে ব্যবহার করা, ভোগ করা, বস্তুকে দিয়ে বা বস্তুর সঙ্গে থেকে কাজ করা।"[৩৫]

"আসুন আমরা pragmatic পদ্ধতি (rule) ব্যবহার

করি এবং কোন্ idea'র অর্থ আবিষ্কারে প্রশ্ন করি যে এর ফলাফলগুলি কি।"[৩৬] Pragmatic পদ্ধতিতে প্রতিটি notion-এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এর practical ফলাফলগুলিকে খুঁজে বের করা...... আপনি যদি pragmatic পদ্ধতি ব্যবহার করেন..... তবে প্রতিটি কথার practical cash-valueটা আপনি সামনে হাজির করবেন।"[৩৭]

"সাধারণভাবে আমাদের দায়িত্ব হলো এমন কাজ করা যাতে আমাদের লাভ হয় (to do what pays).Truthকে খুঁজে বের করাটাও এই দায়িত্বের (obligation) মধ্যে পড়ে। True ideas অনুসরণ যে করি আমরা তার একমাত্র কারণই হলো এগুলির থেকে payments পাওয়া যায়।"[৩৮]

"সংক্ষেপে বললে true মানেই হলো আমাদের চিন্তায় যা সুবিধেজনক (expedient in the way of our thinking). যেমন, সঠিক (আচরণ) হচ্ছে আচরণ করার পক্ষে আমাদের যা সুবিধেজনক (expedient in the way of our behaving)."[৩৯]

James-এর অনুসরণ করে বললেন Dewey ঃ

"True hypothess হচ্ছে সেই (hypothesis) যাতে কাজ হয় (that works)..... truth is an abstract noun applied to the collection of cases, actual, forseen and desired, that receive confirmation in their works and consequences."[৪০]

উপরে আমরা শুনেছি 'pragmatic পদ্ধতি' কি Dewey-এর মুখ থেকে (৩৬নং মন্তব্য)। এবার আরেকবার শুনুন James-এর কাছ থেকে, যাতে পাঠকের মনে কোন সন্দেহ না থাকে pragmatism দর্শনটা কি বস্তু সেটা সম্বন্ধে। Pragmatism-এর 'মূল প্রশ্নটা' কি তার ব্যাখ্যায় বলছেন James ঃ

"ধরে নেওয়া যাক যে কোন একটা idea বা বিশ্বাস (belief) হচ্ছে সত্য (true). (Pragmatism-এর) প্রশ্ন হচ্ছে, একজনের কাজে এই সত্য হওয়াটা কি তফাৎ আনবে? সত্যটা কেমন করে বাস্তবায়িত হবে? বিশ্বাসটা যদি সত্য নয় হতো তবে তফাৎটা কি হতো? অর্থাৎ সংক্ষেপে ব্যবহারিক দিক থেকে সত্যটার cash-valueটা কি?"[৪১]

এ ধরনের বক্তব্য পর্বতপ্রমাণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে James-Dewey-Peirce'দের লেখা থেকে। আমাদের বিশ্বাস যে pragmatism-এর দুই প্রধান প্রবক্তার যে বক্তব্যগুলি উদ্ধৃত করা হলো ওপরে সেগুলিই যথেষ্ট এই দর্শনের প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটনে। এই বক্তব্যগুলির সারমর্মটা কি? সেটা হচ্ছে যে objective truth বলে কিছুই নেই। স্বাভাবিকভাবেই কেননা এদের কাছে objective reality বলেই কিছু নেই যেটা আমরা দেখেছি উপরে। একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, truth-এর ওপর যে বক্তব্যগুলি আমরা শুনলাম সেগুলি knowledge সম্পর্কেও এরা একইভাবে রেখেছেন। কাজেই knowledge-এর ওপর আর আলাদাভাবে উদ্ধৃতি দেওয়া হলো না। উপরন্তু knowledge সম্পর্কে এদের Berkeleyan solipsistic কথাবার্তা আমরা ইতিপূর্বেই শুনেছি। Truth এবং knowledge যে চিন্তানিরপেক্ষ বস্তুজগতের প্রতিফলনেরই মানদণ্ড সেটা solipsist হিসেবে এরা একেবারেই স্বীকার করতে পারেন না। সবই হচ্ছে 'আমার' experience. বস্তুজগতের পরিবর্তে যেহেতু 'আমাকে' বসানো হয়েছে, সুতরাং truth, knowledge প্রতিফলনও করবে এই 'আমি'কেই। ফলে 'আমার' কাছে যেটা লাভজনক, যেটাতে 'আমার' সুবিধে হয়, যেসব idea এবং belief-এ 'আমি' 'payment' লাভ করি এবং 'আমার' কাছে যেগুলির 'cash-value' আছে সেগুলিই জ্ঞান, সেগুলিই truth. Truth বলেই কোন কিছু নেই। 'Truth'টা ঘটে যায় কখনও কখনও। Truthটাকে তৈরী করা হয় (Truth in made).[৪২] Idea'র এমনিতে কোন truth নেই — 'Truth happens to an idea'.[৪৩] কোন idea বা belief হচ্ছে true এই কারণে নয় যে এর নিজস্ব চিন্তানিরপেক্ষ objective কোন truth আছে। এটা true (বা false) কেননা 'আমি' (আবার বলব যে 'আমি'কে 'আমরা' দিয়ে লিখলেও কথাটা একই থাকে) মনে করছি এটা 'true', 'আমি' বলছি এটা true কেননা এটাকে true মনে করলে আমার লাভ হয়, cash-value, payment ইত্যাদি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে 'আমার'। যথার্থভাবেই true বলে কোন ideaকে গ্রহণ করলে যদি 'আমার' লাভ না হয় এবং বিপরীতে যথার্থই false এমন কোন idea দ্বারা যদি 'আমি' লাভবান হই, cash-value অর্জন করি, তবে সেই false ideaকে গ্রহণ করতে হবে এবং true ideaকে বর্জন করতে হবে।

"True ideas দিয়ে আমার যদি কোন ভাল না হয়, অথবা এগুলির জ্ঞানে যদি আমার অপকার হয়, একমাত্র false ideaগুলিই যদি আমার কাছে useful হয়.... তবে আমাদের কর্তব্য (duty) হলো true ideaগুলি বর্জন করা"। — একেবারে নিজমুখে বললেন James[৪৪].

অর্থাৎ 'আমার' (এর মধ্যে শ্রেণিও অন্তর্গত) যদি সুবিধে না হয়, লাভ না হয়, তবে 'সত্য' মানে হচ্ছে 'মিথ্যা' এবং মিথ্যাটাকেই সত্য বলে পরিগণিত করতে হবে।

উদাহরণ হিসেবে ইরাককে আক্রমণ ও ধ্বংস করাটা Peirce-James-Deweyদের 'pragmatic পদ্ধতি' লাগিয়ে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। এই পদ্ধতি হিসেবে দেখতে হবে যে ইরাকের উপর এই হত্যা ও ধ্বংসলীলাতে 'আমার' লাভ হচ্ছে কিনা। Cash-value, payments ইত্যাদি আসছে কিনা। এখন Haliburton, Beechtel, KBR মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মারণাস্ত্রর ব্যবসায়ী মহল, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পুঁজিপতি মহল এবং এদের মদতপুষ্ট জনগণের প্রতিনিধি Bush, Rumsfeld, Cheneyদের এটার মাধ্যমে অকল্পনীয় cash-value এবং payment আসছে। এতে সন্দেহ করার স্পর্দ্ধা কারো আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং এদের কাছে ইরাককে আক্রমণ এবং ইরাকীদের হত্যা করার idea এবং beliefটা হচ্ছে true, আর বিরোধী যারা তাদের কাছে এটা false. ১৯৫১ সালের New York Times-এ প্রকাশিত তৎকালীন মার্কিন সভাপতি Dwight Eisenhower (Ike)-এর ওপর এক রিপোর্ট উদ্ধৃত করেছেন Wells (পূর্ব দ্রষ্টব্য)। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে আণবিক বোমা ব্যবহার করার সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য Ike এই ধরনের pragmatic পদ্ধতি প্রয়োগ করার কথা চিন্তা করলেন।

"আণবিক বোমার ব্যবহার করা বা না-করাটা আমার মনে এই বিবেচনার উপর নির্ভর করবে। যদি আমি যুদ্ধে যাই তবে এটা ব্যবহার করলে আমার সুবিধে না অসুবিধে হবে, যদি আমি মনে করি যে সুবিধের দিকটা ভারী (the net war on my side) তবে আমি এটা মুহূর্তমধ্যে ব্যবহার করব..... ।"

আমরা আগে অনেকবার বলেছি যে মার্কিন সভাপতিরা হামেশাই নিজেদের Pragmatic বলে প্রচার করেন। অন্য আরেক উদাহরণ হিসেবে মনে করা যাক বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের কথা। Pragmatism-এর বিচারে এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টা সত্য সেটা বলা যায় না। উভয়েই সত্য। বস্তুজগতের ব্যাখ্যায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আর ধর্মীয় ব্যাখ্যা দুইই সমসারিতে truth হিসেবে। অর্থাৎ এক কথায়, যতরকমের শোষণ, বদমায়েসী, চুরিচামারী, হত্যা-রাহাজানি, সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার, ফ্যাসিবাদ, ক্যাথলিকবাদ, বর্ণবিদ্বেষ যাই বলা যাক না কেন সবকিছুকেই করা যেতে পারে Peirce-James-Dewey-Wrightদের অত্যাশ্চর্য্য pragmatic দর্শনের দ্বারা।

মন্তব্যের পাতা

৩২. William James —Pragmatism.

৩৩. Harry K Wells-এর পূর্বে উল্লেখিত বইটিতে উদ্ধৃত।

৩৪. William James —Pragmatism.

৩৫. John Dewey — Experience and Nature. Dewey এখানে 'things' এবং 'objects' দুটিই ব্যবহার করছেন। 'Things are objects to be....." অত্যন্ত imprecise বক্তব্য। 'Things', 'objects' বলতে 'matter' না 'material objects' বোঝাচ্ছে বোঝার উপায় নেই। ঠিক এইভাবেই এরা ব্যবহার করেন 'experience' কথাটা — experience টা ব্যক্তির বা objcetive reality'র তা বোঝা দুঃসাধ্য। আবার যেমন লেনিন বললেন যে 'experience' (আমরা এর সঙ্গে যুক্ত করব things, objects) এটা এমন অস্পষ্টভাবে ব্যবহার করা হয় যে এটা সর্বার্থক হয়ে দাঁড়ায়। যে কোন কিছু চালিয়ে দেওয়া যায় এই কথাটা ব্যবহার করে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে এই অস্পষ্টতাটা একেবারেই আসে না, কেননা এই দর্শন theory এবং practiceকে স্বতন্ত্রভাবে দেখে না। Theory এবং practice-এর unity প্রশ্নাতীত মার্কসবাদী দর্শনে।

৩৬ । John Dewey — Reconstruction in Philosophy.

৩৭ । William James — Pragmatism.

৩৮ । উপরে উল্লিখিত।

৩৯ । William James — Pragmatism.

৪০ । John Dewey — Quest for certainty.

৪১ । William James — Pragmatism.

৪২ । উপরে উল্লিখিত।

৪৩ । উপরে উল্লিখিত।

৪৪ । উপরে উল্লিখিত।

(চলবে)

সময়াভিযান

দুর্গাদাস ভট্ট

(শেষ পর্ব)

আকাশ দুটুকরো হয়ে যায়। শূন্যতার ওপারে শূন্যতা। যে আকাশে মেঘ ভাসে, বৃষ্টি হয়, নিঃসীম নীল সর্বাঙ্গ ধুয়ে দেয় — সেই নভোতলটাই এখন অচেনা।

পিন্টুরা জানে এখানে রাত আছে, দিন আছে, সূর্য নিভে গেলে ঘন অন্ধকারেও অসংখ্য নক্ষত্রখচিত আকাশ আছে, পৃথিবী নামক গ্রহটি তার উপগ্রহ সমেত তার হিসেব মত সচল হয়ে আছে। সবই আছে কিন্তু বহরমপুরের এই চ্যাটার্জী বাড়িটা যেন কোন কিছুর মধ্যেই নেই। বিশেষ করে পিন্টু, রুণা এবং তার দাদারা তাদের প্রত্যাশার রূপরেখার মধ্যে স্বাধীনতার কোন বর্ণাঢ্য ছবি আঁকতে পারছে না।

অথচ হাত মুঠো করে হেঁকে বলাও যাচ্ছে না — এ কেমন স্বাধীনতা যা তাদের দেশটাকেই ভেঙে টুকরো করে দেবে। ঘটনা কিন্তু চুপ করে বসে নেই। কোথায় যেন প্রাণ জাগে। নিজের অজান্তেই কারা উঠে বসে জানালা খুলে দেয়, ভেসে আসে সুস্থ জীবনের ছবি। স্বপ্নের মধ্যে পিন্টুরও মনে হয় — দেহের কিছুটা অংশ বাদ গেল ঠিকই, কিন্তু অনেকটাই তো বাঁচল। সেই কবে অরুণদার সঙ্গে ভাকুরী, হাটগাছা, চোঁয়াপুরের দিকে ঘুরে বেড়িয়েছে পিন্টু। পচা পাঁকের মধ্যে অর্দ্ধনগ্ন মানুষকে কাঁকড়া ধরতে দেখেছে। পিন্টু এবং পিন্টুর মত ভদ্র সমাজের দিকে ব্যঙ্গ-মিশ্রিত অভিমানকে ছুঁয়ে দিতে দেখেছে। এছাড়া কত যে বৈষম্য এবং হাহাকার এসব তো ছড়িয়ে ছিটিয়ে এমনভাবে আছে যেন সেটাই স্বাভাবিক। রাজপুরুষেরা গাড়ি চড়বে, সাধারণ মানুষ "বন্দেমাতরম" ধ্বনি দিলেও লাঠি পেটা করবে, যুদ্ধ বাধলে দেশের চাল গম খাদ্যদ্রব্য সবই মিলিটারীদের প্রয়োজনে চলে যাবে। তার মধ্যে অনেকটাই গোডাউনে পচবে। কিন্তু বাইরে তীব্র অভাব। মানুষ অনেক বেশি দাম দিয়ে তাদের নিত্য প্রয়োজনের জিনিস কিনে আনছে। কিন্তু তাতেও পেট ভরছে না। অভাব থেকেই যাচ্ছে। দেশের কাঁচামাল বিদেশে গিয়ে তৈরি হয়ে আসছে। কুটির শিল্পেরও শেষ দশা — এ সবই দ্রুত পাল্টাবে স্বাধীনতার হাত ধরে এটাই কি কম?

তবু পিন্টুদের এই জেলা মুর্শিদাবাদ পাকিস্তানে যাবে, না ভারতে এই ভাবনাটাই এখন তুঙ্গে। ইতিমধ্যে পিন্টুদের শহরের গ্র্যান্ট হলে মুর্শিদাবাদ জাতীয় বঙ্গ সম্মেলনের এক সভায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী হিন্দুদের দাবীর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন, যেখানে সরকারী তহবিলের অধিকাংশই আসে আমাদের ধনভাণ্ডার থেকে, যেখানে শিক্ষামন্দিরের প্রায় প্রত্যেকটি আমাদের অর্থ সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ; বাংলার সংস্কৃতি এখনও যেখানে আমাদেরই প্রতিভার গৌরব ময়দানে প্রধানত পরিপুষ্ট, সেখানে আমাদের এই সকল দানের কি কোন স্বতন্ত্র মূল্যই নির্দিষ্ট হবে না? সেখানেও কি আমরা সংখ্যালঘিষ্ঠতার অপরাধে সবরকমের অবিচার অত্যাচার মাথা পেতে সহ্য করব....।

পিন্টুর বাবা, কাকা এমনকি মেজদাও সেই মিটিং শুনতে গিয়েছিলেন। ধীরেন্দ্র বাড়ী ফেরার পর তাঁর সেই বাইরের ঘরের ইজিচেয়ারটায় গা ছেড়ে দিয়ে বললেন — হায়রে গণতন্ত্র, অথচ যে স্বাধীনতার পিছনে আমরা ছুটছি, সেখানেও তো অধিকাংশের দাবিই উঠবে। বাবু জগজীবন রাম তো ইতিমধ্যেই হরিজনদের বিশেষ অধিকারের কথা তুলেছেন। হিন্দু-মুসলিমের ব্যাপারটা তো আছেই, তার ওপর এইসব জাতিভেদের প্রসঙ্গ, জানি না কি হবে? আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা কি রেখে যাচ্ছি?

সেদিন পিন্টুদের বৈঠকখানায় শহরের অনেকেই এসেছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথের সহকর্মী অধ্যাপক বন্ধুদের মধ্যে দেবকুমার বাবু, কালিকাবাবু, শঙ্করবাবু ছাড়াও পাড়ার বর্ষীয়ান নন্দকুমারবাবু, তেজেসবাবুও ছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে শহরের বিশিষ্ট উকিল মল্লিকাদির বাবা সুজয়বাবুকেই বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণে বেশী তৎপর মনে হচ্ছিল। দেশভাগ না করে স্বাধীনতা যে পাওয়া যেত না এবং অচলাবস্থা কাটাতে গেলে অনেক অপ্রিয় সত্যকে মেনে না নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই — এই কথাটাই নানাভাবে ঘুরে ফিরে আসছিল।

ধীরেন্দ্রনাথ বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর মনের কথাটা বলেই ফেললেন,

— সবই তো বুঝলাম, আমরা তাহলে এখন যাব কোথায়? ঘরের মধ্যে তখন ঘোর নীরবতা, সকলেই চুপ। স্পষ্টই

বোঝা গেল, মুর্শিদাবাদ জেলার অবস্থান পাকিস্তানে না ভারতে হবে এই চিন্তাই এঁদের ভিতর থেকে চেপে ধরেছে। এক্ষেত্রে কোন্‌টা সঙ্গত, কোন্‌টা অসঙ্গত এই প্রশ্নটাই বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক। শুধু একজনকেই এ ব্যাপারে একেবারেই নির্লিপ্ত মনে হল। স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক মৌলবী সাহেবকে। তিনি তাঁর মেহেদি মাখানো দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন,

— আমার কোন কিছুতেই আসে যায় না ধীরেনদা। আমি তো আপনাদের পাড়াতেই থাকি, আপনারা আমাকে ভালও বাসেন। সুতরাং পাকিস্তানে আছি, না ভারতে আছি এটা আদৌ আমার কাছে কোন ব্যাপারই নয়।

বিষয়টা হঠাৎই এমন একটা মোড় নেবে একথা বোধহয় কেউই ভাবেন নি। বিশেষ করে কখন মৌলবী সাহেব চুপিচুপি এসে বৈঠকখানার এক কোণে জায়গা করে নিয়েছিলেন, এটা কারো নজরেই আসে নি। এখন এর কথার উত্তরে কে কি বলবে? শুধু নড়েচড়ে বসে ভিতরের কথাটা ভিতরেই বন্ধ করে রাখা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

এই সভাটা এই মুহূর্তেই শেষ করে দেওয়া দরকার। ধীরেন্দ্র, মানবেন্দ্র, নন্দবাবু, শঙ্করবাবু সকলেই সেটা চাইছিলেন। একটা সুযোগও এসে গেল। দেওয়ালে টাঙানো ওয়াল ক্লকটায় ঢং করে একটা বাজল। ধীরেন্দ্র বললেন, অনেক বেলা হয়ে গেছে। আমরা স্নান খাওয়া না সারলে বাড়ির মেয়েরাও খেতে বসবে না। আজ এই পর্যন্তই.....সকলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

সেই নিঃশব্দ গুঞ্জন অনেককেই ডেকে আনছে। বিশেষ করে দেবযানী এবং সুজয়বাবুর মেয়ে মল্লিকা মাঝে মধ্যেই জানতে চাইছে — পিন্টু, রুণা এবং বাড়ির অন্যান্য সকলে কি ভাবছে এখন। কি করে তাদের ধারণা হল — এই জেলাটা পাকিস্তানে যাচ্ছেই। শহরের মুসলিম সমাজ তো ইতিমধ্যেই মিছিল বার করছে। পিন্টুর সহপাঠী, নীলু, ভুলু, আকা, ছটকু, বড়কু সবাই ভোজালি, সড়কি, শক্ত বাঁশের লাঠি হাতে ধরে রাস্তায় রাস্তায় চেঁচাচ্ছে — লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।

ওদের এই আশঙ্কাটা আসছেই বা কেন? মাঝে শোনা যাচ্ছিল — খুলনা জেলা ভারতে আসার বিনিময়ে মুর্শিদাবাদ জেলাটা পাকিস্তানে যাচ্ছেই — এখন আবার ভিন্ন চিত্র। বহু ঘটনা এবং গুজবের হাত ধরে উত্তেজনার পারদের ওঠানামা। খুলনার আয়তন ৪৮০৫ বর্গমাইল এবং মুর্শিদাবাদের ২০৬৩ বর্গমাইল। সুতরাং অর্দ্ধেক আয়তনের মুর্শিদাবাদের সঙ্গে খুলনার বিনিময় কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। উভয় জেলার শস্য সম্পদের বিচারেও এ ধরনের বিনিময় অবান্তর। এখন তো এই আলোচনাই সর্বত্র।

এইসব তথ্য এবং যুক্তি দিয়ে সেদিন মেজদা অমল, মল্লিকাদি এবং দেবযানীকে কি একটা বোঝানোর চেষ্টা করছিল, তখন বিকেল। বর্ষাকাল শুরু হলেও তেমন একটা বৃষ্টি নেই। শুধু মেঘের ভারে গুমোট হয়ে আছে। ওরা তিনজনেই তিনতলার ছাদের সিমেন্টের বেদীটার ওপর বসেছিল। পিন্টু এবং রুণাও অল্পক্ষণের মধ্যে এই আলোচনায় যোগ দিল। ওরা আসার আগে মেজদা কি কি কথা বলেছিল পিন্টু জানে না। রুণাও জানে না। শুধু মেজদার শেষের কথাটাই শুনতে পেল।

— তোমরা কি ভাবছ আমরা সব এখান থেকে চলে যাব। কিছুক্ষণ চুপ থেকে মল্লিকা বলল,

— সেই রকমই তো শুনছি....

— কে বলল পিসীমারা, নাকি মা, না কাকিমা?

— না, তারা কেউ নয়, আমার কিন্তু পিন্টুদাকেই কেমন কেমন লাগছে.....।

পিন্টুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেবযানী বলে,

— কেমন কেমন মানে? একি বলছ দেবযানী।

পিন্টু প্রায় ধৈর্য্য হারানোর মত গলায় বলে ওঠে।

দেবযানী এবার ঘাড় ঘুরিয়ে চারিদিক দেখে নিল। ওকে আজ হাল্কা সবুজ শাড়ীতে দারুণ দেখাচ্ছে। বুকের আঁচলটা ঠিক করে বলল — ওই তো সেদিন তুমি বলছিলে।

— কি বলছিলাম।

— তুমি যে বললে — মানুষের ওপর বিশ্বাসটাই চলে যাচ্ছে।

— হ্যাঁ, কথাটাতো ঠিকই, যাদের আমরা কত বিশ্বাস করতাম কত শ্রদ্ধা করতাম, তারাই স্রেফ নিজেদের স্বার্থে কত কিছু পুলিশের কানে গিয়ে লাগিয়েছে। আবার এখন রাতারাতি ভোল পাল্টে স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে চেঁচাচ্ছে.....।

কথাগুলো পিন্টু বেশ জোরেজোরেই বলছিল। এমনিতেই সে ঠিক ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলতে পারে না। মানুষের মন জুগিয়ে কথা তো নয়ই। সে সদ্য যৌবনে পা রাখা স্বাস্থ্যবান যুবক। যে এতকাল সর্বক্ষেত্রে দাপিয়ে এসেছে। এখন দেখছে যেন চারপাশের অনেকটাই বিপরীত। মানুষ আর মন খুলে কথা বলছে না। কোন্‌টা মুখ আর কোন্‌টা মুখোশ সেটা চিনে নেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনও দেখা যাচ্ছে যারা এতদিন মুসলমানদের তেমন একটা পাত্তা দিত না, তারাই এখন হেসে হেসে কথা বলছে। নতুন করে যেন

আলাপ পরিচয় করছে। এবং খুব তাড়াতাড়ি ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য এমন একটা ভাব করছে যেন কত না দরদী, কত না আপনজন। এসবগুলো ভণ্ডামি ছাড়া আর কি বলা যায়। অথচ এটাও খুবই স্পষ্ট কি একটা অজ্ঞাত সূত্র ধরে মুসলিম সমাজেও চাঞ্চল্য জেগেছে। পিন্টু জানতে পেরেছে এখানকার লিগপন্থী দু'চারজন দিল্লী গিয়েছিল, সেখান থেকে আরো যেন কোথায় কোথায়, তারা ভয়ঙ্কর সব সংবাদ এনেছে। হিন্দুগোষ্ঠীর নেতারা নাকি ইতিমধ্যেই র‍্যাডক্লিকের সঙ্গে লাইন করে ফেলেছে — খুলনা জেলাকে পাকিস্তানের দিকেই ঠেলে দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলাকে ভারতে রাখার চেষ্টা এখানে প্রবল। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলার ছাপখাটি থেকে যে ভাগীরথী নদী মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে, সেই ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে। নইলে হুগলী নদী বাঁচবে না। কলকাতা বন্দরেরও সর্বনাশ হবে।

এইসব সংবাদেও মুসলমানরাও গভীর চিন্তায়। মুখে তারা বলছে — দেখে নেব, দেখে নেব। রাস্তায় লাঠি সড়কি নিয়ে মিছিল করছে। ধ্বনি দিচ্ছে — পাকিস্তান লড়কে লেঙ্গে।

হাওয়া যে এখন কতটা গরম পিন্টুরা সেকথা জানে। দেবযানীর উদ্বেগ যে কেন একথাও পিন্টু জানে। কিন্তু বয়স মানে না। দু'দিন পরেই খুব ভোরের দিকে পিন্টু আবার সেই বকুলতলার ধারেকাছেই ঘুরছিল। আগের দিন রাতে জোর বৃষ্টিও হয়েছিল। পাশের নালাটায় বেশ জল জমেছে। বকুলতলার চত্বরটাও ভেজা। তার ওপর দু-চারটে বকুল ফুল পড়ে আছে। ওখানে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই মনে হয় — ওই যে হাজি সাহেবের বাড়িটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ওটারই পাশ দিয়েই তো একটা সুঁড়ি পথ, যদিও বুনো ঝোপে ঢাকা। দুধারে শুধুই কুর্চি আর আসশেওড়ার গাছ। ওপথে অনেক বাঁদরলাঠি গাছও আছে। ওর ফলগুলো অনেকটা লাঠির মত। হাওয়ায় দোলে। যে গাছের গা জড়িয়ে তেলাকুচো গাছও উঠে গেছে। লাল টুকটুকে তেলাকুচোও পিন্টু দেখেছে। কিন্তু এখন ওই পথটাই যেন সুন্দরের পশরা সাজিয়ে পিন্টুর সামনে হাজির হচ্ছে। কিন্তু কেন? এই মুহূর্তে ওই পথটার কথাই মনে পড়ছে কেন পিন্টুর — কারণ ওই পথ দিয়ে অল্প হাঁটলেই সেনপাড়ায় পৌঁছানো যায়, যেখানে দেবযানীর বাড়ি।

কি একটা অদৃশ্য শক্তি পিন্টুর হাত ধরে টানছিল। ওই সুঁড়িপথের দু'পাশের ঝোপঝাড় এমনভাবে ঝুঁকে আছে যে ঘাড় নীচু করে দুহাত দিয়ে ডালপালাগুলো সরাতে সরাতেই এগুতে হয়। তবু ক্রমাগতই পিন্টুর ভিতর থেকে কে যেন বলে চলেছে — দেবযানী ভয় পেয়েছে। ওকে কিছু আশাভরসার কথা বলতেই হবে। পিন্টুরা যদি সপরিবারে জেলা ছেড়ে চলে যায়, ওরাই বা থাকবে কি নিয়ে? তাছাড়া জেলাটা পাকিস্তানে চলে গেলে পিন্টুরা না হয় পালিয়ে বাঁচল, বাকী সকলের কি হবে? তারা নিরুপায় আর পিন্টুদের চলে যাওয়ার সুযোগ আছে বলেই তারা চলে যাবে? একথাটা ভাবতেও কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠছে পিন্টুর।

অল্পকিছুটা হাঁটার পরই পিন্টু দেখল কখন সে মেথর পাড়ার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। বাঁশের খুঁটি আর মাটির দেওয়ালের ওপর খোলার টালি দেওয়া সব ঘর। কোনোটায় টিনের চাল। নোংরা উঠোন। নানা আবর্জনা থেকে পচা গন্ধ উঠছে। কয়েকটা রাস্তার কুকুর আবর্জনা ঘাঁটছে। একটা বেজী বোধহয় মনসা আর কালকাসুন্দির জঙ্গল থেকে লাফ মেরে পিন্টুর সামনে চলে এসেছিল। তারপর দ্রুত হরিতকি গাছটার পিছনে চলে গেল। পিন্টু শুনতে পেল কারা যেন মিহি স্বরে 'পিন্টুদা পিন্টুদা' বলে চেঁচাচ্ছে।

পিন্টু এই মুহূর্তে যেন নিজেকেই চিনতে পারছিল না। সে কি এতটাই সার্বজনীন? এইসব অর্দ্ধভুক্ত অর্দ্ধনগ্ন ছেলেমেয়েগুলো তাকে 'পিন্টুদা পিন্টুদা' বলে ডাকছে। সে তো কোনোদিন এদের কোলের কাছে টেনে নেয় নি, দূর থেকে দেখেছে — এইমাত্র। এদের দুঃখকষ্টের অংশভাগ নেওয়ার মত ক্ষমতাই বা তার কোথায়। তবু এরা পিন্টুদা বলে ডাকে কেন। সে কি এ অঞ্চলে এতটাই পরিচিত? পিন্টু এবার এগিয়ে গিয়ে ওদের মধ্যে দাঁড়ায়। এদের বেশীরভাগই কিশোর-কিশোরী। মাত্র দুজনকে কিছুটা বড় বলে মনে হয়। সকলের জামাপ্যান্ট ময়লা। চুল উস্কোখুস্কো। গায়ের চামড়া কালো খসখসে। চোখের দৃষ্টির মধ্যেও কেমন একটা মরা মরা ভাব। এদের মধ্যে একটি কিশোরীকেই কিছুটা চেনা মনে হচ্ছে পিন্টুর। টান করে চুল বেঁধে চুলে কাপড়ের ফুল জড়িয়েছে। গায়ের চামড়াতেও তেল তেল ভাব, অতটা খসখসে নয়। পিন্টুর যেন হঠাৎই মেঘ কেটে গিয়ে রোদ ঝলসে উঠল — হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মেয়েটির নাম পুষ্প। পাড়ার লোকে ওকে পুষি বলে ডাকে। ও মাঝে মধ্যে তাদের কিশলয় সঙ্ঘে যেত। পিন্টু এবার হাত নেড়ে পুষ্পকে কাছে ডাকল।

— এই পুষি, এরা কি বলছে রে? আমাকে ডাকছে কেন?

— ওরা স্বাধীনতা কি তাই জানতে চাইছে, লোকে এত স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে চেঁচাচ্ছে কেন? পুলিশরাই কেন

তাদের লাঠি পেটা করছে?

পিন্টুর পা দুটো এবার মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে চাইল। এর উত্তর সে কি দেবে? স্বাধীনতা পাওয়া গেলে এইসব আধপেটা খাওয়া শুধু ছেঁড়া হাফ প্যান্টের ওপর নোংরা গেঞ্জী, কিংবা গা খালি বালক-বালিকাগুলো বাড়তি কি পারে? এ উত্তর তো তার জানা নেই। সে কি তার ভাবাবেগকে তার স্বপ্নের জগতকে এদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে? সে নিজেই তো এখনো জানে না ঠিক কি প্রক্রিয়ায় মানুষের রক্ত নিংড়ে নিয়ে লাল মুখোরা বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। তাছাড়া তার নিজের দেশেও তো উঁচু-নীচু, গরীব-বড়লোক, ছোটজাত-বড়জাত এসব তো আছেই। সামাজিক কুপ্রথাগুলোকে রদ করার জন্য রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও এবং আরো অনেকে তো কত আন্দোলনই করেছেন কিন্তু সেগুলো যাচ্ছে না কেন? স্বাধীনতার ফলে রাতারাতিই কি এইসব দেশ থেকে চলে যাবে? ভীষণ একটা ধন্দের মধ্যে দুলতে থাকে পিন্টু। এইসব কিশোর বয়সের বালক-বালিকারা কত সবল। এদের চোখেমুখে যেন স্পষ্ট জিজ্ঞাসা — কি এই স্বাধীনতা, জবাব দাও। ওসব ভারত-পাকিস্তানের কথা পরে শুনব।

পিন্টু এক পা এক পা করে ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ওই ময়লা অপরিচ্ছন্ন দেহগুলো স্পর্শ করতেও ইচ্ছা হয়। কিন্তু কোথা থেকে একটা সংকোচের সুর ধ্বনিত হচ্ছে। এতো শুধু গায়ে হাত দিয়ে আদর করা নয়, ওদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে স্বাধীনতার অর্থ। যা এ পর্যন্ত তার চারপাশের জ্ঞানীগুণীরাও ঠিকমত তুলে ধরতে পারে নি। যারা অসহযোগ আন্দোলন করেছেন, যারা 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' বলেছেন কিংবা বোমা বন্দুক নিয়ে ইংরেজদের মনে ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, তাঁরা কেউই স্বাধীনতার কোন গ্রহণযোগ্য ছবি তুলে ধরতে পারেন নি। শুধু বলেছেন আগে তো ইংরেজদের তাড়াই, পরের কথা পরে ভাবা যাবে। কিন্তু পরে কি অবস্থা দাঁড়াবে — এইসব চোখের কোলে বসা অর্দ্ধভুক্ত অর্দ্ধনগ্ন মানুষগুলো — গায়ের ধূলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কি হেঁকে বলতে পারবে — হ্যাঁ, আমরা পেরেছি — এটাই ছিল আমাদের প্রত্যাশার ছবি — আমাদের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা সবকিছুরই এবার সুসমাধান হবে।

মাথা ঘুরতে থাকে পিন্টুর। সকাল সাতটা নাগাদ চায়ের সঙ্গে দুমুঠো শুকনো মুড়ি চিবিয়েছিল। এখন অনেকটাই বেলা বেড়েছে। পেটের মধ্যে ক্ষিদের কামড় বুঝতে পারছে পিন্টু। কিন্তু যারা এখন তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তাদেরও ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়। তাদেরও কি মাথা ঘুরছে? তাহলে ওরা কেন মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে না? ওরা ক্ষিদে সহ্য করতে জানে। সহ্য কেন, হয়ত ক্ষিদেটাকেও হজম করতে জানে। পিন্টুর ইস্কুলে যিনি স্বাস্থ্য পড়ান সেই জয়দেব স্যার একদিন ক্লাসের মধ্যেই বলেছিলেন — আমাদের দেশের অধিকাংশ শিশুরাই অপুষ্টিতে ভোগে। উপযুক্ত খাদ্য নেই, আলো হাওয়াযুক্ত উপযুক্ত বাসস্থান নেই, বড় ধরনের ঝড় উঠলে তাদের ঘরের চালটাই উড়ে যায়, কখনো দেখে নদীর ভাঙনে তাদের গ্রামটাই চলে গেল, তারা সব অকূলে ভাসছে।

এখন এই মুহূর্তে স্বাধীনতার ফলে তাদের কোন কোন সমস্যার সমাধান হবে। কাদের হাত ধরে হবে, কিভাবে হবে এটা ভাবামাত্র সর্বাঙ্গ অবশ মনে হয় পিন্টুর। সে শুধু বলে — স্বাধীন বলতে আমি যা বুঝি এতদিন বিদেশীরাই আমাদের সব কিছু লুটে খেয়েছে জানতো। আমরা তাদের তাড়াচ্ছি। এবার ওই কালেক্টরেটের মাথায় ইংরেজদের পতাকা দেখতে পাবে না। আমাদের জাতীয় পতাকা উড়বে।

— তাতে আমরা কি পাব? এই তো আমার বাবা সুদের টাকা দিতে পারে নি বলে নগেনবাবু লেঠেল দিয়ে বাবাকে পিটিয়েছে, তার কি হবে?

ওদের মধ্যেই একজন বলে ওঠে,

— আমি জানি না।

পিন্টু চকিতে চারিদিকটা দেখে নিয়ে একটা পিটুলি গাছের নীচে পড়ে থাকা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে পড়ে। মাথাটা তার সত্যিই ঘুরছে। পায়ের নীচের মাটি কাঁপছে কিনা বুঝতে পারছে না। তবে হাঁটুদুটো কাঁপছে। ছেলেমেয়েগুলো তার আরো কাছে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। পুষ্প বলছে,

— পিন্টুদা তোমার কি শরীর খারাপ করছে? দেবযানীদিকে কি ডেকে আনব?

পুষ্প হঠাৎ দেবযানীর কথা বলে কেন? এর মধ্যেই পিন্টুর বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন নড়ে ওঠে। এরা সব কি ভাবছে? দেবযানী যে তার কে? তার অস্তিত্বের কোন্ জায়গাটা সে দখল করে আছে সে কথা পুষ্প জানল কি করে? সে শুধু মাথাটা উঁচু করে বলে — না কাউকে ডাকতে হবে না, মাথাটা হঠাৎ একটু ঘুরে গেল, তাই.....

— শুধু কি তাই, তুমি তো ভীষণ ঘামছ.....

পুষ্পর কথার মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ ফেটে বেরোয়।

— না, আমি শুনব না, আমি যাই.....

পুষ্প এবার গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে সেনপাড়ার দিকে ছুটল।

পিন্টু বুঝছে এখুনি উঠে বাড়ীর দিকে না ফিরলে একটা নাটকীয় কিছু না হয়ে যায়। সে উঠে দাঁড়ায়। এর মধ্যে পাড়ার অনেকেই এসে দাঁড়িয়েছে। এ পাড়ার জগা, মনা, লখীন্দর এদের পিন্টু চেনে। বাড়ীর সামনের রাস্তা পরিষ্কার, নালা পরিষ্কার ইত্যাদিতে এদের ডাক পড়ে। লখীন্দর এগিয়ে এসে বলে,

— তাহলে হাবলাকে ডাকি, ওতো রিক্সা চালায়। ও এখনো বাড়ীতেই আছে।

— কি হবে রিক্সা দিয়ে, আমি হেঁটেই যেতে পারব।

— তাহলে আমরা তোমার সঙ্গে যাই, তুমি তো টলছ। না ধরলে যদি পড়ে যাও।

যাইতো যাব, তোমরা সরো তো, — যাও সব।

পিন্টু রীতিমত রেগে যায়। সে প্রায় ছুটেই মেথরপাড়া থেকে বড় রাস্তায় এসে হাজির হয়।

কিন্তু পাড়ায় ঢুকেই আবার নতুন করে মাথা ঘুরে যায় পিন্টুর। সামনের অশখতলার মোড়ে কারা যেন বাঁশের খুঁটিতে একটা তেরঙ্গা পতাকা টাঙিয়ে দিয়েছে, হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে পতাকাটা। আমগাছে, কাঁঠালগাছের ডালেও কাগজের সব তেরঙ্গা পতাকা। দূর থেকে কারা যেন গান গাইতে গাইতে আসছে — সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং....মাতরম। আরো দূরে ব্যাণ্ডবাদ্য...। কদম কদম বাড়ায়ে যা, খুশিসে গীত গায়ে যা.....

তাহলে? এই সংবাদ মুহূর্তমধ্যে আগুনের মত ছড়িয়েছে — মুর্শিদাবাদ জেলার ভারতভুক্তি অবশ্যম্ভাবী। পিন্টুদের বাড়ীর সামনে কিশলয় সংঘের অনেকেই এসে জটলা করছিল। বুড়ো আর সুবল ছুটে এসে পিন্টুকে জড়িয়ে ধরল।

— পিন্টুদা, সেই সকাল থেকে তোমাকে খুঁজছি, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

পিন্টু বলল — জানি না।

— সে কি, কোথায় ছিলে, সেটাই তুমি জানো না। এদিকে আমাদের জেলা ভারতেই থাকছে জানো তো, খুলনা যাচ্ছে পাকিস্তানে।

— জানি না।

— তোমার মাথাটা ঠিক আছে তো পিন্টুদা। জানো তো আজই রাতে ভারতের হবু প্রধানমন্ত্রী বেতার ভাষণ দেবেন। চণ্ডীদাস আর বিমল বলে।

— জানি না।

সবই যেন অর্থহীন আর বর্ণহীন বলে মনে হয়, এদের ছেলেরা যেন ভয় পাওয়া মুখে তাদের বড় আদরের বড় গর্বের পিন্টুদাকে নতুন করে দেখতে থাকে।

সেই রাতেই ভারতের হবু প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বেতার ভাষণ দিলেন,

— ঘড়িতে মধ্যরাত্রির ঘন্টা যখন বাজিবে, যখন সারা বিশ্ব নিদ্রাভিভূত, ভারত তখন নূতন জীবন ও স্বাধীনতার আনন্দে জাগিয়া উঠিবে। ইতিহাসে এমন মুহূর্ত কদাচিৎ আসে যখন আমরা পুরাতনকে পরিত্যাগ করিয়া নূতনকে বরণ করি, যখন জাতির অন্তরাত্মা যাহা দীর্ঘকাল প্রদমিত ছিল পুনরায় বাঙ্ময় হইয়া উঠে। এই পুণ্যলগ্নে আমাদের ভারত তথা ভারতবাসীর বিশ্বমানবতার সেবায় আত্মোৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করা উচিত।

সেদিন রাতে রেডিও সংবাদ শোনার লোকের অভাব ছিল না। সকলেরই মুখ যেন একটা অজানা উৎসাহ, অজানা আনন্দে একেবারে ফেটে পড়ছিল। শুধু মুসলমান পাড়ায় আলো জ্বলছিল কিনা সে খবর তখন পর্যন্ত কেউ এনে দিতে পারে নি।

(সমাপ্ত)

সর্বশিক্ষা অভিযান

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
শিক্ষক, সুভাষপল্লী বিদ্যানিকেতন বর্ধমান

অংশগ্রহণ ও পরিচালনায় মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়গুচ্ছের ভূমিকা

সর্বশিক্ষা অভিযান চতুর্থ বর্ষে (২০০৪-২০০৫) পদার্পণ করল। এই অভিযানের মুখবন্ধে যে কথাটা মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা হয়েছে তা হল Sarva Siksha Abhijan is an effort to universalise elementary education by community ownership of the school system মাধ্যমিক স্তরে ৯-১৪ বছরের সব শিশুকে বিদ্যালয়ে আনা, ধরে রাখা ও একটি কাঙ্খিত মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে এই সর্বশিক্ষা অভিযান। বিদ্যালয়গুলির বর্তমান প্রচলিত পরিচালন ব্যবস্থায় এ কাজ সম্ভব নয়। আমাদের আরও একটু পিছনে ফিরে দেখলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে।

প্রগতিশীল শক্তি হিসেবে রাজ্যে বামফ্রন্টের ক্ষমতায় আসা, উপর্যুপরি নির্বাচনগুলিতে জয়লাভ, রাজ্য বাজেটে শিক্ষায় ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি, শিক্ষা জনমুখী করার নীতি গ্রহণ ইত্যাদি কারণে সাধারণ মানুষের শিক্ষার চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। স্বাধীন ভারতের নাগরিকের অবদমিত আশা আকাঙ্ক্ষা বামফ্রন্টের আমলে রাজ্যে যে স্ফূরণ ঘটেছে শিক্ষার অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তত নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়েছে বামফ্রন্টের শিক্ষানীতির মধ্যেদিয়ে। এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষকে যথার্থভাবে সাহায্য করার যে কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন ছিল প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা কোন স্তরেই তা উপযুক্ত মাত্রায় পরিলক্ষিত হয় নি। সরকারের জনস্বার্থবাহী কর্মসূচিকে সফল করার জন্যে যে গণউদ্যোগ সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল তা বাস্তবায়িত করা যায় নি। হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট বলছে ঃ মাধ্যমিকস্তরে ১০-১৪ বছর বয়সের যত কিশোর-কিশোরী আছে সারা বিশ্বে ৬৬ শতাংশ বিদ্যালয়ে যায়, বিকাশশীল দেশে ৬০ শতাংশ এবং ভারতবর্ষে ৫০ শতাংশ বিদ্যালয়ে যায়। বালিকাদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৬১,৫৩ ও ৩৯ শতাংশ।

বর্ধমান জেলায় ৯ থেকে ১৩+ বয়সের মোট সংখ্যা ঃ বালক-৩,৬৩,২২২, বালিকা-৩,৪৮,২২৮। মোট—৭,১১,৪৫০। স্কুলের বাইরে থাকা এই সংখ্যা যথাক্রমে ৩৭,৭০০, ৩৪,১৪২, ৭১,৮৪২। এদের মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র, রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় ও ব্রীজ কোর্সের মাধ্যমে ৩৩,০০০ জনকে আনার ব্যবস্থা হয়েছে। সর্বশিক্ষা অভিযানের মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে তাতে তৈরি হয়েছে যেমন VEHC, WEHC, তেমনি শিক্ষা বিভাগে কাঠামো পরিবর্তন করে হয়েছে CRC, CLRC. সরকারী স্তরে কাজের ধরন ও দায়িত্বের মাত্রাও বদলেছে। তথ্যগতভাবে সাহায্যকারী ব্যবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। DISE- এর মাধ্যমে বাড়তি গৃহনির্মাণে অর্থ, পানীয় জল, শৌচাগার নির্মাণে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। বিদ্যালয় রক্ষণাবেক্ষণে এবং Teaching Learning Material (TLM) বাবদ অর্থ দেওয়া হয়েছে। Implementation of National Programme for Education of Girls at Elementary Level (NPEGEL)-এর কর্মসূচির মধ্যদিয়ে বালিকাদের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দুর করার চেষ্টা চলছে। মাধ্যমিকস্তরে শিক্ষক ঘাটতি পূরণের জন্যে পার্শ্বশিক্ষককে যুক্ত করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। মাধ্যমিকস্তরে এইসব পরিকল্পনার পরিচিতি ঘটানো এবং বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি ও শিক্ষকদের এই কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার লক্ষ্যে প্রধান শিক্ষক ও পরিচালক সমিতির সভ্যদের যথাক্রমে ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর এবং ২০০৪ সালের জানুয়ারীতে অভিমুখীকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরিচালনায়। সহ-শিক্ষকদের এই বিষয়ে KRP (Key Resource Persons) ট্রেনিং হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে সব শিক্ষকদের নিয়ে হবে।

২০০৩ সালের জুলাই মাসে প্রধান শিক্ষকদের, KRP-দের যে অভিমুখীকরণ কর্মসূচি হয়, সেখানে সাতটি বিষয়ে Module প্রস্তুত করে আলোচনার জন্য কর্মশালায় রাখা

হয়। বিদ্যালয়গুচ্ছ নিয়ে ৮ম Moduleটি তৈরীর দায়িত্ব পড়ে কর্মশালার ওপর এবং এবিষয়ে অগ্রণী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন আসানসোল মহকুমার দু'জন প্রধান শিক্ষক। আসানসোলে চালু বিদ্যালয়গুচ্ছের (সংক্ষিপ্ত পরিভাষায় COB বা Co-ordinating Body) সামগ্রিক ধারণা এই Module-এ অনেকটাই অন্তর্ভুক্ত হয়। আসানসোলের হীরাপুর অঞ্চলের বিদ্যালয়গুচ্ছের কাজ শুরু হয় ১৯৯৭ সালে। ২৩শে জুলাই, ১৯৯৯ এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। ১ম সভার গৃহীত প্রস্তাবসমূহের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হল।

মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলির পরিচালন সমিতিসমূহের সমন্বয় সংস্থা

বার্ণপুর, বর্ধমান

(বর্ধমান জেলার হীরাপুর অঞ্চলে স্কুলগুচ্ছ তৈরী করার লক্ষ্যে আলোচনা সভা)

স্থান : সুভাষপল্লী বিদ্যানিকেতন, বার্ণপুর

তারিখ : ২৩শে জুলাই, ১৯৯৯

উপস্থিত : হীরাপুর অঞ্চলের ১৮টি বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সম্পাদক ; প্রধান শিক্ষক, শিক্ষিকা, স্টাফ কাউন্সিল প্রতিনিধি ; নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি,পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি ও মাধ্যমিক শিক্ষাকর্মী সমিতির জেলা মহকুমার প্রতিনিধিবৃন্দএবং ডঃ প্রদ্যোৎ হালদার, মাননীয় সচিব,পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

পঠন-পাঠন (Academic)

১) বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার দিনই পুস্তকতালিকা (Book List) শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দিতে হবে।
২) শিক্ষাবর্ষ (Session) শুরুর প্রথম দিনই Class routine দিতে হবে।
৩) শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই শিক্ষার্থীর হাতে ছাপানো পাঠ্যসূচি Syllabus দিতে হবে।
৪) Class teaching প্রতিদিন Lesson note-এ নথিভুক্ত করতে হবে।
৫) Teaching progress-এর Weekly report প্রতি ক্লাস থেকে নিতে হবে।
৬) প্রতিমাসে অন্তত একটি করে Periodic test-এর ব্যবস্থা করতে হবে।
৭) সারা বছরের মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর পাশ-ফেল নির্ধারণ করতে হবে।
৮) বার্ষিক পরীক্ষা ছাড়া সব পরীক্ষার খাতা অভিভাবকদের দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
৯) পিছিয়ে-পড়া ছাত্রদের জন্যে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা রাখতে হবে।
১০) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক পরীক্ষার খাতা code করতে হবে।
১১) ষান্মাষিক ও বাৎসরিক উভয় পরীক্ষাকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
১২) বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা উপকরণের (Teaching aids) উপযুক্ত ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে।
১৩) ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
১৪) বিজ্ঞান ক্লাব গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
১৫) বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ের উপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের নিয়ে সেমিনার করতে হবে।
১৬) শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষাবিষয়ক কর্মশালা সংগঠিত করতে হবে।
১৭) খেলাধূলা ও শারীরিক শিক্ষার উপর সাব কমিটি গঠন করতে হবে, যাঁরা বিদ্যালয়ের খেলা ছাড়াও অঞ্চল, মহকুমা বা জেলাস্তরে খেলাধূলা পরিচালনায় সাহায্য করবেন।
১৮) অঞ্চলে Student's Health Home গঠন করার উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রশাসনিক (Administration)

১) বিদ্যালয়ে পাঠদান শুরুর ১৫ মিনিট আগে প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।
২) প্রার্থনা সভায় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সকলকে উপস্থিত থাকতে হবে।
৩) স্টাফ কাউন্সিল, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও ফাইনান্স কমিটিগুলি সঠিক অর্থে কার্যকর করতে হবে।
৪) উপরোক্ত সাব-কমিটিগুলির সভা করার সময় যথাসম্ভব পাঠদান অব্যাহত রাখতে হবে।

৫) অভিন্ন ছুটির তালিকা তৈরি করতে হবে।
৬) যে কোন কারণে অর্ধদিবস ছুটি বন্ধ করতে হবে।
৭) মাসের শেষে অর্ধদিবস ছুটি দেওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে।
৮) বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শনের লক্ষ্যে COB-এর পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে।
৯) শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সার্ভিস বুক তৈরির ও নিয়মিত করার কাজে একটি সেল তৈরি করতে হবে।
১০) বিদ্যালয়গুলিতে ফাইল রক্ষণাবেক্ষণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।
১১) বাৎসরিক অন্যান্য ফি আদায়ের জন্য বছরে তিনটি সময় নির্দিষ্ট থাকবে।
১২) শিক্ষার্থীদের ক্লাস থেকে ১ টাকা আদায় COB-এর ফাণ্ড তৈরি করতে হবে।
১৩) বিদ্যালয়গুলির অবস্থা ও বিভিন্ন বিষয় অবহিত করার জন্য COB-এর একটি মুখপত্র প্রকাশ করতে হবে।
১৪) বছরে অন্তত দুবার অভিভাবকদের চিঠি দিয়ে সভা ডাকতে হবে।

শৃঙ্খলা (Discipline)

১) মনিটরিং পদ্ধতি চালু করতে হবে। নিম্নোক্ত বিষয় গুলি এর আওতায় থাকবে ঃ
   ক) বিদ্যালয় শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা।
   খ) শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
   গ) বিভিন্ন তথ্য লিপিবদ্ধ করা ও যথাযথ রাখা।
২) উপরোক্ত ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে যা প্রয়োজন ঃ
   ক) নির্বাচিত মনিটরদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন।
   খ) মনিটরদের প্রশাসনিক ক্ষমতার অংশীভূত করা।
৩) স্কুল পালানো বন্ধ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
৪) বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনার সময় ছাত্রদের উপস্থিতির হার যুক্ত করা দরকার।
৫) মাসে একবার কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরদের নিয়ে সভা করা।
৬) পাঠদান শুরুর নির্ধারিত সময়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের উপস্থিতির জন্যে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা।

২০০২ সালে COB-এর একটি গঠনতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে স্থায়ী কমিটি তৈরি হয়। সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও অফিস সম্পাদকের পদ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের সম্পাদক, বিদ্যালয় প্রধান ও একজন স্টাফ কাউন্সিলের প্রতিনিধি নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছে। এলাকার শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মনোনীত করা হয়েছে। প্রতি দু'মাসে একটি সভা হয়। নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছে। পরিদর্শনের বিষয়গুলি হল ঃ ১) শিক্ষকদের আসা-যাওয়া, ২) বুক লিস্ট, ক্লাস রুটিন, সিলেবাস ঠিক সময়ে দেওয়া, ৩) পড়াশুনার অগ্রগতি, ৪) পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন, ৫) অভিভাবক সভার অনুষ্ঠান, ৬) ম্যাগাজিন, লাইব্রেরী ও খেলাধূলার অনুষ্ঠান।

খেলাধূলা চর্চার জন্যে যে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে তা দেওয়া হলো ঃ

মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলিতে খেলাধূলা সম্পর্কিত প্রস্তাব

আসানসোল মহকুমার ১৪০টি বিদ্যালয়ের ১ লক্ষ ২০ হাজার ছাত্রছাত্রীর শরীরচর্চা ও খেলাধূলার দায়িত্বে আছেন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, দায়িত্বপ্রাপ্ত শারীরশিক্ষক ও শিক্ষকমণ্ডলী। আন্তঃবিদ্যালয় ক্রীড়া ও খেলাধূলা পরিচালনার দায়িত্বে আছেন আসানসোল মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থা।

বিদ্যালয়গুলি তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে নিম্নোক্তভাবে ঃ

১) ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে ৫০ নম্বরের শারীরশিক্ষা বিষয় বাধ্যতামূলক থাকায় এই দুটি ক্লাসের রুটিনে শারীরশিক্ষা বিষয়টি স্থান পায় এবং পরীক্ষা হয়।
২) ৫ম ও ৯ম, ১০ম শ্রেণিতে বেশীরভাগ বিদ্যালয়ে শরীরচর্চার কোন ক্লাস রুটিনে থাকে না। ফলে এই ক্লাসগুলিতে শরীরচর্চার সামান্যতম অনুশীলন হয় না।
৩) Games fund-এ সংগৃহীত অর্থের একটা বড় অংশ প্রায় ৩০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ ব্যয় হয় বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়। এই প্রতিযোগিতায় ২৫ শতাংশের বেশী ছাত্রছাত্রী অংশ নেয় না।
৪) Atheletics ও অন্যান্য games-এ ছাত্রছাত্রীদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে হয় না। এটা ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব ও পরিবারের ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর নির্ভর করে। যে সমস্ত বিদ্যালয়ের নিজস্ব মাঠ আছে সেখানেও

একই অবস্থা।

৫) Staff Council ও Academic Council-এর সভায় এই বিষয়টির উপর আলোচনা প্রায় হয় না।

৬) বিষয় হিসাবে শারীরশিক্ষা যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদা কোনদিনই পায়নি।

৭) বিষয়টির প্রতি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, বিদ্যালয় প্রধান, সহ-শিক্ষক এমনকি বিষয়-শিক্ষকের ক্ষেত্রেও কিছুটা হলেও অবহেলা বর্তমান।

৮) বিদ্যালয়ে Games & Sports কমিটি গঠিত হয় না, হলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কাজ করে না। আসানসোল মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থাটি কাজ করে এইভাবে ঃ

ক) Affiliation Fee জমা নেওয়ার মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলিকে সদস্যভুক্ত করা হয়।

খ) বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও ১১টি Discipline -এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

গ) প্রতিযোগী ও খেলোয়াড় বাছাই করে জেলা ও রাজ্যস্তরে পাঠানো হয়।

ঘ) ৭টি আঞ্চলিক সংস্থার মাধ্যমে এই কাজ পরিচালিত হয়।

ঙ) অঞ্চলগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন Discipline-এ খেলা শুরু করে গুটিয়ে আনা বা শেষ করতে পারে না ফলে Selection Match করে খেলোয়াড় বাছাই করা হয়।

চ) অঞ্চলস্তরে কর্মকর্তারা কাজ করলেও মহকুমাস্তরে কাজের লোক কম।

ছ) ফাণ্ড না থাকায় জেলা ও রাজ্যস্তরে প্রতিযোগী পাঠানোর খরচ বিদ্যালয়গুলিকে বা প্রতিযোগীদের বহন করতে হয়। এটা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব না হবার ফলে খেলা বিপর্যস্ত হয়।

জ) রবিবার বা ছুটির দিন খেলা পরিচালনায় অসুবিধা দেখা দেয়।

ঝ) ছাত্রীদের খেলাধূলা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিষয়-শিক্ষিকা দের যথাযোগ্য ভূমিকা পালনে অনীহা দেখা যায়।

ক্রীড়া ও খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় সংগঠন ও মহকুমার ক্রীড়া সংস্থাটির দুর্বলতার কারণে যে বিদ্যালয়গুলি আন্তঃবিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় যোগদান করে তারাও নিরুৎসাহ হয় এবং পশ্চাদ্‌পদ চিন্তার অনুসারী হয়ে বেশ কিছু বিদ্যালয় যোগদানই করে না। খেলা যেটুকু সংগঠিত করা যায় তাতে লক্ষ্যণীয়ভাবে দেখা গেছে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের উৎসাহ।

বিদ্যালয় পরিবেশ ও স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে ক্রীড়া ও খেলাধূলার গুরুত্ব বিবেচনা করে বর্তমান বিদ্যালয় পরিকাঠামোর মধ্যে যা করতে হবে সেগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

১) ৫ম শ্রেণিতে ন্যূনতম শরীরচর্চার লক্ষ্যে পাঠ পরিকল্পনা করতে হবে।

২) Class promotion-এর ক্ষেত্রে শরীরচর্চার যোগ্যতাকে স্থান দিতে হবে।

৩) মহকুমার অন্তর্গত সব বিদ্যালয়কে বাধ্যতামূলকভাবে মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থার সদস্যভুক্ত করতে হবে।

৪) বছরে নিম্নমাধ্যমিক স্কুলের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা, মাধ্যমিক স্কুলের ক্ষেত্রে ২০০ টাকা ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা করতে হবে।

৫) বছরে ছাত্রছাত্রী পিছু কুপন মারফত ১ টাকা হারে সংগ্রহ করতে হবে।

৬) মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থাটির পরিকাঠামোর উন্নতি করতে হবে। প্রত্যেক বিভাগের দায়িত্বে থাকা পৃথক সাব কমিটিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

প্রস্তাবগুলির রূপায়ণের লক্ষ্যে যা করতে হবে ঃ

ক) মহকুমার সব বিদ্যালয়গুলির প্রধান, শারীর শিক্ষক, দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং সব শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা করতে হবে।

খ) মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার ও উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য প্রশাসন ও শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে হবে।

গ) শনিবার ও রবিবার বিশেষ বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্যে শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

ঘ) ডিসেম্বর Zonal Sports Meet অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে সব বিদ্যালয়ের যোগদান বাধ্যতামূলক।

বছরে ২/৩টি গান-বাজনার অনুষ্ঠানের মধ্যেদিয়ে প্রকৃত সংস্কৃতিচর্চা হয় না। বিদ্যালয়ের রুটিন কাজকে ব্যাহত না করে সারা বছর ধরে প্রাত্যহিক চর্চার মধ্যে আনতে হবে সংস্কৃতিচর্চা। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে গঠিত হবে একটি করে সংস্কৃতিমণ্ডল। বিদ্যালয় বসার আগে, টিফিনে, দুটি পিরিয়ডের ফাঁকে, ছুটির পরে এই কাজ হবে। সাংস্কৃতিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে যে দিবসগুলি পালিত হবে তার তালিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হল ঃ

Co-ordinating Body of Secondary Schools

Burnpur, Burdwan

List of days to be observed by schools through various programme as part of cultural activities

1.) 08.01.1642 : Galileo Galili was punished for his views that Earth moves round the sun.
2) 12.01.1863 : Vivekananda was born.
3) 17.01.1706 : Benjamin Franklin discoverer of Electricity was born.
4) 23.01.1897 : Subhas Chandra was born.
5) 24.01.1950 : Jana Gana Mana accepted as National Anthem.
6) 25.01.1824 : Michael Madhusudan Datta was born.
7) 29.01.1866 : Romain Rolland was born.
8) 30.01.1948 : Mahatma Gandhi was assasinated.
9) 31.01.1967 : Peacock accepted as a National Bird.
10) 12.02.1809 : American president Abraham Lincon was born.
11) 15.02.1564 : Galileo Galili was born.
12) 17.02.1775 : David Hare was born.
13) 17/02.1600 : Gionardo Bruno was burnt to death.
14) 19.02.1473 : Pioneer in modern astronomy Nicolas Copernicus was born.
15) 21.02.1952 : Struggle launched for Bengali as official language in East Pakistan.
16) 22.02.1840 : Poet Md. Iqbal was born.
17) 22.02.1885 : Jatindra Mohan Sengupta was born.
18) 24.02.1873 : Horse driven trum was introduced in Calcutta.
19) 25.02.2001 : Sir Donal Bradman, King of Cricket expired.
20) 28.02.1943 : New Howrah Bridge inaugurated.
21) 01.03.1943 : TISCO 1st Steel Industry established.
22) 01.03.1939 : Prescription against Pather Dabi withdrawn.
23) 03.03.1847 : Alexander Graham Bell discoverer of Telephone was born.
24) 04.03.1879 : Bethun College the 1st college of women in the British Empire outside Britain, established in Calcutta.
25) 06.03.1915 : 1st meet between Gandhi & Rabindranath.
26) 08.03.1917 : Russian Revolution begins.
27) 12.03.1920 : Dandi March.
28) 13.03.1930 : Discovery of Pluto.
29) 14.03.1879 : Albert Einstein was born.
30) 23.03.1931 : Bhagat Singh, Sukhdeo, Rajguru hanged.

31) 28.03.1642 : Sr. Isaac Newton was born.
32) 29.03.1857 : Barrackpore heralded the Great Indian Mutiny.
33) 01.04.1857 : Barna Parichaya of Iswar Chandra Vidyasagar, published.
34) 09.04.1898 : Rahul Sankrityane was born.
35) 09.04.1898 : Paul Robeson was born.
36) 12.04.1961 : Yuri Gagarin, the 1st man went into Space Orbit.
37) 13.04.1919 : Jallianwala Bag massacre.
38) 14.04.1891 : B.R. Ambedkar was born.
39) 16.04.1853 : Opening of Railways & Telegraph. Train between Victoria Terminus to Thana.
40) 16.04.1889 : Charlie Chaplin was born.
41) 18.04.1809 : Henry Vivian Louis Derozio was born.
42) 19.04.1975 : 1st Artificial Satellite launched in India.
43) 21.04.1526 : 1st battle of Panipath between Ibrahim Lodi and Babar started.
44) 22.04.1870 : Vladimir Ilich Lenin was born.
45) 23.04.1564 : Shakespeare was born.
46) 30.04.1975 : Liberation of Vietnam.
47) 01.05.1908 : Prafulla Chaki died as Martyr.
48) 02.05.1921 : Satyajit Roy was born.
49) 04.05.1799 : Tipu Sultan died in the battle of Mysore.
50) 05.05.1789 : French Revolution.
51) 05.05.1818 : Karl Marx was born.
52) 10.05.1774 : Ram Mohan Roy was born.
53) 12.05.1820 : Florence Nightingale was born.
54) 12.05.1863 : Child literateur Upendra Kishore Roychawdhury was born.
55) 13.05.1857 : Roland Ross discoverer of Malaria germ, was born.
56) 13.05.1847 : Sukanta Bhattacherjee, Poet died.
57) 18.05.1749 : Edward Jenner discoverer if Small Pox Vaccination, was born.
58) 23.05.1984 : Bachendri Pal, 1st Indian woman to reach Everest.
59) 29.05.1953 : Hillari, Tenjing conquered Everest.
60) 30.05.1919 : Rabindra Nath Tagore threw over Knighthood protesting Jallianwala Bag massacre.
61) 16.06.1963 : 1st woman Valentina Tereshkova went into space.
62) 17.06.1858 : Lakshmi Bai, Rani of Jhansi killed in battle.
63) 22.06.1941 : Hitler invaded USSR.
64) 27.06.1880 : Hellen Keller deaf and dumb sage was born.
65) 20.07.1967 : American astronaut Niel Amstrong stepped into moon's surface along with Edwin Aldrin, Michale Collins.
66) 31.07.1880 : Munshi Premchand was born.

67)	01.08.1920	:	Gandhi started Non-Cooperation Movement.
68)	04.08.1914	:	Beginning of 1st World War.
69)	06.08.1945	:	America dropped bomb on Hirosima.
70)	09.08.1942	:	Quit India started.
71)	09.08.1945	:	Atom Bomb dropped on Nagasaki.
72)	11.08.1908	:	Khudiram Bose hanged.
73)	15.08.1947	:	Indian independence.
74)	27.08.1770	:	Hegel, Philosopher was born.
75)	27.08.1910	:	Mother Teresa was born in Yugoslavia.
76)	01.09.1939	:	International Solidarity Day for peace and against war.
77)	05.09.1888	:	Sarvapalli Radhakrishnan was born.
78)	06.09.1876	:	John James Meleod inventor of Insulin, was born.
79)	09.09.1915	:	Bagha Jatin (Jatindranath Mukhopadhyay) with his associates engaged in conflict with the British at the bank of Budibalan in Orissa.
80)	11.09.1893	:	World Religion Congress at Chicago inaugurated.
81)	13.09.1929	:	Revolutionary Jatindranath Das died after 63 days of hunger strike.
82)	14.09.1894	:	Novelist Bibhutibhusan Bandyopadhyay was born.
83)	17.09.1876	:	Novelist Sarat Chandra Chattopadhyay was born.
84)	19.09.1893	:	Swami Vivekananda delivered his historic speech at Chicago, World Religion Congress.
85)	26.09.1820	:	Iswar Chandra Vidyasagar was born.
86)	29.09.1942	:	Matangini Hazra died as Martyr.
87)	06.10.1893	:	Scientist Meghnad Saha was born.
88)	16.10.1968	:	Hargobind Khurana awarded Nobel Prize on Medicine.
89)	20.10.1871	:	Poet Atul Prasad Sen was born.
90)	21.10.1843	:	Netaji formed Azad Hind Govt.
91)	24.10.1945	:	UNO inaugurated.
92)	25.10.1881	:	Pablo Picasso was born.
93)	27.10.1904	:	Jatindranath Das, who died in jail following 63 days hunger strike, was born.
94)	28.10.1867	:	Sister Nivedita was born in Ireland.
95)	30.10.1909	:	Homi Jahangir Bhaba, Atomic Scientist, was born.
96)	05.11.1870	:	Deshbandhu Chittaranjan Das was born.
97)	05.11.1887	:	Freedom fighter Bipin Behari Ganguli was born.
98)	06.11.1830	:	Revolt of Titu Mir against British.
99)	06.11.1917	:	Bolshevik Party under the leadership of Lenin started Mass Armed Struggle.

100) 07.11.1858 ; Bipin Chandra Pal was born.
101) 07.11.1888 : C V Raman was born.
102) 08.11.1656 : Edmund Hallery, Astronomer, was born.
103) 09.11.1877 : Poet Mohammad Iqbal was born.
104) 10.11.1483 : Martin Luther was born.
105) 10.11.1848 : Surendranath Bandyopadhyay was born.
106) 10.11.1908 : Kanailal Datta hanged.
107) 14.04.1889 : Jawaharlal Nehru was born.
108) 15.11.1542 : Emperor Akbar was born.
109) 15.11.1913 : Rabindranath Tagore got Nobel Prize.
110) 16.11.1835 : Lakshmi Bai, Queen of Jhansi was born.
111) 17.04.1915 : Freedom fighter Bishnugopal Pingle hanged in Telegaon jail.
112) 07.04.1928 : Lala Lajpat Rai died.
113) 19.11.1838 : Kashab Chandra Sen was born.
114) 20.11.1751 : Tipu Sultan was born.
115) 20.11.1939 : Ganapati Chakraborty, father of modern magic in Bengal, died.
116) 21.11.1908 : Revolutionary Satyendranath Basu hanged in Alipur jail.
117) 24.11.1859 : Darwin's first publication relating to Mankind released.
118) 30.11.1857 : Jagadish Chandra Bose was born.
119) 03.12.1984 : 2500 people died of Gas leak in Bhopal
120) 03.12.1941 : Japan attacked Pearl Harbour.
121) 03.12.1882 : Artist Nanda Lal Bose was born.
122) 04.12.1829 : Viceroy Lord Bentinck stopped 'Sati' immolation.
123) 04.12.1888 : Historian Dr. Ramesh Ch. Majumdar was born.
124) 08.12.1930 : Binoy Basu, Badal Gupta, Dinesh Gupta made armed attack in Writers' Building.
125) 14.12.1911 : R Amund Sen first to set foot in South Pole.
126) 14.12.1931 : Magistrate Stevenson was murdered in his home Comilla Town by Shanti Ghosh and Suniti Chaudhury, students of Class VIII.
127) 15.12.1970 : Soviet Space Craft Vanura - 7 touched down on the surface of the planet venus.
128) 17.12.1903 : Scientist Arvil Wright and Wilbar were the first to fly in Aeroplane.
129) 28.12.1885 : Inauguration of Indian National Congress.
130) 29.12.1870 : W C Banerjee was born.

মূল্যায়নের পদ্ধতি ঃ ষান্মাসিক (Half Yearly) ও বাৎসরিক (Annual) পরীক্ষা ছাড়াও Class test ও Unit test প্রতি মাসে নেওয়া এবং এই সব পরীক্ষাগুলির সম্মিলিত ফলাফলের ওপর Class Promotion হয়। Class test ১০ নম্বরের পরীক্ষা ২ দিন ধরে নেওয়া হয় ৪টি পিরিয়ডের পর। Unit test হয় ১৫ নম্বরের ২ দিন ধরে। দু ধরনের পরীক্ষাই Seat arrangement করে হয়। ফলাফল ৭ দিনের মধ্যে দেওয়া হয়।

মৌখিক পরীক্ষা ঃ অভিভাবকদের উপস্থিতিতে পরীক্ষা নেওয়া হয়। একটি সারিতে শিক্ষকেরা বসেন। শিক্ষকদের মুখোমুখি বসে ছাত্ররা, ছাত্রদের পেছনে থাকেন অভিভাবকেরা। অভিভাবকেরা শিক্ষকদের প্রশ্ন শোনেন, ছাত্রের উত্তর শোনেন এবং প্রাপ্ত নম্বর দেখেন। ছাত্ররা কতখানি তৈরি হতে পেরেছে তা শিক্ষক ও অভিভাবকদের সামনে যাঁচাই হয়। এছাড়া পরীক্ষাব্যবস্থায় স্বচ্ছতা অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। Class test, Unit test/ Oral test-এর ১,২,৩ নম্বর মানের প্রশ্নাবলী যা সংখ্যায় ১৫০ থেকে ২৫০ V থেকে IX পর্যন্ত বই-এর আকারে ছাত্রদের দেওয়া হয়। এই প্রশ্নগুলি ক্লাশে চর্চা হয়। এবং এই বই থেকেই C.T,U.T ও O.T তে প্রশ্ন দেওয়া হয়।

নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের দিকে লক্ষ্য রেখে এবছর Saturday test চালু হয়েছে। এটি Weekly test। এরও সিলেবাস ছাত্রদের দেওয়া হয় এবং Seat arrangement করে পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই পরীক্ষা হয় ৩০ মিনিটের। এই পরীক্ষার আগে ছাত্রদের Interactive session হয়। বিগত ৫ দিনে যা পাঠদান হয়েছে (Teaching) তাতে শেখার কাজ (Learning) প্রায়শই হয় না। এই শেখা বা Learning হয় IAS পদ্ধতিতে, যা চলে ১ ঘন্টা ধরে। ছাত্রদের ৬/৭টি গ্রুপ-এ ভাগ করা হয়। একটি গ্রুপ ব্ল্যাকবোর্ড পেছনে রেখে বাকী ছাত্রদের মুখোমুখি দাঁড়াবে। বাকী ছাত্ররা চারটি বিষয়ের (Subject) পঠিত অংশের ওপর প্রশ্ন করবে, দাঁড়িয়ে থাকা গ্রুপ উত্তর দেবে। এটা চলবে ১০ মিনিট ধরে। ইংরাজী বিষয়ের ক্ষেত্রে অন্য ভাষা ব্যবহার করা যায় না। এইভাবে পরপর চলবে। শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন কোন্ ছাত্রটি প্রশ্ন বা উত্তর কিছুতেই অংশ নিচ্ছে না। Class-V ছাড়া Weekly test-এর উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ করে শ্রেণির উন্নতমানের ১৫টি ছাত্র। Class-V-এর উত্তরপত্র শিক্ষকেরাই মূল্যায়ন করেন।

নান্দনিক (Easthetics) ঃ এই বিষয়টি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদিত বিষয়ের বাইরে অবশ্যপাঠ্য হিসেবে VI থেকে VIII পর্যন্ত চালু হয়েছে। এই বিষয়টিতে স্থান পেয়েছে আবৃত্তি, গান, বাজনা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, গল্প পাঠ, সংবাদ পাঠ, একক বা যৌথ অভিনয়, মাটি, শোলা, কাগজ, থার্মোকল, বাঁশ, বেত ইত্যাদির কাজ। ১০০ নম্বরের এই পরীক্ষাটি, ছাত্র তৈরি থাকলে, শিক্ষাবর্ষের যে কোন সময়েই নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষার উপাদান ছাত্ররা বিদ্যালয়ের বাইরে থেকেই বেশিরভাগ সংগ্রহ করবে। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে কিছু শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

বিদ্যালয়ের Monitoring-এ ছাত্রদের সাহায্য নেওয়া পুরনো প্রথা। বর্তমান বিদ্যালয় পরিকাঠামো, শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত, কাজের বিস্তৃতি ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে ছাত্রদের Monitoring-এ ক্লাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বিদ্যালয় প্রশাসন (Administration)-এর সঙ্গে ছাত্রদের যুক্ত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে Monitor-in-Council চালু হয়েছে। এদের কাজ—১) বিদ্যালয়ের ক্লাসের অভ্যন্তরে ও ক্লাসের বাইরে শৃঙ্খলা রক্ষা, ২) ছাত্রদের আচার, আচরণ, কুঅভ্যাসের প্রতি নজর রাখা, ৩) ছাত্রদের বিদ্যালয়ে আসা, যাওয়া মাঝপথে পালানো নজর রাখা, ৪) প্রার্থনা সভা (Prayer Line)'র শৃঙ্খলা রক্ষা, ৫) ক্লাস রুম পরিষ্কার রাখা, ৬) ক্লাস রুমকে সুন্দর করে সাজানো, ৭) প্রতিদিনকার Class lesson—কে ক্লাস নিয়েছেন, কি পড়া হয়েছে record করা। MIC-র সদস্যসংখ্যা ৮/১০ জন। এরা নিয়মিত বিভিন্ন ক্লাস থেকে উপরিউক্ত সব বিষয়ে report নেবে এবং তা লিপিবদ্ধ করবে। MIC, Staff Council-এর সঙ্গে নিয়মিত (মাসে একবার) বসবে এবং report রাখবে। স্বাস্থ্য —বিদ্যালয়গুচ্ছের অন্যতম বড় কৃতিত্ব Student's Health Home-এর বার্ণপুর কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। এর মাধ্যমে ১২ হাজার ছাত্রছাত্রী উপকৃত হচ্ছে। প্রতি ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও Health Card দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে বিদ্যালয়গুচ্ছের পরিকাঠামো আরও মজবুত করে। ছাত্রদের পারিবারিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে যুক্ত শৌচাগারের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও কার্যকরী পদক্ষেপের ওপর পরিকল্পনা রয়েছে।

বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো নির্মাণ, উন্নতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের যুক্ত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। শিল্পাঞ্চলে ছাত্রভর্তির সময় অনিয়মিত Donation আদায় একটি ব্যাধি। বিদ্যালয়গুচ্ছের মাধ্যমে এটি একেবারে বন্ধ

করা গেছে। পরিচালন সমিতির সিদ্ধান্ত মোতাবেক অভিভাবকদের সভার মাধ্যমে বিদ্যালয় রসিদে নির্দিষ্ট অঙ্কের Donation নেওয়া যেতে পারে। সাপ্তাহিক বা পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে পিছিয়ে-পড়া ছাত্রদের চিহ্নিত করতে হবে। Class V থেকে Class VIII no detaintion-এর লক্ষ্যে দুর্বল বা পিছিয়ে-পড়া ছাত্রদের বিশেষ Coaching-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রত্যেক শ্রেণির (Class) প্রতিটি বিভাগের (Section) অভিভাবকদের নিয়ে আলাদা আলাদা সভা করতে হবে। সর্বশিক্ষা অভিযান সফল করতে হলে বর্গার আন্দোলন, জমির আন্দোলনের মত শিক্ষার আন্দোলন করতে হবে। বিদ্যালয়গুচ্ছ শিক্ষা আন্দোলনের ভিত্তি এবং শিক্ষক আন্দোলনের পরিপূরক।

উপরে বর্ণিত বিদ্যালয়গুচ্ছের বিস্তীর্ণ ও ব্যাপক কার্যক্রমগুলি সদস্য বিদ্যালয়গুলির কোন কোন ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ, কোন ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ, কোন ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ কার্যকর করা গেছে।

মানসিক রোগ প্রশমনে প্রতিভার খরা দেখা দেবে কি?

মনোজিৎ মণ্ডল

মানসিক রোগ কি প্রতিভার প্রতিবন্ধক, নাকি মানসিক রোগ আর প্রতিভা আপাত অবিশ্বাস্য হলেও নৈকট্যে আবদ্ধ। সাইকোলজি বা মনোবিদ্যার আধুনিক গবেষণা বলছে অনেক ক্ষেত্রেই মানসিক রোগ প্রতিভার বিচ্ছুরণে উদ্দীপকের ভূমিকা পালন করে। ব্যাপারটা যেন সোনার পাথর বাটি! বেশ জটিল। তাই না?

এই জটিল (মূল) বিষয়ে প্রবেশ করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে সুদূর অতীতে। সৃজনশীল সঙ্গীতের মহান রূপকার রবার্ট শুম্যান ১৮৪০ সালে ২৪টা ওপাস রচনা করেন। ১৮৪৯-এ করেন ২৭টা। আর এই দু'বারই তিনি সারা বছর ধরে হাইপোম্যানিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন। শুম্যান সারা জীবনে সর্বমোট ১৪৭টা ওপাস রচনা করেন। উল্লেখ্য ১৮৫৬ সালে এক নির্জন পাগলাগারদে অনশনে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণের পূর্বে শুম্যান ১৮২৯ থেকে ১৮৫৪ সালের মধ্যে দু'বার আত্মহত্যারও চেষ্টা করেন।

প্রসঙ্গত ম্যানিয়াকে বলা যেতে পারে এক রঙিন ক্যালিডোস্কোপ, যার মধ্যে নানা রোগ ছড়ানো থাকলেও তা দিয়ে কোন স্থায়ী এবং নির্দিষ্ট নক্‌শা তৈরি করা যায় না। ম্যানিয়াগ্রস্ত রোগীদের থাকে নিজের সম্পর্কে উচ্চধারণা, মেজাজ থাকে উঁচু তারে বাঁধা। এদের ঘুম কমলেও বেড়ে যায় কর্মশীলতা, সৃজনশীলতা। এদের বাচনভঙ্গি ছন্দময়, আকর্ষক। এরা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে প্রবেশ করেন অনায়াসে। আরকম বা হাইপোম্যানিয়ার রোগীরা (যার শিকার ছিলেন শুম্যান) অসাধ্য সাধন করে ফেলে যা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন, এরা বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালায়, সামান্য কারণে ঝুঁকি নিয়ে প্রচুর টাকা খরচ করে ফেলে। তাঁরা প্রায়শই চোখ-কানে নানান হ্যালুসিনেশনের শিকার হন। অর্থাৎ মানসিক রোগ যে সৃজনশীলতার কোন প্রতিবন্ধক নয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রবার্ট শুম্যান। পৃথিবীর আর এক জিনিয়াস লর্ড টেনিসন। ইংরেজি সাহিত্যে যাঁর অবদান প্রশ্নাতীত। বিশ্বসাহিত্যে তিনি এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। টেনিসনের বাবা, কাকা, ভাই, ছেলে, নাতি — প্রত্যেকেই ছিলেন মানসিক রোগী। জিনবাহিত রোগের এ এক জ্বলন্ত উদাহরণ। প্রসঙ্গত টেনিসনের এক ভাই আর্থার পাগলাগারদে ছিলেন এক বছর, অন্য ভাই এডওয়ার্ড ষাট বছর। টেনিসন নিজেও ডিপ্রেসন ও হাইপোম্যানিয়ার রোগী ছিলেন। সর্বদা এক বিষণ্ণতার রাজ্যে বাস করতেন। তাঁর লেখাতেও এই হতাশা, নিরাসক্তি গোপন থাকে নি —

> Deep as first love, and wild with all regret;
> O Death in life, the days that are no more.
>
> (Tears, Idle Tears)

তাসত্ত্বেও মানসিক রোগ তাঁর প্রতিভাস্ফূরণে কোনও বাধা হতে পারে নি। অথচ ডিপ্রেসন এমন এক রোগ যা জীবনকে করে তোলে অবসাদময়, আশাহীন, নিরাসক্ত। দুর্বল হয়ে যায় মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি। এমনকি বেড়ে যায় আত্মহত্যার প্রবণতা। আসলে ডিপ্রেসনের রোগীর জগতকে দেখে ঘন ধূসর ঘষা কাঁচের মধ্যে দিয়ে। সবকিছুই এখানে অস্পষ্ট।

কি সাহিত্য, কি সংস্কৃতি, কিংবা বিজ্ঞান, পৃথিবীর ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় মানসিক রোগগ্রস্ত প্রতিভার ছড়াছড়ি। প্রতিভার মধ্যেই ছড়িয়ে আছে মানসিক রোগের বীজ। তালিকাটা খুব একটা ছোট নয়। লর্ড বায়রন, এডগার অ্যালেন পো, উইলিয়াম ব্লেক, জন বেরিম্যান, রবার্ট লাওয়েল, ব্যাণ্ডাল জারেল, হারমান হেস, সিলভিয়া প্লাথ, থিওডোর রোথেক, অ্যানে স্যাক্সটনন, মার্ক টোয়েন, চার্লস মিংগাস, টেনেসি উইলিয়াম, জর্জিয়া ওকিফ ভ্যান গগ, এজরা পাউণ্ড, আরনেস্ট হেমিংওয়ে, জে বি এস হ্যালডেন। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন মানসিক রোগী। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। না, মানসিক রোগ এঁদের প্রতিভার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে নি। পৃথিবী-বিখ্যাত এইসব প্রতিভা ব্যক্তিগত জীবন যে কি ভীষণরকম মনোবিজ্ঞানের শিকার ছিলেন তা ভাবলেই অবাক হতে হয়। টেনেসি উইলিয়াম সব সময়ই অ্যালকোহলে বুঁদ হয়ে থাকতেন। মার্ক টোয়েন ছিলেন বিখ্যাত বই চোর। ভ্যান গগ নিজেই নিজের কান কেটে ফেলেছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ না করে পারলাম না। শোনা যায়, বিজ্ঞানী হ্যালডেন একবার সস্ত্রীক জুতো কিনতে গিয়েছিলেন। পায়ের জুতো জোড়া পাশে রেখে তিনি একটার পর একটা জুতো পরে দেখছেন। পছন্দ আর হচ্ছে না।

অবশেষে পাশে রাখা নিজের জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, 'বা। এতো বেশ ফিট করেছে। দিন। এই জুতোগুলো।' দোকানদার অবাক। লজ্জায় স্ত্রীর চোখ-মুখ লাল।

ফিরে আসা যাক গবেষণাগারে। মানসিক রোগের সঙ্গে সৃজনশীলতার সম্পর্ক নির্ধারণে ১৯৮৭ সালে বিজ্ঞানী ম্যানসি অ্যাণ্ডারসন আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০জন লেখকের ওপর গবেষণা চালান। তাতে দেখা যায়, ৪৩ শতাংশ লেখক ডিপ্রেসনে, ৮০ শতাংশ লেখক ম্যানিয়ায় এবং ১২ শতাংশ সাইক্লোথিমিয়ার আক্রান্ত। ৮ শতাংশের আছে আত্মহত্যার প্রবণতা। প্রসঙ্গত কম মাত্রার ডিপ্রেসনকে সাইক্লোথিমিয়া বলে। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের ব্যবহার, ঘুমানোর সময়, চিন্তার গতি-প্রকৃতি, কার্যক্ষমতার ঘনঘন পরিবর্তন হয়। ওলট-পালট হয় জীবনের ছন্দ।

১৯৮৯ সালে বিজ্ঞানী রেডফিল্ড জেমিসন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজ লেখক-নাট্যকারদের নিয়ে গবেষণা করে দেখেন এঁদের ৩৮ শতাংশ মানসিক বিকারগ্রস্ত। ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই বিজ্ঞানী হ্যাগপ অ্যাকিস্কালে লেখক-শিল্পীদের মধ্যে গবেষণা চালিয়ে জানান যে এঁদের ৬৮ শতাংশ সাইক্লোথিমিয়ার এবং ৫১ শতাংশ ডিপ্রেসনের রোগী। এছাড়া ১৯৯৩ সালে আর্নল্ড লুডউইগ কেনটাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমেরিকার কবিদের মধ্যে গবেষণা করে দেখেন যে এঁদের মধ্যে ১৮ শতাংশের মধ্যেই আত্মহত্যার প্রবণতা বর্তমান। পাশাপাশি লণ্ডন হাসপাতালের স্টুয়ার্ট মন্টগোমরি, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রুথ রিচার্ডস প্রমুখ গবেষণালব্ধ ফলাফলের মাধ্যমে প্রমাণ করেন সাধারণ অপেক্ষা সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের মধ্যে মানসিক রোগের প্রবণতা বেশী।

এখন প্রশ্ন হল, লেখক-শিল্পী-বিজ্ঞানী-সঙ্গীতজ্ঞ মানেই কী তাহলে মনোবিকলনের শিকার? মানসিক রোগী না হলে কী কেউ প্রতিভার স্ফূরণ ঘটাতে সক্ষম হবে না? মানসিক রোগ থাকলেই কী প্রতিভার এভারেষ্টে পৌঁছে যাবে? না। তা নয়। প্রতিভা প্রতিভাই। এর কোন বিকল্প নেই। তবে হ্যাঁ, প্রতিভার সঙ্গে ম্যানিয়া, ডিপ্রেসনের মহামিলনে জন্মেছেন অনেক লেখক-শিল্পী-বিজ্ঞানী-সঙ্গীতজ্ঞ তা বলাই বাহুল্য।

এখন পৃথিবীর নানা প্রান্তে হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টের কাজ চলছে। ম্যানিয়া বা ডিপ্রেসনের জন্য দায়ী দোষী জিনটাকে সনাক্ত করে গ্রেফ্‌তার করার জন্য। বিজ্ঞানীদের মতে কাজটাও খুব কঠিন নয়। অর্থাৎ ডিপ্রেসনের অবসান হল বলে। সাথে সাথে কী প্রতিভারও খরা দেখা দেবে? কমে যাবে শিল্পী-সঙ্গীতজ্ঞ-লেখক-বিজ্ঞানীর সংখ্যা? আগামীদিনে বিজ্ঞানের মুখ চেয়ে বসে না থেকে উপায় কী?

ভ্রম সংশোধন

গত মার্চ, ২০০৪ সংখ্যায় ৪৬৯ পৃষ্ঠায় 'MD YASIN ALI, Asstt. Teacher' মুদ্রিত হয়েছে। পড়তে হবে, 'MD YASIN ALI, HEAD MASTER, JAGANNATHPUR JR. HIGH MADRASAH'. এই মুদ্রণপ্রমাদে আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

সম্পাদক
শিক্ষা ও সাহিত্য

বিভূতিভূষণের কাছে শোনা

(অকপট নিসর্গের গদ্যশিল্পী বিভূতিভূষণের জন্মদিন ২৯শে ভাদ্র, ১৩০১)

সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক
হালিশহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ, *উত্তর ২৪ পরগণা*

এখন শহর ছেড়ে একান্তই যেতে পারি পীরপৈঁতি
পাহাড়ের দিকে
সেখানে গনুর সঙ্গে আগুন পোহানো রাতে জেগে
থাকবে টাঁড়বারোর কথা
অজস্র চকচকে রোদ গায়ে মেখে মিছি নদী পাহাড়ের
ডাকে চলে গেলে
হরীতকী গাছের নীচে মোহনপুরায় সন্ধ্যা চুপ চুপ
নামবে অযথা।

লবটুলিয়ার মাঠে দুধলি ঘাসের ফুল এবার বসন্তে
ছিলো জেগে
ধনঝারির বন থেকে এক ঝাঁক হরিয়ালি ব্যস্ত ছিলো
জ্যোৎস্না পারাপারে
সরস্বতী কুণ্ডী জুড়ে রঙবেরঙের পাখি মেতে আছে
ঠুংরি-আলাপে
প্রাগৈতিহাসিক গুহা, অবশিষ্ট রাজবাড়ী লুকিয়েছে
বনের আঁধারে।

বুদ্ধু সিং, ভানুমতী, রাজু পাঁড়ে, দুঃখী কুন্তাকে দেখি
জঙ্গলের গায়ে উঁকি দিয়ে
এ কোন্ ভারতবর্ষ স্তব্ধ বনের মধ্যে প্রাণের ঐশ্বর্য দিয়ে
বোনা —
চকমকিটোলায় যাবো প্রকৃত মানুষ দেখতে তার জন্য
কত গল্প-পাঠ
ভুলবো কেনো! এসব চিত্রকথা কতবার প্রাণভরে
বিভূতিভূষণের কাছে শোনা।

বিপ্লব

নবকুমার সরকার, শিক্ষক
বেলুড় হাইস্কুল, হাওড়া

বিপ্লব দেখি আজ চারদিকে নিজেকেই বিস্তারে মত্ত!
বিপ্লব দেখি আজ ঘরে ঘরে নিদারুণ অতি উন্মত্ত!
বিপ্লবী সে যুগের সন্ন্যাসী, বিপ্লবী এযুগের রোমিও!
আমারও বিপ্লবে মত্ততা, বিপ্লবে মত্ত আপনিও!
আপনার বিপ্লব অফিসে, আপনার বিপ্লব শাসনে।
আমার বিপ্লব সংসারে, আমার বিপ্লব ময়দানে।
আপনার বিপ্লব সিংহাসনে, আপনার বিপ্লব করতালে!
আমার বিপ্লব রক্তঘামে, আমার বিপ্লব মিছিলে!

বিপ্লবে আমি রঙিন স্বপ্ন দেখি, হাঁস হ'য়ে
মেলেছি ডানা আকাশে!
এঁকে-বেঁকে আমি ভেসে যাই— বাতাসে আহা বাতাসে —
আমার রক্ত গরম হ'য়ে ওঠে, যখন শুনি
ক্ষুধার্ত শিশুর কান্না!
তখন তার গলা টিপে ধরি, বলি, এই অসভ্য!
চুপ্ যা না!
অসভ্য শিশু চুপ করে না, আরো বাড়িয়ে দেয়
চীৎকার!
বিপ্লবী হ'য়ে শেষে আমাকেই তেড়ে বলে, মার! মার!

নক্ষত্রও নাকি বিপ্লবী ছিল? সৃষ্টি করেছিল পৃথিবী?
আমরা তো পৃথিবীরই সন্তান! অস্তিত্বে
তাই বিপ্লবেরই ছবি!
কিন্তু, এই ছবি কতদিন চলবে? জীবনের সল্‌তে যে
পুড়ছে!
বিপ্লব আনে বুঝি চেতনা? তবে কেন পৃথিবীটা
জ্বলছে?
জ্বলতে জ্বলতে শেষে একদিন হারিয়েই যাবে
এই পৃথিবী!
হারিয়েই যাব সব আমরা! হারিয়েই যাবে সব বিপ্লবী!

তাই বিপ্লব হোক আজ শুদ্ধির আত্মসমীক্ষায় মাতানো!
সেই বিপ্লবে বিপ্লবে একদিন পেয়ে যাব সত্যের বাগানও

বাংলা ভাষা

অপূর্বকুমার চট্টোপাধ্যায়
কুরুম্বা এম এল হাইস্কুল, *বীরভূম*

বর্ণ পরিচয়ের সেইসব দিনগুলিতে
আমার মা'র উপস্থিতি ছিল আবশ্যিক।
তাঁর বলা সুরেই
ঘটতো আমার জাগৃতি,
চেতনা এবং আর সব।
তাঁর বর্ণ লেখার রীতিতেই
আমার বর্ণ পরিক্রমা।
আমার মায়ের স্নেহবিতারী ভঙ্গি
উপচে পড়েছিল
তাঁর দেওয়া শিক্ষায়
এবং
আমার আয়ত্তকারী শেখার
মুহূর্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

তাই —
আমি বাংলার প্রতিটি বর্ণে দেখি
আমার মায়ের স্নেহস্পর্শ,
প্রতিটি বর্ণ-আয়নায়
আমার মায়ের মুখ।

আমার অনুভূতিতে বাংলা তাই
পবিত্র আকাশগঙ্গা
এ ভাষা-ধরণীর বুকে।
বাংলা আমার প্রাণবায়ু,
গৌরব, সম্মান সব কিছু
প্রতিটি শোক ও সুখে।।

কচিপাতা

আলোক মণ্ডল
বাঁকুড়া গোয়েঙ্কা বিদ্যায়তন, *বাঁকুড়া*

উদ্ভাসিত রোদ পড়ে আছে ধূসর চত্বরে
সীমানা প্রাচীরের ওপারে গলা তুলে দেখে নেয়
বড় বড় বাড়ী
ক্লাসরুমে দিদিমণি পড়ান জীবনচক্র
মডেল, দেওয়াল চিত্র ঝোলানো কৃষ্ণচাতাল
সেই ফাঁকে দু'একটা প্রজাপতি উড়ে এসে বসে
মোরগঝুঁটি, আকাশমণির পাতায়
একটু পরেই অযুত পায়ের চাপে ছিন্নভিন্ন
হবে রোদ এবং ধূসর পৃথিবী।

আবার সবুজ শুশ্রূষা মেলে দেবে কোন গাছ
তার ধ্বস্ত শরীরে
আবহমান এইভাবে বেড়ে ওঠে বড় হয় কিছু কচিপাতা।

ভাষা-জননী

সুজাতা সান্যাল (চট্টোপাধ্যায়), প্রাক্তন শিক্ষিকা
বড়শুল সি ডি পি হাইস্কুল, *বর্ধমান*

বুকের ভেতরে যে মৌচাকে
গুনগুনিয়ে ওঠে বাংলা ভাষা
তার অবিরাম ক্ষরণে
ছল্‌কে ওঠে জীবন।
কারও অধিকার নেই
এই নির্মাণ ভাঙবার
কারও সাধ্য নেই
এ জীবনকে কেড়ে নেবার।
সূর্য ওঠা যেমন সত্যি
তেমনই অনিবার্য আমার
ভাষা-জননীর ঘর-সংসার।

মানব পূজারী তোমারে প্রণমি

নীলিমা মণ্ডল, সহ-শিক্ষিকা
রাজারহাট শিক্ষানিকেতন, *উত্তর ২৪ পরগণা*

আ-সমুদ্র হিমাচল —
লজ্জায় করেছে নত মাথা
ভূলুণ্ঠিত মানব সভ্যতা
বিপন্ন সময় মহাসংকটে
কবি, তুমি হও ত্রাতা!

তোমার অমরবাণী
অভয়-মন্ত্র আনি
জাগাক প্রাণে প্রেম-প্রীতি সম্প্রীতি,
এই ভারতের মানব ঐক্যে
রচি নব-জীবন গীতি।

পৃথিবীর বুকে কালাপাহাড়ের দল
ধ্বংসলীলায় মত্ত-মাতাল
ভেঙে করে সব চুরমার
এস কবি! সবে মিলে করি প্রতিকার।
জানুক বিশ্ব — এ ভারত
বৈচিত্র্যে-ঐক্যে আজও সুমহান
তোমারি কণ্ঠে মানবতা গান।

তোমারি শিক্ষা রাখী-বন্ধন উৎসব
সর্ব ধর্ম-সমন্বয়,
বলেছিলে তুমি —
নিশ্চয় জীবনের হবে জয়!

তুমি কবি মানব পূজারী,
তাই বারে বারে —
তোমারে প্রণমি।

আগুনে, কাঁটায় ত্রাসে এই বুঝি ভালো আছি

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক
জুজুড় হাইস্কুল, *বাঁকুড়া*

কবন্ধ সময়ের কাঁধে ভর
চলেছি আমরা, চির তৃষাতুর
অনিশ্চিত পথ ও গন্তব্য

চোখ বন্ধ ডুব দিই
স্বপ্ন সরোবরে
ডুব কেবল ডুব অতলান্ত নীল
গভীর থেকে গভীরে
আলম্বিত কলঙ্ক পর্দায়
দেখি লেখা ভালো আছি — যথেচ্ছ
ভালো আছি
যদিও বা নাই থাকি
ভেবে নিতে দোষটা কি?

করমুক্ত চিন্তার নিষ্কর জমিদার
আমরা তো ভালো আছি।

এই তো সময়

বরুণচন্দ্র পাল, সহ-শিক্ষক
পিড়রাবনী হাইস্কুল, *বাঁকুড়া*

ওপার বাংলার হুমায়ুন আজাদ নয় —
নয় এপার বাংলার সফদার হাসমি;
.....কৌশলে বানানো এভাবেই ঘাতকবাহিনীর
নগ্ন চপার
কেড়ে নিতে চায় সব কিছু!

অথচ 'দু-হাত কেটে নিলেও থামানো যাবে না কলম'
নীতিহীন নপুংসকের কাছে;
অদম্য ইচ্ছেরা ডানা মেলুক শাখায় প্রশাখায়
......এমনকি শিকড়েও;
ঝড় হয়ে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে খড়কুটোর মতন
সূর্য ওঠার আগে; সারিবদ্ধ কোটি মানুষের মুখর করধ্বনি....
রচিত না হয় পুনর্বার;
রক্তস্নাত 'ব-দ্বীপ গোধরা'র —
সাহসে রুখে দাঁড়ানোর এই তো সময়!

টেনে নেয়

জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়
জগাছা হাইস্কুল, *হাওড়া*

দুপুরের রোদ
ভেদ করে
ঘুম-তাড়ান সোরগোল, কোলাহল, হুল্লোর,
ঝড়ো ছোটাছুটি।

চমকায় বারবার
কোলে বুকে পোষা নির্জনতাটুকু,
বোজা বোজা ঘুমে আধো ভেজা দু'টো চোখ।

হয়ত
বেহিসাবি,
তবু,
পাতলে-ই কান
টড়াক্ টক্ টড়াক্ টক্
কালজিৎ
অনাবিল দৃপ্ত পায়চারি
রাস্তার এ আকাশ হয়ে
ও আকাশ
অন্তহীন।

পাড় ভাঙছে

রঞ্জিতকুমার সরকার
বহুলা শশী স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়, *বর্ধমান*

পাড় ভাঙছে এখন, দেখ চতুর্দিক
রুগ্ন মেঘের উড়াল দিলো চতুরদিক —
স্বপ্ন এখন হাতের মুঠোয় বোধনে
ঘুম-জাগরণ একাকার এই রোদনে,
সঙ্গী আমার ব্যথিত দিন রাত্রিতে
নিঃস্বতারই খোলস-পরা যাত্রীতে,
শুধুই জলের শব্দ শোনে গাছগুলি
জলের ভেতর জীবন-মৃত্যু নাচগুলি,
শব্দ বড়ো রঙিন এবং আতুর, ধিক্!
পাড় ভাঙছে এখন, দেখ চতুর্দিক।

এতদিনে শিখেছি

সুশীল নাগ, *বর্ধমান*

আছি বটে আঁধারে
তবু --
আলোকিত সময় তো
কারো একার নয়!

আপনি ডিগ্রিধারী
শিক্ষিত!
তাই প্রসঙ্গতঃ
বলে রাখি বাবু —
চিরকাল কারো
সমান নাহি যায়।
গত বছর ভিটেমাটি
চলে গেল
খাজনা ও খয়রাতি
শোধ দিতে
সারাদিন খেটে খেটে
জোয়ান বয়স গেল
তবু ভাল ; — আজকাল
সাক্ষরতার দৌলতে
এতদিনে শিখেছি বাবু
অক্ষরের চোখে
কত আলো থাকে!
আজও তাই —
আশায় বুক বেঁধে
বসে আছি
আসন্ন বদলের দিকে চেয়ে।

দাবি

সুরঞ্জন চক্রবর্তী, *কলকাতা*

কারুর বাবা রিক্‌শা-চালক
কারুর বাবা নিত্য-হকার
কারুর বাবা ছাঁটাই শ্রমিক
কারুর বাবা পূর্ণ বেকার!
কারুর আম্মা বাবুর বাড়ি
উঠোন নিকোয় বাসন মাজে
কারুর দিদি মায়ের মতোই
গতর খাটায় ঝিয়ের কাজে!
সকাল থেকেই ব্যস্ত ওরা
নেই ফুরসত একটু জিরোয়
রক্ত ঢেলেও রোজই ওদের
নুন আনতে পান্তা ফুরোয়!
ওরা সবাই ভীষণ গরীব
কোনক্রমে জীবন কাটায়
দরমা-দেয়াল মাটির মেঝে
শতচ্ছিন্ন মলিন চাটায়!
তবুও ওরা স্বপ্ন দ্যাখে
ওদের ঘরের বালবাচ্চা
মানুষ হ'লে উপায় হবে
সফল হবে ওদের বাঁচা!
সেই আশাতেই পাঠায় তাদের
ওদের গড়া বিদ্যালয়ে
বিবুদ্ধদের ছত্রছায়ায়
জ্ঞানের আলোয় দিগ্বিজয়ে!
ওদের আশা ওদের ভাষা
বোঝেন যাঁরা তাঁরাই গুরু
তাঁদের দানে সূর্যস্নানে
আলোর পানে যাত্রা শুরু!
শুধু লজ্জা গুরুর বেশে
ভোগচর্চায় অল্পকিছু
ঘন্টা পড়ার পরেও যাঁরা
ছুটতে থাকেন ফাঁকির পিছু!
ফাঁকির রাজা ফাঁকির রাণী
তাঁদের কাছে ওদের দাবি
আত্মশীলন হয় না কেন
টিচার্সরুমের রিসোর্স ছবি!
যে ছবিতে উদ্ভাসিত
দিন-আনাদের বাছার কথা
নিরক্ষরের শাপমোচনে
বুনো রামনাথ-বৎসলতা!

হাওড়া

উলুবেড়িয়া আঞ্চলিক শাখার
৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

গত ২২শে আগস্ট, রবিবার, কৈজুড়ী হাই স্কুলের (কাশীনাথ মণ্ডল নগর) নরেন বিশ্বাস মঞ্চে উলুবেড়িয়া আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষে উমাশঙ্কর গাঙ্গুলী ও রঞ্জিতকুমার দাস, জেলা নেতৃত্বের পক্ষে প্রতিমা চক্রবর্তী। অঞ্চল শাখার সভাপতি মাননীয় মহঃ আবদুল্লা কর্তৃক সমিতির পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মেলনের শুভ সূচনা হয়। সম্মেলনের শুরুতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, মহকুমা শাখার সাংস্কৃতিক দল গণসঙ্গীত পরিবেশন করে। মহঃ আবদুল্লা, প্রতিমা চক্রবর্তী, অভ্রকেতন ভট্টাচার্য ও সলিল সেনগুপ্তকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অঞ্চল শাখার সহ-সম্পাদক মহঃ ফারুক কর্তৃক শোক প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং তারপরে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সমিতির কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ও মহকুমা সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস। অঞ্চল সম্পাদক মানস দাস সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং কোষাধ্যক্ষ হরেন্দ্রনাথ পুরকাইত আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ও সর্বশিক্ষা অভিযানের সপক্ষে তিনটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এরপর সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা শুরু হয়। সম্মেলনে উপস্থিত মোট ২৫০ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৯জন সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সম্পাদকের জবাবী ভাষণের পূর্বে সম্মেলনে আগত প্রবীণ ও নবীন প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে মনোগ্রাহী বক্তব্য রাখেন সম্মেলনের প্রধান অতিথি সমিতির কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ও প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ উমাশঙ্কর গাঙ্গুলী। এই সম্মেলন মঞ্চে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও এস এস সি'র মাধ্যমে আগত নবীন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন খগেন দাস, বারীন মিত্র, সুফল বাগ প্রমুখ। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে বক্তব্য রাখেন মনোরঞ্জন মাখাল। সম্মেলনে ৫৪ জনের আঞ্চলিক কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় এবং ৫১ জনের মহকুমা সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। এরপর সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব সহ সম্মেলনে উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সবশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জগাছা আঞ্চলিক শাখার
পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

গত ২১·৮·০৪ শনিবার জগাছা হাইস্কুলে জগাছা অঞ্চলের ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার শুরুতেই সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন অঞ্চল সভাপতি দিবজিৎ মুখোপাধ্যায়। এরপর শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে অমর শহীদদের স্মরণ করা হয়। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন অঞ্চলের অন্যতম সদস্য সুরঞ্জনা ঘোষ। অঞ্চল সভাপতি দিবজিৎ মুখোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি বীণাপাণি সরকার ও রঞ্জিত দত্তকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভার কাজ পরিচালনা করে। গোপাল দলুই ও মৈত্রেয়ী সেনগুপ্তকে নিয়ে অনুলিখন কমিটি এবং সুব্রত সরদার, ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জী, মঞ্জুলিকা নস্করকে নিয়ে স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন জগাছা হাইস্কুল ইউনিটের সদস্যরা। উদ্বোধনী ভাষণ দেন হাওড়া সদর মহকুমা কমিটির সহ-সভাপতি রাজারাম চৌধুরী। এরপর অঞ্চল সম্পাদক তাঁর লিখিত প্রতিবেদন পেশ করেন। অঞ্চল কোষাধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রলাল বণিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। এরপর হাওড়া জেলার ১৫নং আঞ্চলিক কমিটির বামফ্রন্টের আহ্বায়ক সমীর সাহা সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ ভাষণে কেন আজকের দিনে শিক্ষক সমাজের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করেন। অঞ্চল সম্পাদকের প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাবের ওপর বিভিন্ন ইউনিট থেকে ১০জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। সভায় 'সকলের জন্য শিক্ষা এবং মানোন্নয়ন'-এর পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করেন ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় এবং তা সমর্থন করেন কলিমউদ্দিন মণ্ডল। সভায় 'পেট্রোপণ্যের মূলবৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাব' পেশ করেন অশোক অধিকারী এবং তা সমর্থন করেন অঞ্চলের প্রবীণ নেতা অলোককুমার ভট্টাচার্য্য। সম্পাদকের জবাবী ভাষণের পর উপস্থিত প্রতিনিধিরা প্রস্তাবসমূহ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সহ সম্পাদকীয় প্রতিবেদনকে

সমর্থন ও গৃহীত করেন। অঞ্চল সম্পাদক কর্তৃক প্রস্তাবিত নতুন অঞ্চল কার্যকরী সমিতির সদস্য ও হাওড়া সদর মহকুমা সম্মেলনের প্রতিনিধিদের নাম সকল প্রতিনিধি সমর্থন করেন। সবশেষে বক্তব্য রাখেন এ বি টি এ-র প্রবীণ নেতা উমাশঙ্কর গাঙ্গুলী। তিনি একে একে ছুটি, ডি এ, শিক্ষাকর্মী ও করণিকদের সমস্যা, বিভিন্ন বন্‌ধে সমিতির সদস্যদের কাম্য ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। সভায় মোট ১২৯ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অঞ্চল সভাপতি দিবজিৎ মুখোপাধ্যায়ের ধন্যবাদ সূচক সমাপ্তি ভাষণের মধ্যদিয়ে সভার কাজ শেষ হয়। সভায় কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

জগাছা আঞ্চলিক শাখা আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

গত ৭ই আগস্ট শনিবার, সাঁত্রাগাছি কেদারনাথ ইনস্টিটিউশনে জগাছা আঞ্চলিক শাখার ২০০৪-এর বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই প্রতিযোগিতায় অঞ্চলের বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ১৫৭জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রচণ্ড বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে প্রাণবন্ত প্রতিযোগীদের, তাদের অভিভাবকদের ও অঞ্চলের নবীন ও প্রবীণ সদস্যদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলে।

বালী গ্রামীণ আঞ্চলিক শাখার চতুর্থ ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

গত ৭ই আগস্ট বালী গ্রামীণ আঞ্চলিক শাখার চতুর্থ ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন ঘোষপাড়া নিশ্চিন্দা বালিকা বিদ্যাপীঠে অনুষ্ঠিত হয়। ১০০ সদস্য-সদস্যার উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্যদিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলন পরিচালনা করেন আঞ্চলিক সভাপতি ডঃ সুশোভন দাস। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সম্পাদক রতন কোলে। প্রতিবেদনের উপর ১০জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমার পক্ষে সভাপতি অরবিন্দ সমাদ্দার ও জেলা সভাপতি দিলীপ চট্টোপাধ্যায়। দিলীপবাবু প্রাঞ্জল ভাষায় বর্তমান পরিস্থিতির উপর সুন্দর বক্তব্য রাখেন। কিছু সংযোজন সহ প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পরে ১৭জনের আঞ্চলিক কমিটি ও ১৮জন মহকুমার সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্বাচনের পর সম্মেলন শেষ হয়।

উলুবেড়িয়া মহকুমা শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির উলুবেড়িয়া মহকুমা শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ২৯শে আগস্ট সোনামুই ফতে সিং নাহার উচ্চ বিদ্যালয়ে। সমিতির সূর্য-লাঞ্ছিত পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পর প্রতিনিধিগণ সম্মেলন কক্ষে প্রবেশ করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সমিতির ওয়ার্কিং এণ্ড ফিনান্স কমিটির সদস্য ও কলকাতা জেলা শাখার সম্পাদক নির্মলেন্দু গুহ। তিনি বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন এবং সমিতির সদস্যদের চেতনার মান বৃদ্ধির উপর জোর দেন। বর্তমান বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের যুগে শিক্ষক ও সাধারণ শ্রমজীবী ও মেহনতী মানুষের উপর যে ভয়ঙ্কর আক্রমণ নেমে এসেছে তা প্রতিহত করার জন্য সদস্যদের আরও সংগঠিত হতে বলেন। উলুবেড়িয়া মহকুমার বিদায়ী সম্পাদক মোহনচন্দ্র সাঁতরা সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে প্রতিবেদন ও বিভিন্ন প্রস্তাবসমূহ উত্থাপন করেন। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন মহকুমা শাখার কোষাধ্যক্ষ জয়দেব রায়। তিনি উপস্থিত প্রতিনিধিগণকে প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদনের জন্য আবেদন জানান। প্রতিবেদনের উপর উলুবেড়িয়া মহকুমা শাখার বিভিন্ন অঞ্চলের মোট ১১ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের আলোচনায় শিক্ষা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নে বামফ্রন্ট সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার অঙ্গনে দীর্ঘদিনের কিছু সমস্যা, যেমন, সঠিক সংখ্যায় সরকারী বই প্রদান, শিক্ষাকর্মী নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, কর্মরত অবস্থায় মৃত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের পোষ্যদের চাকুরীর ক্ষেত্রে বর্তমান বিধি প্রত্যাহার, ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে আরও অতিরিক্ত শিক্ষকপদ সৃষ্টি, সহ-প্রধান শিক্ষক নিয়োগ, প্রতিষ্ঠানগত ছুটি হ্রাস, অবসর গ্রহণের আগে অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিতকরণ, জুনিয়র ও সিনিয়র শিক্ষকদের বৈষম্য দূরীকরণ ও রোপা' ৯৮-এর দ্বিতীয় অংশ প্রকাশ প্রভৃতি বিষয়গুলি একাধিক প্রতিনিধি আলোচনা করেছেন। সমিতির হাওড়া জেলা সম্পাদক শিশির দীর্ঘাঙ্গী ও সভাপতি দিলীপ চট্টোপাধ্যায় সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে পাঠদানের ক্ষেত্রে আরও আন্তরিক ও দায়িত্বশীল হতে অনুরোধ জানান। বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা, শিক্ষার পরিকাঠামো প্রস্তুত ও শিক্ষার উপর বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের ফলে যে আক্রমণ নেমে এসেছে তা

প্রতিরোধ করার জন্য সমিতির পতাকাতলে সদস্যদের আরও সংগঠিত হতে বলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভানেত্রী উপাসনা নন্দীও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন উলুবেড়িয়া মহকুমা ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বায়ক শ্যামাপদ রায়চৌধুরী ও কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজিত প্রধান। তাঁরা শিক্ষা, শিক্ষক ও দেশের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে যৌথ আন্দোলনের এই মঞ্চটিকে আরও শক্তিশালী করা এবং যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচিতে শিক্ষক মহাশয়দের আরও বেশী সংখ্যায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। সম্মেলনে সর্বশিক্ষা অভিযান সফল করার লক্ষ্যে, শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির গৈরিকীকরণ ও ইতিহাসকে বিকৃত করার বিরুদ্ধে, শিক্ষার বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে, সাধারণের বিদ্যালয় রক্ষা করার পক্ষে ও সালিশী বিলের পক্ষে উত্থাপিত প্রস্তাবগুলি সহ সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদিত হয়। বিদায়ী সম্পাদক মোহনচন্দ্র সাঁতরা আগামী তিন বছরের জন্য মহকুমা কার্যকরী সদস্যদের তালিকা, জেলা সম্মেলনে প্রতিনিধিদের নামের তালিকা ও অডিটর প্যানেল উত্থাপিত করেন। প্রবল হর্ষধ্বনি সহ উপস্থিত প্রতিনিধিগণ সেগুলি অনুমোদন করেন এবং ২৭ জন প্রতিনিধিকে নিয়ে মহকুমার নূতন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। মোট ২৬৯ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন রঞ্জিতকুমার দাস, যুধিষ্ঠির কয়াল ও ছায়া মণ্ডলকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। শেষে অভ্যর্থনা কমিটি ও সোনামুই ফতে সিং নাহার উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে সম্মেলন শেষ হয়।

উলুবেড়িয়া মহকুমা শাখার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির উলুবেড়িয়া মহকুমা শাখার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় গত ৫ই সেপ্টেম্বর বাগনান হাইস্কুলে। মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিযোগীদের নিয়ে প্রায় দুই শতাধিক অভিভাবক-অভিভাবিকা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতা-শেষে ঐদিনই সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের প্রতিকৃতি মালা দিয়ে সাজানো হয়। উলুবেড়িয়া মহকুমা সম্পাদক মোহনচন্দ্র সাঁতরা উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের কাছে ডঃ রাধাকৃষ্ণাণের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, শিক্ষক সমাজের কাছে আজকের দিনটি অত্যন্ত গর্বের ও আনন্দের দিন, সেই সঙ্গে আত্মসমালোচনা ও শপথ গ্রহণের দিন। সমিতির হাওড়া জেলা কমিটির সম্পাদক শিশির দীর্ঘাঙ্গী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং আগামীদিনে ছাত্র-ছাত্রীদের আরও বেশী সংখ্যায় অংশগ্রহণের উপর জোর দেন। অভিভাবকদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই প্রতিযোগিতা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। সমিতির হাওড়া জেলা কমিটি ও উলুবেড়িয়া মহকুমা কমিটির সদস্যগণ সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সভায় আবৃত্তি করে শোনান শিক্ষকবন্ধু সেখ নজরুল ও দেবাশিষ মুখার্জী। সভানেত্রী ছায়া মণ্ডল উপস্থিত সকলকে ও বাগনান হাই স্কুল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করেন।

উলুবেড়িয়া মহকুমা শাখার উদ্যোগে শিক্ষিকা ও মহিলা শিক্ষাকর্মী কনভেনশন

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির উলুবেড়িয়া মহকুমা শাখার শিক্ষিকা ও মহিলা শিক্ষাকর্মী কনভেনশন গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর বাগনান বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পর উপস্থিত শিক্ষিকা ও মহিলা শিক্ষাকর্মিগণ কনভেনশন কক্ষে প্রবেশ করেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে বাগনান বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। কনভেনশনের উদ্বোধন করেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা ও হাওড়া জেলা কমিটির সহ-সভানেত্রী সেবা চক্রবর্তী। তিনি তাঁর বক্তব্যে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ ও হাওড়া জেলার পুরুষ ও নারীর পরিসংখ্যান তুলে ধরে মহিলারা কিভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছেন তা ব্যাখ্যা করেন। সেই সঙ্গে সাংসারিক কাজকর্ম, বিদ্যালয়ে পাঠদান সম্পাদনের পাশাপাশি সমিতির বিভিন্ন কর্মসূচিতে আরও বেশী করে শিক্ষিকা ও মহিলা শিক্ষাকর্মীদের অংশগ্রহণের উপর জোর দেন। সমিতির বিভিন্ন স্তরে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের বিষয়টি উত্থাপন করে তিনি অনিলাদি, মায়া চক্রবর্তী ও পদ্মাদি প্রমুখের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সদস্যাদের আরও মুখর ও সক্রিয় হওয়ার অনুরোধ জানান। নিজেদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র আগ্রহের অভাব ও সঙ্কোচের কারণে শিক্ষিকাগণ পিছিয়ে থাকছেন।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী ও বাগনান কেন্দ্রের বিধায়িকা মাননীয়া নিরুপমা চ্যাটার্জী সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের কাছে মহিলা আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরেন এবং বর্তমান সময়ে মহিলাদের উপর যে অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার

চলছে তা প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে মহিলাদের বিশেষ ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানান। কনভেনশনে প্রস্তাব উত্থাপন করেন অনিমা হাটি। প্রস্তাবের উপর আলোচনায় প্রতিনিধিগণ হাওড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে মদ্যপান ও মাদকদ্রব্য সেবনের বিরুদ্ধে মহিলাদের আন্দোলন, বিভিন্ন মিডিয়া ও ইলেক্টনিক্স মাধ্যমে মহিলাদের অশালীন অঙ্গ প্রদর্শনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের বিষয়গুলি উঠে আসে। সমিতির উলুবেড়িয়া মহকুমা সম্পাদক মোহনচন্দ্র সাঁতরা কনভেনশনের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। ট্রামে-বাসে, বিদ্যালয়ে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ও পারিবারিক জীবনে মহিলাদের যে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয় তা প্রতিরোধ করার জন্য সংগঠনের পতাকাতলে আরও সংগঠিত ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানান।

সমিতির মহিলা শাখার হাওড়া জেলা কমিটির আহ্বায়িকা প্রতিমা চক্রবর্তী মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানে রাজ্য ও জেলা স্তরে মহিলা শাখা গঠনের কথা বলেন এবং আগামীদিনের কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন অনিমা হাটি। সভায় অনিমা হাটিকে আহ্বায়িকা করে ৯ জনের উলুবেড়িয়া মহকুমা মহিলা কমিটি গঠিত হয়। সভায় ৮৯ জন শিক্ষিকা ও মহিলা শিক্ষাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশন পরিচালনা করেন ছায়া মণ্ডল, সুপর্ণা সেন ও দীপ্তি বাগকে নিয়ে গঠিত সভানেত্রীমণ্ডলী। কনভেনশন-শেষে ছায়া মণ্ডল উপস্থিত প্রতিনিধি ও বাগনান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও পরিচালক সমিতিকে ধন্যবাদ জানান। বাগনান আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক তপনকুমার দাস, কল্যাণপুর অঞ্চলের সম্পাদক সেখ শাহ আলম ও আমতা-পূর্ব অঞ্চলের সম্পাদক উত্তমকুমার মণ্ডল সভায় উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ দিনাজপুর

হরিরামপুর আঞ্চলিক শাখার

৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

গত ২৫শে জুলাই মহেন্দ্র হাইস্কুলে হরিরামপুর আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন আঞ্চলিক শাখার সভাপতি মোশারফ হোসেন। এরপর শহীদ বেদীতে মাল্যদান পর্ব শুরু হয়। মাল্যদান করেন মোশারফ হোসেন, জেলা সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, জেলা সম্পাদক কল্যাণকুমার দাস, মহকুমা সম্পাদক অখিল রাউৎ, আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক আনন্দকুমার মিশ্র। এছাড়া আঞ্চলিক শাখার সম্পাদকমণ্ডলীর সকল সদস্য, ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ।

সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বের কাজ শুরু হয় উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে। উদ্বোধক হিসেবে ভাষণ দেন জেলা সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু। তিনি প্রায় দু'ঘন্টা ধরে শিক্ষকদের অতীতে ও বর্তমান সময়ের শিক্ষা আন্দোলনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। জেলা সম্পাদক কল্যাণকুমার দাস তাঁর বক্তব্যে সমিতি-সদস্যদের সাংগঠনিক সচেতনতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন। এরপর সম্পাদক আনন্দকুমার মিশ্র সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি রফিকুল ইসলাম এবং বিভিন্ন ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। প্রতিবেদনের ওপর ৭জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। মহকুমা সম্পাদক তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্যে সদস্যদের কী কী করণীয় তার আলোকপাত করেন।

সম্মেলন-শেষে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সহ আয়-ব্যয়ের হিসাব, প্রস্তাবিত আঞ্চলিক কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এছাড়া গৃহীত হয় মহকুমা সম্মেলনে প্রতিনিধিত্বকারী নামের তালিকাও। সভাপতি সম্মেলনের আয়োজক মহেন্দ্র হাই স্কুলের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নবনির্বাচিত কর্মকর্তাগণ

সভাপতি ঃ মোশারফ হোসেন

সহ-সভাপতি ঃ কিরণচন্দ্র মাহাতো, রেজাবুল আলি সরকার, শিপ্রা ঘোষ

সম্পাদক ঃ আনন্দকুমার মিশ্র

সহ-সম্পাদক ঃ বিমলকুমার প্রামাণিক, পরিতোষ বর্মন, সুশান্ত সরকার

কোষাধ্যক্ষ ঃ অশিমুদ্দিন আহাম্মদ।

পশ্চিম মেদিনীপুর

খড়্গপুর মহকুমার

৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

গত ৭-৮ আগস্ট পিংলা থানার উজান হরিপদ হাইস্কুলে খড়গপুর মহকুমার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের

উদ্বোধন করেন গণআন্দোলনের নেতা হেম ভট্টাচার্য। প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে ৭ই আগস্ট সকাল ৯-৩০ মিনিটে শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীবন্ধুরা উপস্থিত হন ও ৬জন মহিলাসহ মোট ৫০জন রক্তদান করেন।

বিকেল ৩টায় শুরু হয় 'পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষা আন্দোলনের কর্মীদের কর্তব্য' শীর্ষক শিক্ষা কনভেনশন। উপচে-পড়া ভিড়ে উপস্থিত সদস্য-সদস্যা ও এলাকার শিক্ষাপ্রেমী মানুষের সামনে মনোজ্ঞ বক্তব্য পেশ করেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য্য অধ্যাপক স্বপন প্রামাণিক। কনভেনশনে তুষার পঞ্চানন, অপরেশ ভট্টাচার্য, মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, অমলেশ বসু, অনন্ত ধাড়া প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বিকেল ৫-৩০ মিনিটে কবিগুরুর তিরোধান দিবসে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও উজান বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী কর্তৃক ছায়াগীতি নাটিকা প্রদর্শিত হয়। এরপর সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন মহকুমা সভাপতি সিতাংশুশেখর রায় মহাপাত্র। শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্যদিয়ে প্রথম পর্বের কাজ শেষ হয়।

৩৯৬জন সদস্য/সদস্যার উপস্থিতিতে সুসজ্জিত সভাগৃহ ভরে ওঠে। সিতাংশুশেখর রায় মহাপাত্র, সীতানাথ গায়েন, বিনয় মাইতি ও পরেশচন্দ্র মল্লিককে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। অশোক ঘোষ, তরণীকান্ত বেরা, বুলু অধিকারী, ক্ষিতীশ বর্মন, মৃণাল নন্দকে নিয়ে গঠিত হয় স্টিয়ারিং কমিটি। সম্মেলনের অনুলিখন কমিটিতে দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য, অম্বুজ বেরা এবং পূর্ণচন্দ্র জানা ও ক্রিডেনসিয়াল কমিটিতে নির্বাচিত হন কৃত্তিবাস পতি, হরেন মাহাতো ও মৃণাল নন্দ।

সম্মেলন উদ্বোধন করেন এস টি এফ আই-এর সাধারণ সম্পাদক তুষার পঞ্চানন। এন ডি এ সরকারের শিক্ষাবিরোধী ভূমিকা, বিগত সাধারণ নির্বাচন ও ইউ পি এ সরকারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি তিনি তুলে ধরেন। সম্মেলনে মহকুমা সম্পাদক অশোক ঘোষ সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও কোষাধ্যক্ষ তরণীকান্ত বেরা আয়-ব্যয়ের হিসেব পেশ করেন। ১৩টি আঞ্চলিক কমিটির পক্ষে ২জন মহিলাসহ ২৬ জন প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে স্বাগত ভাষণ দেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ও স্থানীয় বিধায়ক রামপদ সামন্ত। সম্মেলনকে সমৃদ্ধ করতে বক্তব্য রাখেন সমিতির জেলা সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ ও জেলা সম্পাদক তথা রাজ্যের সহকারী সাধারণ সম্পাদক অপরেশ ভট্টাচার্য।

মহকুমা সম্পাদকের জবাবী ভাষণের পর প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব ও প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়। ৩৯ জনের নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। হিসাব পরীক্ষকদের প্যানেল, জেলা সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্বাচনের শেষে সভাপতিমণ্ডলীর ধন্যবাদজ্ঞাপক বক্তব্যের মধ্যদিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

গোপীবল্লভপুর-১নং আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

গত ১৮ই জুলাই সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয় সভাকক্ষে (শহীদ অর্ধেন্দু শতপথী মঞ্চে) গোপীবল্লভপুর-১নং আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে ৪৫জন প্রতিনিধি এবং ৫জন ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন সদস্য ও সমিতির নেতৃত্বের উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পর সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। প্রথমে আঞ্চলিক শাখার সভাপতি তথা অমর শহীদ অর্ধেন্দু শতপথীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের পর শোক প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এস টি এফ আই-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তুষারকান্তি পঞ্চানন সম্মেলন উদ্বোধন করেন। বিদায়ী সম্পাদক সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন এবং কোষাধ্যক্ষ আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। প্রতিবেদনের উপর ১০জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের সদস্যরা সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন। মহকুমা সম্পাদক অশোক মণ্ডল ও জেলা সম্পাদক অপরেশ ভট্টাচার্য বর্তমান অবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থেকে সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন এবং যৌথ আন্দোলনের উপর গুরুত্ব দেন। বিদায়ী সম্পাদকের জবাবী ভাষণের পর প্রতিবেদন, আগামী কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে আশীষ দাস সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নবনির্বাচিত কর্মকর্তাগণ

সভাপতি : আশীষ দাস

সহ-সভাপতি : সত্যনারায়ণ মিশ্র, প্রণয় পতি, বাণীপদ পাত্র

সম্পাদক : সুকোমল মহাপাত্র

সহ-সম্পাদক : বিধানচন্দ্র দে, মৃগেন্দ্রকিশোর সাউ, জগদীশ মিত্র

কোষাধ্যক্ষ : অমিতকুমার বেরা।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

গোসাবা আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

গত ২১শে আগস্ট গোসাবা আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন তারানগর বি টি পি হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন আঞ্চলিক সভাপতি স্মৃতিকণ্ঠ বাগ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী গৌরী হালদার। সম্মেলন উদ্বোধন করেন জেলা শাখার সহ-সম্পাদক অপূর্ব মণ্ডল। সম্পাদক অর্ধেন্দু ব্যানার্জী সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ অশোক গায়েন। প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশ নেন ১৬জন প্রতিনিধি। জবাবী ভাষণ দেন অঞ্চল সম্পাদকের পক্ষে ক্যানিং মহকুমা সম্পাদক রঘুপতি কপাট। এরপর সমাপ্তি সঙ্গীতের পর সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সভাপতি ঃ স্মৃতিকণ্ঠ বাগ
সম্পাদক ঃ অর্ধেন্দু ব্যানার্জী।

বাসন্তী আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

গত ২২শে আগস্ট সোনাখালি হাইস্কুলে বাসন্তী আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন আঞ্চলিক সভাপতি কানাইলাল সাহা। রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের পর সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। সভাপতি শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রঘুপতি কপাট। সম্মেলনে ৯১ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষে মতিয়ার রহমান উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর ১০জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। জবাবী ভাষণ দেন রঘুপতি কপাট। ২৯ জনকে নিয়ে আগামী আঞ্চলিক কমিটি গঠন এবং মহকুমা সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়।

নবনির্বাচিত কর্মকর্তাগণ

সভাপতি ঃ আলোকেশ সৎপতি
সহ-সভাপতি ঃ আরতী দে, কল্পনা দাস, রবীন নাইয়া
সম্পাদক ঃ গোপাল মোহন পাত্র
সহ-সম্পাদক ঃ পরিমল ভৌমিক, অনিল চাঙ্‌লিয়া, চিত্তরঞ্জন সর্দার
কোষাধ্যক্ষ ঃ অর্জুন সামন্ত।

ক্যানিং আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

গত ২২শে আগস্ট ক্যানিং আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন দ্বারিকানাথ বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন জেলা সহ-সম্পাদক রবীন রায়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন সম্পাদক বিনয়কৃষ্ণ মণ্ডল। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা সভাপতি গুপ্তধন চৌধুরী। সম্মেলনে ১৩৫জন প্রতিনিধি অংশ নেন। ১৫জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। জবাবী ভাষণ দেন বিদায়ী সম্পাদক বিনয়কৃষ্ণ মণ্ডল। আঞ্চলিক শাখা গঠন এবং মহকুমা সম্মেলনের প্রতিনিধি সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হওয়ার পর সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নবনির্বাচিত কর্মকর্তাগণ

সভাপতি ঃ পতাকা রায়
সহ-সভাপতি ঃ মনোরঞ্জন দেবনাথ, সত্যেন্দ্র নারায়ণ দাম, ঊষা অধিকারী
সম্পাদক ঃ বিনয়কৃষ্ণ মণ্ডল
সহ-সম্পাদক ঃ সামসুদ্দিন সরদার, পতিত পাবন মণ্ডল, পুষ্প অধিকারী
কোষাধ্যক্ষ ঃ ওয়াজেদ পৈলান।

ক্যানিং মহকুমা শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

গত ১৫ই আগস্ট ক্যানিং মহকুমা শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা বাসন্তী হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। ১৩টা বিষয়ে ১০৮জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সমিতির সদস্য-সদস্যারা ছাড়াও অভিভাবকরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মহকুমার স্থায়ী সভাপতি গুপ্তধন চৌধুরী। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে গোসাবার বিজয়নগর আদর্শ বিদ্যামন্দিরের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী, সঙ্গীত 'ক' বিভাগে প্রথম স্থানাধিকারিনী চয়নিকা জানা। মহকুমা সম্পাদক রঘুপতি কপাট সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্বন্ধে বলেন যে জীবনের সে সব নৈতিক ও মানবিকবোধ জীবনকে অর্থবহ করে তোলে, ব্যক্তির কাছে তার জীবনকে মূল্যবান করে, তাই মূল্যবোধ। গান-আবৃত্তির মধ্যদিয়ে মূল্যবোধ বিকশিত হবে, এটা তিনি আশা করেন। তিনি আরো বলেন যে আজ অনেক প্রতিযোগীর পিতা-মাতাও হাজির হয়েছিলেন, এটা শুভলক্ষণ। মা যদি সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনাসম্পন্ন হন, সন্তানগণ কখনও

বিশ্বায়নের কুপ্রভাবে অপসংস্কৃতির ধারক ও বাহক হতে পারে না। পরিশেষে সম্পাদক ঘোষণা করেন যে আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর বারুইপুর মদারাট পপুলার একাডেমিতে সকাল ১০টায় জেলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতি গুপ্তধন চৌধুরী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ায় প্রতিযোগী, অভিভাবক, সদস্যবৃন্দকে অভিনন্দন জানান। পরিশেষে পুরস্কার বিতরণী সভায় সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করে ক্যানিং দ্বারিকানাথ বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী, সঙ্গীত 'খ' বিভাগে প্রথম স্থানাধিকারিনী মধুমন্তী রায়।

নদীয়া

চাকদহ আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

গত ২২শে আগস্ট, রবিবার 'অমিয়প্রভা ভবনে' চাকদহ আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন সভাপতি পূর্ণেন্দু গাঙ্গুলী সমিতির পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্যদিয়ে শুরু হয়। সম্পাদক সুভাষ দে শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন। সম্মেলনে সুনীল ভট্টাচার্য সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সুভাষ সরকার উপস্থিত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বর্তমান সঙ্কটময় সময়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী বাস্তবানুগ সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান রেখে সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অতঃপর সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও ২৮১জন প্রতিনিধির সামনে বিদায়ী সম্পাদক খসড়া প্রতিবেদন এবং কোষাধ্যক্ষ বনমালী মণ্ডল সমিতি ও পরীক্ষা উপসমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করেন। সম্মেলনে ১৩ জন সদস্য প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাবের উপর বিস্তৃত আলোচনা করেন। সমিতির সাধারণ সম্পাদক অমল ব্যানার্জীর উপস্থিতি ও তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করে শোনান অনিল দালাল। বিভিন্ন ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন, গণআন্দোলনের নেতৃত্ব ও অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য পেশ করেন। পরিবেশকে আনন্দঘন করে তুলতে সম্মেলনে কবিতা, আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সম্পাদকের জবাবী ভাষণের পর কিছু সংশোধন ও সংযোজন সহ সর্বসম্মতভাবে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব গৃহীত হয়। অতঃপর জেলা প্রতিনিধি সুভাষ সরকারের পরিচালনায় বিদায়ী সম্পাদকের প্রস্তাবক্রমে সর্বসম্মতভাবে ৪১জন সদস্যের নতুন কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত হয়। নির্বাচিত হয় মহকুমার সম্মেলনের জন্য ৫০জন প্রতিনিধি।

সম্মেলনকে সফল করার জন্য সভাপতিমণ্ডলী উপস্থিত প্রতিনিধি বন্ধু, অভ্যর্থনা কমিটি ও নেতৃত্বকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মালদহ

ইংলিশবাজার ব্লক আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

গত ২২শে আগস্ট, রবিবার, চণ্ডীপুর বি আর এস উচ্চবিদ্যালয়ে ইংলিশবাজার ব্লক আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টায় সমিতির পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্যদিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন আঞ্চলিক সভাপতি স্নেহাংশু দাস। সম্মেলনে ১১৬ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী ভাষণ দেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও মহকুমা সভাপতি সুকেশ ঝা। শোক প্রস্তাব গ্রহণের পর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সম্পাদক চারু মণ্ডল, আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ তাপস লাহা। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ১৯জন প্রতিনিধি।

সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মহকুমা নেতৃত্ব রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রতিনিধিদের আলোচনার উপর সম্পাদক জবাবী ভাষণ দেন। ৩৩জনকে নিয়ে আঞ্চলিক শাখার আগামী নেতৃত্ব গঠিত হয়। মহকুমা সম্মেলনে প্রতিনিধিত্বকারী ৩৩জন নির্বাচিত হন।

মানিকচক আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

গত ২২শে আগস্ট মথুরাপুর বি এস এস হাইস্কুলে প্রদীপ সাউ মঞ্চের গৌরী-প্রিয়া কক্ষে সমিতির মানিকচক আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন আঞ্চলিক সভাপতি পুষ্পেন্দু উপাধ্যায়। শহীদবেদীতে মাল্যদানের পর সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সহ-সম্পাদিকা শ্রীমতী বনশ্রী বিশ্বাস। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী শেফালী সরকার। সম্মেলনে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতী ছাত্রদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি, মথুরাপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আজিজুর রহমান সমিতির ধারাবাহিক ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেন। উদ্বোধনী ভাষণে জেলা সম্পাদক কাজল সরকার কংগ্রেসের অর্থনীতির সঙ্গে বি জে পি'র অর্থনীতির যে কোন পার্থক্য নেই তা তিনি তুলে ধরেন। বিশ্বায়ন, বেসরকারীকরণ, উদারীকরণ, পি এফ-এর সুদ কমে যাওয়া ও ছুটি সংক্রান্ত নানা বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন। আঞ্চলিক সম্পাদক নিতাই দাস সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং কোষাধ্যক্ষ সুমিত দাস আয়-

ব্যয়ের হিসাব সম্মেলনে পেশ করেন। প্রতিবেদনের উপর প্রতিনিধিরা গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নেন। বিধায়ক শ্রীমতী অসীমা চৌধুরী দেশের শিক্ষার যে বেহাল অবস্থা তা তুলে ধরেন। শিক্ষার প্রসার ও মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক সমাজকেই যোগ্য ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে। সম্মেলনে মহকুমা সম্পাদক তপন চক্রবর্তী পেনশন, পি এফ এবং ডি আই অফিসের কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনায় তুলে ধরেন। জেলা কোষাধ্যক্ষ শঙ্কর সেনগুপ্ত সাক্ষরতা আন্দোলন, পি এফ, পেনশন, ছুটি, এমবার্গো ইত্যাদির বিষয়ে সম্মেলনে আলোচনা করেন।

পরিশেষে বিদায়ী সম্পাদক জবাবী ভাষণ দেন এবং সাথে সাথে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সমিতির পতাকাতলে আরো ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বীরভূম

বোলপুর আঞ্চলিক শাখার
৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

গত ১৫ই আগস্ট সমিতির বোলপুর আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রাইপুর এস কে মেমোরিয়াল চার্চ বিদ্যালয়ে। উক্ত সম্মেলন উদ্বোধন করেন পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষের শিক্ষা আন্দোলনের বর্ষীয়ান বিশিষ্ট নেতা ও রাজ্য কমিটির সদস্য মাননীয় অরুণ চৌধুরী। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে শিক্ষা আন্দোলনের বিবর্তনের ধারা বিবৃত করেন ও বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে সমিতির সদস্যবন্ধুদের ইতিকর্তব্যের দিকটি আলোচনা করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি গৌরগোপাল দাস সম্মেলনের শুরুতে সকলকে স্বাগত জানান ও সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। এই সম্মেলন উপলক্ষে এক স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে তা প্রকাশ করেন অরুণ চৌধুরী।

আঞ্চলিক শাখার ৩২টি বিদ্যালয় থেকে আগত মোট ১৭৫জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদক দ্বারা উত্থাপিত প্রতিবেদনের উপর মোট ২১ জন সদস্যবন্ধু আলোচনা করেন। বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন।

সভায় সমিতির জেলা সম্পাদক রবিউল হক, সহ-সম্পাদক বেনজির রহমান, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের জেলা সদস্য মহঃ নূর-উজ-জামান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বোলপুর শ্রীনিকেতন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমতী সুপ্রিয়া ঘোষাল।

জেলা সম্পাদক রবিউল হক তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে শিক্ষা আন্দোলনের বর্তমান ধারায় সমিতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

খয়রাশোল আঞ্চলিক শাখার
৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

খয়রাশোল আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ১৫ই আগস্ট, রবিবার গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। সমিতির পতাকা উত্তোলন ও উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্যদিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল। সম্মেলনে ৬২ জন সমিতির সদস্য এবং ২১ জন ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের সদস্যবন্ধু উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন গণআন্দোলনের নেতা দিলীপ গাঙ্গুলী, বিশেষ অতিথি, বীরভূম জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সাম্যসাধক সরকার, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সদস্য নূর-উজ-জামান, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা অনিমা রায়, সিউড়ী (সদর) মহকুমার সভাপতি সুনীল কর্মকার, মহকুমা সম্পাদক সমর ব্যানার্জী। এরপর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব পাঠ করেন সম্পাদক বিশ্বজিৎ মুখার্জী। পরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের আগত প্রতিনিধিরা গঠনমূলক সমালোচনা করে প্রতিবেদনের উপর সমর্থন জ্ঞাপন করেন। সমগ্র সভা পরিচালনা করেন দেবশঙ্কর মজুমদার, বিশ্বনাথ দে এবং শ্রীমতী মোহর ব্যানার্জী। সভার শেষে সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন সভাপতি মোহনচন্দ্র ঘোষ।

খয়রাশোল আঞ্চলিক শাখার
সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

গত ২৮শে আগস্ট খয়রাশোল বালিকা বিদ্যালয়ে খয়রাশোল আঞ্চলিক শাখার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অঞ্চলের স্থায়ী সভাপতি মোহনচন্দ্র ঘোষ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সাম্যসাধক সরকার। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা অনিমা রায় উপস্থিত ছিলেন। ১২টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সম্পাদক বিশ্বজিৎ মুখার্জী, সহ-সম্পাদক বিশ্বনাথ দে এবং শ্রীমতী মোহর ব্যানার্জী। উক্ত সভায়

২০০৪ সালের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ব্লকের সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয় এবং বিভিন্ন বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। সভার শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শেষ করেন।

কলকাতা

সাদার্ণ এভিন্যু আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

গত ৭ই আগস্ট, ২০০৪, শনিবার লাইট হাউস ফর দি ব্লাইণ্ড বিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে সাদার্ণ এভিন্যু আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতেই সংগঠনের

পতাকা উত্তোলন করেন কলকাতা জেলা সভাপতি ও পর্যবেক্ষক সন্তোষ দত্ত। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে লাইট হাউস অন্ধ বিদ্যালয়ের সদস্য ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য সংগঠনের সহ-সম্পাদক লুৎফুল আলম। শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে দীপক চৌধুরী। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী সম্পাদক ডাঃ নির্মল রায়। ২০০৩-২০০৪ বর্ষের সদস্যসংখ্যা ১৫৭জনের মধ্যে সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত হন ১১০ জন। অঞ্চলের ১২টি সদস্য বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মোট ১৩ জন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর। সম্মেলনে শিক্ষিকাদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য—মোট ৪২ জন।

সম্মেলন মঞ্চ থেকে মোট ২১ জনের কার্যকরী কমিটি গঠিত হয় এবং ১৬ জন প্রতিনিধি মহকুমা সম্মেলনের জন্য নির্বাচিত হন।

সাদার্ণ এভিন্যু আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

গত ২১শে আগস্ট বেলা ২টায় সাদার্ণ এভিন্যু আঞ্চলিক শাখা আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা লাইট ফর দি ব্লাইণ্ড বিদ্যালয়ে অঞ্চলের ১১টি বিদ্যালয়ের মোট ১৪৬ জন ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজ্য সংগঠন নির্ধারিত ৭টি বিষয়ে বিভিন্ন বিভাগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। লাইট হাউসের প্রেক্ষাগৃহে উক্ত অনুষ্ঠানের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী সহ মোট ৩৭ জন ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই ৩৭ জন প্রতিযোগী আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর ভবানীপুর গার্লস হাই স্কুলে মহকুমা শাখার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে চলাকালীন সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। প্রতিযোগিতার দিন ২৫জন শিক্ষক ও শিক্ষিকা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়ে বিচারকের ভূমিকা পালন করেন এবং ১২ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেন।

মেটিয়াব্রুজ আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

মেটিয়াব্রুজ আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন মেটিয়াব্রুজ হাই স্কুলে (অনিলা দেবী নগর) অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রারম্ভে সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন অঞ্চলের প্রবীণতম অবসরপ্রাপ্ত সদস্য শিক্ষক গোলাম রসুল। সম্মেলন উদ্বোধন করেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির রাজ্য সভাপতি ক্ষমা ভট্টাচার্য। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন বিদায়ী সম্পাদক সত্য সাউ। খসড়া প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রতিনিধিগণ। এরপর ভাষণ দেন জেলা সম্পাদক নির্মলেন্দু গুহ। আরতি চ্যাটার্জী, রেখা সেন, গোলাম রসুল এবং রতন সরকারকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলনের কার্য পরিচালনা করেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এই বছরে প্রয়াত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মনোরমা পালের

নাম অনুসারে সম্মেলন মঞ্চের নামকরণ করা হয় মনোরমা পাল মঞ্চ।

বেসরকারীকরণ এবং উদারীকরণের দোহাই দিয়ে যখন সর্বসাধারণের শিক্ষাব্যবস্থা কলকাতার উত্তর ও মধ্যভাগ আক্রান্ত, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির ছাত্র সংখ্যা যেখানে হ্রাস পাচ্ছে সেখানে মেটিয়াব্রুজ অঞ্চলে বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের একটা জোয়ার এসেছে। মেটিয়াব্রুজ অঞ্চল দরিদ্র, পিছিয়ে-পড়া মানুষের বাস। জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ সংখ্যালঘু। ২৬ বছরে বামফ্রন্টের আমলে এই অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে সাংসদ ও বিধায়ক কোটার অর্থে শিক্ষার এক সুন্দর পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। তারই ফলস্বরূপ শিক্ষাক্ষেত্রে অঞ্চলের উন্নয়ন।

সম্মেলন থেকে ২৫ জনের কার্যকরী আঞ্চলিক কার্যকরী কমিটি সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া আগামী মহকুমা সম্মেলনের জন্য ২১ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়।

হুগলী

হুগলী-চুঁচুড়া আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

গত ২১শে আগস্ট হুগলী গার্লস হাই স্কুল প্রাঙ্গণে হুগলী-চুঁচুড়া আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন বিপুল উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠিত হয় প্রায় ২৫০জন শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীর উপস্থিতিতে। এই সম্মেলনে পূর্বে প্রায় ১ মাস ধরে সমিতির আঞ্চলিক শাখার অন্তর্গত ৩১টি বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় ইউনিটের সম্মেলন সদস্যবন্ধুদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। সম্মেলনে সমিতির সূর্য-লাঞ্ছিত পতাকা উত্তোলন করেন অঞ্চল সভাপতি অসিত চক্রবর্তী। শহীদ বেদীতে মাল্যদান অনুষ্ঠানের পর শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সমিতির ৩ বছরের রিপোর্ট সম্মেলনে উপস্থাপিত করেন সমিতির আঞ্চলিক সম্পাদক সুদীপ তরফদার। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ কিরণময় নন্দ। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সমিতির জেলা শাখার সহ-সভাপতি দিলীপ চট্টোপাধ্যায়। সম্মেলনে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত দাবী-দাওয়া যেমন আলোচিত হয় তেমনি পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আন্দোলন ও সংগ্রামের বিভিন্ন দিক এবং শিক্ষা, পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি নিয়ে সদস্যবন্ধুরা আলোচনা করেন। সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক (শিক্ষা) মিত্রা ভট্টাচার্য সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

বাঁকুড়া

বড়জোড়া আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

গত ৮ই আগস্ট বড়জোড়া আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন গদারডিহি উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত দুই বিশিষ্ট নেতার উদ্দেশ্যে মুক্তি দাশগুপ্ত নগর ও মুক্তি কুম্ভকার মঞ্চ নাম রাখা হয়। পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। আঞ্চলিক শাখার সভাপতি পতাকা উত্তোলন করেন। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন জেলা নেতৃত্ব, ২৪টি ইউনিটের সম্পাদকগণ ও প্রতিনিধিরা। এছাড়া গণসংগঠনের ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের প্রতিনিধিরাও মাল্যদান করেন। জেলা নেতৃত্ব পরিমল সিংহ তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা ও বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষকের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আঞ্চলিক সম্পাদক নিমাই বাউরী শোক প্রস্তাব পাঠ করেন। উদ্বোধনী ভাষণের পর আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও কোষাধ্যক্ষ আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। সম্মেলনে মোট ১৫০জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে এক জন প্রতিনিধি সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এ আয়-ব্যয়ের হিসাব সকলে পূর্ণ সমর্থন জানান। সম্পাদক জবাবী ভাষণ দেন। সম্মেলনে জোন বিভাজনের প্রস্তাব রাখা হয়। সম্মেলনের শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। এরপর সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে আকবর আলি মোল্লা সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

খাতড়া মহকুমা শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

গত ২১-২২শে আগস্ট খাতড়া মহকুমার শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন সিমলাপালে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে প্রথমে শিক্ষা সমাবেশের সূচনা হয়। এই সমাবেশে বাঁকুড়া জেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটির সদস্য অমিয় পাত্র উদ্বোধনী ভাষণ দেন। সন্ধ্যে ৭টায় সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক অপরেশ ভট্টাচার্য। এরপর ২২শে আগস্ট রাজ্য নেতৃত্বের ভাষণের পর সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা, সম্পাদকের জবাবী ভাষণ,

আয়-ব্যয়ের হিসাব ও রিপোর্ট অনুমোদিত হয়। বেলা ২টার সময় মহকুমা কার্যকরী কমিটির সদস্য, জেলা সম্মেলনের প্রতিনিধি ও হিসাব পরীক্ষক নির্বাচনের পর সভাপতিমণ্ডলীর বক্তব্য ও সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে। সকল প্রতিনিধিই সফল সম্মেলনের তারিফ করেন।

সোনামুখী আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

গত ১লা আগস্ট, রবিবার, প্রয়াত জ্ঞানজ্যোতি রায় নগরে প্রয়াত মুক্তি দাশগুপ্ত মঞ্চে (সোনামুখী বি জে হাইস্কুল) সোনামুখী আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টায় সমিতির পতাকা উত্তোলন ও শহীদবেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন ও শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন সভাপতি মলয় মণ্ডল। এছাড়া মাল্যদান করেন বিষ্ণুপুর মহকুমা নেতৃত্ব, আঞ্চলিক শাখার নেতৃত্ব ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ। শোকপ্রস্তাব পেশ করেন সহ-সম্পাদক নির্মল ব্যানার্জী। অতঃপর প্রয়াতদের উদ্দেশে ১মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সম্মেলনে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সদস্য সুকান্ত লাহা। বিষ্ণুপুর মহকুমা শাখার সম্পাদক আনন্দ চক্রবর্তী উদ্বোধনী ভাষণ দেন। তিনি তাঁর ভাষণে বর্তমান প্রেক্ষাপট, শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা, সমিতি-সদস্যদের আশু কর্তব্য, পেশাগত সমস্যাসহ পরিকাঠামোগত সমস্যা আলোচনা করেন। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি অধ্যাপক শক্তিরঞ্জন বসু, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা শেখর ভট্টাচার্য, যুব নেতা মনোজ চক্রবর্তী, শ্রমিক নেতা কুশল ব্যানার্জী এবং স্থানীয় কাউন্সিলর ভবেশ বরাট। সম্মেলনে ১৬০জন সদস্য প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করে সম্পাদক তারাপ্রসন্ন ব্যানার্জী ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ মনোরঞ্জন চোংরে, ১৯টি বিদ্যালয়ের ১জন ও অবসরপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে ১জন প্রতিনিধি প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। সম্মেলনে 'বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে' ও 'সর্বশিক্ষা অভিযানের পক্ষে' প্রস্তাব রাখা হয়। মহকুমা সম্পাদক ও আঞ্চলিক সম্পাদক উত্থাপিত প্রশ্নগুলির জবাবী ভাষণ দেন। সম্মেলনে আয়-ব্যয়ের হিসাব সহ সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও প্রস্তাব ২টি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। এই সম্মেলন থেকে ৩৩জনকে নিয়ে নতুন আঞ্চলিক শাখা গঠিত হয় এবং মহকুমা সম্মেলনে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে মলয় মণ্ডল সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান ও সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নবনির্বাচিত কর্মকর্তাগণ

সভাপতি ঃ মলয় মণ্ডল

সহ-সভাপতি ঃ করুণাময় দে, হরিহর পাল, সোমদেব ভট্টাচার্য

সম্পাদক ঃ তারাপ্রসন্ন ব্যানার্জী

সহ-সম্পাদক ঃ অতনু ব্যানার্জী, নির্মল ব্যানার্জী, তাপস গরাই

কোষাধ্যক্ষ ঃ মনোরঞ্জন চোংরে।

সোনামুখী আঞ্চলিক শাখা আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

গত ৩১শে জুলাই, শনিবার, সোনামুখী আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে আঞ্চলিক স্তরের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সোনামুখী বি জে হাইস্কুলে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। অঞ্চলের ১৯টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৬টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ঐ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতি বিভাগের সফল ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। মাধ্যমিক (২০০৪) ও উচ্চ মাধ্যমিক (২০০৪)-এর ফলাফলের ভিত্তিতে সোনামুখী ব্লকের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও একই সাথে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির প্রবীণ সদস্য মনোহর চ্যাটার্জী। এছাড়া ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সদস্য উমাপদ রায়, অধ্যাপক প্রশান্ত ব্যানার্জী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অতঃপর সম্পাদক তারাপ্রসন্ন ব্যানার্জী ও সভাপতি মলয় মণ্ডল উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

উত্তর ২৪ পরগণা

ব্যারাকপুর (দক্ষিণ) মহকুমা শাখার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ব্যারাকপুর (দক্ষিণ) মহকুমা শাখার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা গত ২৯শে আগস্ট আগরপাড়া মহাজাতি বিদ্যাপীঠে অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমার অন্তর্গত ১০টি আঞ্চলিক শাখার সমিতি-নির্দিষ্ট প্রতিটি বিভাগের প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পানিহাটি আঞ্চলিক শাখার তত্ত্বাবধানে আয়োজিত মহকুমা স্তরের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা

ছিল ১২০ জন। শিক্ষক এবং অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল স্বাভাবিক প্রত্যাশার চাইতেও বেশি। প্রতিযোগিতা-শেষে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সদস্যা ও সমিতির রাজ্য কোষাধ্যক্ষ মাননীয়া রীতা সেন বলেন, পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের দর্শন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করছে। ফলে, তাদের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। তারা বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। এই জায়গা থেকে তাদের ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সাথে অভিভাবকদেরও বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। সংকট নিরসনে তিনি অভিভাবক-শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মেলবন্ধনকে অনেক বেশি সুদৃঢ় করার আহ্বান জানান। সমিতির মহকুমা সম্পাদক কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য তাঁর স্বাগত ভাষণে আগামীদিনের সমাজকে সুখী ও সমৃদ্ধতর করার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্থ চেতনাসম্পন্ন হয়ে ওঠার জন্য সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার গুরুত্বের কথা বলেন। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন আগরপাড়া মহাজাতি বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক মানস মিশ্র। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমিতির মহকুমা সভাপতি অশোক ভৌমিক। সফল ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সমিতির নেতৃবৃন্দ।

বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগে প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্র-ছাত্রী ঃ

আবৃত্তি 'ক'
দেবজ্যোতি পাল—দমদম কিশোর ভারতী উচ্চ বিদ্যালয়।
আবৃত্তি 'খ'
সায়ন্তনী মিত্র—বরানগর রাজকুমারী মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল।
আবৃত্তি 'গ'
গোপা ব্যানার্জী—পানিহাটী বালিকা বিদ্যালয়।
আবৃত্তি 'ঘ'
সুচরিতা ঘোষ—বেলঘরিয়া মহাকালী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।
হিন্দি-আবৃত্তি 'ক'
সৌনাক ব্যানার্জী—ক্যালকাটা এয়ারপোর্ট ইংলিশ হাইস্কুল।
হিন্দি-আবৃত্তি 'খ'
শ্রেয়সী কুশারী—বেলঘরিয়া মহাকালী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।
সঙ্গীত 'ক'
মৌমিতা সরকার—বেলঘরিয়া মহাকালী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।
সঙ্গীত 'খ'
মৈত্রেয়ী ব্যানার্জী—বেলঘরিয়া মহাকালী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।
সঙ্গীত 'গ'
অদিতি মজুমদার-বেলঘরিয়া রথতলা মঙ্গলেশ্বর বিদ্যাপীঠ।
সঙ্গীত 'ঘ'
মনামি পাঠক—দমদম গার্লস হাইস্কুল।
গল্প বলা ঃ
আনন্দী দত্ত—আড়িয়াদহ সর্বমঙ্গলা বালিকা বিদ্যালয়।
গদ্যাংশ পাঠ ঃ কৌস্তুভ ঘটক—শান্তিনগর হাইস্কুল।
তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ঃ দীপ্ত দাশগুপ্ত—আগরপাড়া মহাজাতি বিদ্যাপীঠ।
বসে আঁকো ঃ সুমন্ত দে—বিরাটি মহাজাতি বিদ্যামন্দির (বালক)।
প্রবন্ধ (ছাত্র-ছাত্রী) ঃ রাজশ্রী গিরি—কল্যাণনগর বিদ্যাপীঠ ফর গার্লস।
প্রবন্ধ (শিক্ষাকর্মী) ঃ শম্ভুনাথ সাহা—বিরাটি মহাজাতি বালিকা বিদ্যামন্দির।
প্রবন্ধ (শিক্ষক-শিক্ষিকা) ঃ শাশ্বতী মণ্ডল—দক্ষিণেশ্বর শ্রীশ্রী সারদা দেবী বালিকা বিদ্যালয়।

ব্যারাকপুর (উত্তর) মহকুমা শাখার অন্তর্গত আঞ্চলিক শাখাগুলির পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

নোড়াপাড়া আঞ্চলিক শাখা

গত ৩১শে জুলাই নবাবগঞ্জ হাইস্কুলে নোয়াপাড়া আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন শাখার সহ-সভাপতি অমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সম্মেলনের উদ্বোধন করে জেলা শাখার সহ-সম্পাদক কাজল মজুমদার বলেন, সংঘ পরিবার চালিত বি জে পি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হলেও তাদের শাসনকালে শিক্ষাক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট সাম্প্রদায়িক বিষ-বীজ এখনও নির্মূল হয়নি। তাই এর বিরুদ্ধে বামপন্থী চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমাজকে সদাসতর্ক থাকতে হবে এবং প্রয়োজনে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সম্মেলনের প্রধান অতিথি জেলা সম্পাদক অমিয় মুখার্জী কেন্দ্রের বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, শ্রেণিস্বার্থে এই সরকার কখনও শ্রমজীবী মানুষের বন্ধু হয়ে উঠতে পারেনা। সুতরাং সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে সমাজ বদলের লড়াই-সংগ্রামকে অব্যাহত রাখতে হবে। মহকুমা সম্পাদক সুরঞ্জিত দেব ছাত্র-অভিভাবকসহ সর্বস্তরের মানুষের মনোভূমি দখলের অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন আঞ্চলিক সম্পাদক সুনির্মল বসু এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ যুগলকৃষ্ণ কুণ্ডু। ২২৪জন প্রতিনিধির মধ্যে ১১জন প্রতিবেদনের উপর বক্তব্য রাখেন। সমিতির জেলা ও মহকুমা শাখার পক্ষে গোপা ভট্টাচার্য্য, গৌরী চক্রবর্তী, শিবানী ভট্টাচার্য্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র সম্মেলনটি পরিচালনা করেন পঙ্কজ আচার্য, অমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও অমলকুমার ভট্টাচার্যকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।

জগদ্দল (দক্ষিণ) আঞ্চলিক শাখা

গত ৭ই আগস্ট শ্যামনগর ঋষি অরবিন্দ বালিকা বিদ্যালয়ে (অনিলা দেবী নগরে) 'তরুলতা আইচ' মঞ্চে জগদ্দল (দক্ষিণ) আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন আঞ্চলিক সভানেত্রী শিবানী ভট্টাচার্য্য। মহকুমা সম্পাদক সুরঞ্জিত দেব সম্মেলনের উদ্বোধন করে বলেন, কেন্দ্রের বর্তমান সরকার পূর্বতন সাম্প্রদায়িক এন ডি এ সরকারের সর্বনাশা শিক্ষানীতি সংস্কারের যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। জেলা শাখার দুই সহ-সম্পাদক সুজিত দাস ও কাজল মজুমদার তাঁদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে শিক্ষাক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ত আক্রমণ প্রতিরোধে বর্তমানে উদ্ভূত অনুকূল পরিবেশকে কাজে লাগানোর জন্য সদস্যদের সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। ২০৭ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন আঞ্চলিক সম্পাদিকা গৌরী চক্রবর্তী এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ জগদীশ মজুমদার। ১৩ জন প্রতিনিধি প্রতিবেদনের উপর বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন পরিচালনা করেন শিবানী ভট্টাচার্য্য, নির্মাল্য দাশগুপ্ত, বেণিমাধব সাহা ও অনল চ্যাটার্জীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সম্মেলনে উচ্চতর নেতৃত্বের পক্ষে জেলা শাখার সহ-সভাপতি বিমান দাস, মহকুমার সভানেত্রী গোপা ভট্টাচার্য্য, কোষাধ্যক্ষ পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নৈহাটী আঞ্চলিক শাখা

গত ২১শে আগস্ট পল্লীমঙ্গল হাইস্কুলে সমিতির নৈহাটি আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন শাখা সভাপতি হীতেন্দ্রনাথ রায়। সম্মেলনের উদ্বোধক জেলা শাখার সহ-সভাপতি বিমান দাস বলেন, শিক্ষাকে সার্বিক কলুষমুক্ত করতে হবে। জ্যোতিষশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের অভেদ কল্পনা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর হঠকারিতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ জারি রাখতে হবে। সম্মেলনে উপস্থিত ৩১৫ জন প্রতিনিধিকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মহকুমা সম্পাদক সুরঞ্জিত দেব। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সম্পাদক কৃষ্ণ চ্যাটার্জী এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করেন কোষাধ্যক্ষ আশিস্ কুমার সাহা। ১১ জন প্রতিনিধি প্রতিবেদনের উপর বক্তব্য রাখেন। সভা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন হীতেন্দ্রনাথ রায়, অরুণ চ্যাটার্জী, রেবতীমোহন আচার্য ও অলোক ঘোষ মজুমদারকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।

জগদ্দল (উত্তর) আঞ্চলিক শাখা

ভাট পাড়া হাইস্কুলে গত ২১শে আগস্ট জগদ্দল (উত্তর) আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন শাখার সভানেত্রী আল্পনা বিশ্বাসের সমিতির পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয়। জেলার শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের নেতা গৌরীশঙ্কর বসু মানুষের শিক্ষার অধিকারকে সমাজের দরিদ্রতম মানুষের মাঝে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে সমিতির সদস্যদের অধিকতর দায়বদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন আঞ্চলিক সম্পাদক বিজন মিত্র এবং আয়-ব্যয়ের হিসেব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ সুভাষ চৌধুরী। সম্মেলনে পঙ্কজ ভট্টাচার্য সহ মহকুমা ও জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আল্পনা বিশ্বাস, সুদক্ষিণা মুখার্জী, সুনীল জোয়ারদার ও ময়ূরদ্দিন আন্‌সারিকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলন পরিচালনা করেন।

বীজপুর আঞ্চলিক শাখা

হালিশহর লোকসংস্কৃতি ভবনে (প্রাণকৃষ্ণ কর নগর) 'কমরেড অনিলা দেবী' মঞ্চে গত ২১শে আগস্ট সমিতির বীজপুর আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শাখার সভাপতি পরেশ সাহা সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করে সমিতির জেলা সম্পাদক অমিয় মুখার্জী বলেন, দেশের সাম্প্রদায়িক-ফ্যাসিবাদী শক্তির নির্বাচনে পরাজয় ঘটলেও ওদের ফোঁসফাঁস এখনও শোনা যাচ্ছে। যে কোন সময় ফণা তুলে বিষ উগ্‌রে দেওয়ার দুরভিসন্ধি যাতে কার্যকর না হয়, সে জন্য ওদের বিষদাঁত ভেঙে দিতে দেশের মানুষের চেতনাকে অধিকতর শাণিতকরণে শিক্ষক সমাজকে গুরুদায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। ৩১৫ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন আঞ্চলিক সম্পাদক কাজল মজুমদার। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ সুশান্ত গুপ্ত। ১৩ জন প্রতিনিধি প্রতিবেদনের উপর বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনকক্ষে মহকুমা শাখার সহ-সম্পাদিকা গৌরী চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন পরিচালনা করেন পরেশ সাহা, গোপা ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণা বিশ্বাস ও তারক ঘোষকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।

জেলা শাখার অন্তর্গত আঞ্চলিক শাখাগুলির উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

বেলঘরিয়া আঞ্চলিক শাখা

গত ৮ই আগস্ট আড়িয়াদহ কালাচাঁদ হাইস্কুলে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির বেলঘরিয়া আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই

প্রতিযোগিতায় বেলঘরিয়া মহাকালী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং আড়িয়াদহ সর্বমঙ্গলা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ৫টি করে বিভাগে নৈপুণ্য প্রদর্শন করে প্রথম স্থান লাভ করে। বেলঘরিয়া হাইস্কুলের ছাত্ররা দু'টি বিভাগে প্রথম হয়। এছাড়া আড়িয়াদহ কালাচাঁদ হাইস্কুল, শ্রীশ্রী সরস্বতী বিদ্যালয় এবং বেলঘরিয়া রথতলা মঙ্গলেশ্বর বিদ্যাপীঠের ছাত্র-ছাত্রীরা ১টি করে বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করে। শিক্ষকদের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম হন শ্রীমতী শাশ্বতী মণ্ডল। প্রতিযোগিতা-শেষে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তথা সমিতির রাজ্যনেত্রী ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সদস্যা রীতা সেন সমিতির এই ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। ব্যারাকপুর (দক্ষিণ) মহকুমা শাখার সম্পাদক কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সহকারী জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সুকুমার দাস প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বেলঘরিয়া আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক মানস ব্যানার্জী বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, অভিভাবিকা সহ বিচারকমণ্ডলী ও অতিথিবর্গকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

দমদম আঞ্চলিক শাখা

গত ৭ই আগস্ট দমদম সুভাষনগর হাইস্কুলে দমদম আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে প্রতি বছরের মত এবছরও অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৫জন ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সদস্যদের উপস্থিতিও নগণ্য ছিলনা। এই প্রতিযোগিতাকে সফল করে তোলার ক্ষেত্রে দমদম সুভাষনগর হাইস্কুলের পরিচালন কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সহযোগিতার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সাংস্কৃতিক উপসমিতির আহ্বায়ক নারায়ণ চন্দ্র রায়। সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সমিতির নেতৃবৃন্দ। আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক তথা মহকুমার শাখার সহ-সভাপতি সমীর রায়চৌধুরী উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, বিশ্বায়নের হাত ধরে ভোগবাদের আগমণে সমাজের সর্বস্তরে যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, তা থেকে ছাত্রসমাজও মুক্ত থাকতে পারেনা। তারা আজ বেশিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে তাদের মুক্ত করতে আমাদের সমিতির এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম।

পানিহাটী আঞ্চলিক শাখা

গত ১৫ই আগস্ট সোদপুর হাইস্কুলে পানিহাটী আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নির্দিষ্ট সব বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগে মোট ১২৫জন ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার ফলাফলে ৪টি বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করে উষুমপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ফর গার্লস-এর ছাত্রীরা। ২টি করে বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করে আগরপাড়া মহাজাতি বিদ্যাপীঠ, উষুমপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, সোদপুর হাইস্কুল ফর গার্লস-এর ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। এছাড়া পানিহাটী বালিকা বিদ্যালয়, সোদপুর হাইস্কুল, আগরপাড়া নেতাজী শিক্ষায়তন ফর গার্লস-এর ছাত্রছাত্রীরা ১টি করে বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য নির্দিষ্ট প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করেন শ্রীমতী ইন্দিরা দত্তগুপ্ত। উল্লেখ্য, উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রতিটি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার প্রদান করা হয় ২১শে আগস্ট। সমিতির জেলা শাখার সহ-সম্পাদক সুজিত দাস, মহকুমা সম্পাদক কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সহ মানস ব্যানার্জী, অসিত দাস, মানস মিশ্র, জহর চক্রবর্তী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বাবুলকুমার চৌধুরী।

উত্তর দমদম আঞ্চলিক শাখা

বিরাটি বালিকা বিদ্যালয়ে গত ১৪ই আগস্ট সমিতির উত্তর দমদম আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অঞ্চলের অন্তর্গত বিদ্যালয়গুলি থেকে মোট ১১০জন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এদের মধ্যে খলিসাকোটা আদর্শ হাইস্কুল ফর গার্লস, বিরাটি বিদ্যালয় (বালিকা) এবং নিমতা জীবনতোষ ঘোষ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। প্রথমোক্ত বিদ্যালয়টির ছাত্রীরা ৪টি বিভাগে এবং শেষোক্ত দুটি স্কুলের ছাত্রীরা ৩টি করে বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করে। এছাড়া উদয়পুর হরদয়াল নাগ আদর্শ বিদ্যালয় (বালক) এবং মহাজাতি বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা ১টি করে বিভাগে প্রথম হয়। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় শিক্ষাকর্মী বিভাগে প্রথম হন মহাজাতি বিদ্যামন্দির (বালিকা)-এর শম্ভু সাহা। প্রতিযোগিতা-শেষে আয়োজিত পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অসিতরঞ্জন চক্রবর্তী, নির্মল গোস্বামী ছাড়াও কল্পনা কুণ্ডু, তাপস দাস, সুশীল মুখার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমিতির আঞ্চলিক শাখার সভাপতি অমর ব্যানার্জী।

উত্তর দিনাজপুর

রায়গঞ্জ আঞ্চলিক শাখার
৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

গত ২৯শে আগস্ট রায়গঞ্জ আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন রায়গঞ্জ মোহনবাটী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সমিতির পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ। জেলা সম্পাদক কালীরঞ্জন চৌধুরী সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে পেশাগত আন্দোলন কর্মসূচির সাথে সাথে সমিতির সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করেন এবং সদস্যবন্ধুদের দেশের কঠিন-কঠোর পরিস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। বিদায়ী সম্পাদক রমেশ রায় তাঁর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সম্মেলনে পেশ করেন। তার উপর গঠনমূলক আলোচনা করেন উপস্থিত প্রতিনিধিগণ। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলার সহ-সভাপতি নৃপেন্দ্রমোহন সাহা এবং সহ-সম্পাদক সন্তোষকুমার সাহা। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে অন্যতম সদস্য বিজনবিহারী দাস অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সম্মেলন-কার্য পরিচালিত করেন এবং পরিশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

রায়গঞ্জ আঞ্চলিক শাখা আয়োজিত
সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

রায়গঞ্জ আঞ্চলিক শাখা আয়োজিত আন্তঃবিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা গত ২২শে আগস্ট রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন আঞ্চলিক শাখার সভাপতি চণ্ডী দাস মোসান এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন করোনেশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শুভেন্দু মুখার্জী। সকলের বক্তব্যদানের পর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। উপস্থিত সকলের ঐকান্তিক আগ্রহে এবং বিচারকমণ্ডলীর সুচারু পরিচালনায় প্রতিযোগিতাটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রতিযোগী ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের উপস্থিতি আশাব্যঞ্জক। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণের শেষে সভাপতি এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কোচবিহার

কোচবিহার সদর দক্ষিণ আঞ্চলিক শাখার
৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

কোচবিহার সদর দক্ষিণ আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ৭ই আগস্ট মোয়ামারী তত্ত্বনাথ বিদ্যাপীঠে। জেলা শাখার সভাপতি সমরেন্দ্রনাথ সাহা পতাকা উত্তোলন এবং শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্যদিয়ে সম্মেলনের প্রথম পর্বের কাজের সূচনা করেন। দ্বিতীয় পর্বের কাজের প্রথমেই শোক প্রস্তাব পাঠ করেন আঞ্চলিক শাখার সভাপতি কনকচন্দ্র মোহন্ত। মোয়ামারী তত্ত্বনাথ বিদ্যাপীঠ ইউনিটের সর্বাণী লাহার নেতৃত্বে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এই সম্মেলনে ১৮৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন সমরেন্দ্রনাথ সাহা। আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক সুজিত দাস সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নারায়ণ দে ও হরেন্দ্রনাথ সাহা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবেদনের উপর ১৩ জন সদস্য/সদস্যা আলোচনা করেন। জেলা সম্পাদক বকুল দত্ত ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অনুপম দত্ত সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন।

আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক জবাবী ভাষণ দেন এবং আগামী ১৯-২১শে নভেম্বর কোচবিহার শহরে যে সমিতির ৫ম ত্রি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে তাকে সফল করার আহ্বান জানান এবং মহকুমা সম্মেলনের প্রতিনিধিদের

নামের তালিকা ও ৮ জন কো-অপশনের নামের তালিকা প্রস্তাব আকারে পেশ করেন এবং সর্বসম্মতভাবে তা গৃহীত হয়। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে কনকচন্দ্র মোহন্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পুরুলিয়া

রঘুনাথপুর আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

রঘুনাথপুর আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন মঙ্গলদা ভরপুর নাথ জীউ উচ্চতর বিদ্যালয়ে গত ২৯শে আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্যদিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। সমিতির আঞ্চলিক শাখার সহ-সভাপতি অশোক দাস সমিতির পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। এছাড়া শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন মহকুমা সম্পাদক সমর প্রসাদ সিংদেও, নেতুড়িয়া অঞ্চল শাখার সম্পাদক ধরণীধর ব্যানার্জী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মঙ্গলদা ভরপুর নাথ জীউ উচ্চতর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সমিতির ওয়ার্কিং অ্যাণ্ড ফিনান্স কমিটির সদস্য তথা সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া। তিনি তাঁর বক্তব্যে চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে ভারতবাসীর পরিবর্তিত রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, সরকারের পরিবর্তনে নীতির পরিবর্তন হয় না। নীতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। অভিন্ন কর্মসূচির ভিত্তিতে সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা সরকার গঠিত হয়েছে। তাই ন্যূনতম কর্মসূচির বাইরে সরকারের যেকোন কাজের বিরুদ্ধে বামপন্থীরা লড়াই আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

এরপর অঞ্চল শাখার সম্পাদক সচ্চিদানন্দ মুখার্জী অঞ্চল শাখার পক্ষে খসড়া সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। সেই প্রতিবেদনের উপর মোট ১৯ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন। সম্মেলনের অন্য দুই প্রধান বক্তা জেলা সম্পাদক অনাথনাথ ব্যানার্জী ও মহকুমা সম্পাদক সমরপ্রসাদ সিংদেও তাঁদের বক্তব্যে রাজ্যের আর্থিক সঙ্কটজনিত কারণে কিভাবে সরকারের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত বকেয়া দাবিগুলি অপূরণীয় থেকে যাচ্ছে এবং শিক্ষার সম্প্রসারণ ব্যাহত হচ্ছে তার উল্লেখ করেন।

উদ্বোধক বাসুদেব আচারিয়া তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে অঞ্চল শাখার বিশালতার কারণে অঞ্চল শাখাটিকে ভেঙে দুটি অঞ্চল শাখা গঠনের ঘোষণা করেন। সেই অনুসারে সম্মেলনে উপস্থিত ১৯৭ জন সদস্যের উপস্থিতিতে আঞ্চলিক শাখাকে ভেঙে দুটি আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি থানা উত্তর আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি থানা উত্তর আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন গত ৮-ই আগস্ট কদমতলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন আঞ্চলিক শাখার সভাপতি রবীন্দ্রনাথ কুণ্ডু। এই সম্মেলনে আঞ্চলিক শাখার অন্তর্গত মোট ২১টি বিদ্যালয় ইউনিট থেকে মোট ১৮১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ দেন সমিতির জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য দ্বিগেন্দ্রনাথ সরকার। তিনি তাঁর ভাষণে বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে শিক্ষক সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা তুলে ধরেন। এরপর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক মানস চ্যাটার্জী। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও রাজ্যের পরিস্থিতির নিরিখে বিদ্যালয়ের

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বিগত তিন বছরের সাংগঠনিক কর্মসূচি এবং বিভিন্ন পেশাগত দাবী দাওয়ার একটি রূপরেখা তুলে ধরেন। এরপর সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর মোট ১৫জন সদস্য বক্তব্য পেশ করেন। এরপর সমিতির জেলা শাখার সম্পাদক মনোরঞ্জন ভদ্র বক্তব্য রাখেন। শ্রীভদ্র তাঁর ভাষণে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতিয়ার সর্বগ্রাসী বিশ্বায়নের কুফল সম্পর্কে সচেতন থাকতে বলেন এবং বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এরপর আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক তাঁর জবাবী ভাষণে সমিতির সদস্যদের আরো সংগঠনমুখী ও বিভিন্ন কর্মসূচিতে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি এরপর আসন্ন জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাখার পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের প্রতিনিধি সদস্যদের নামের তালিকা এবং নবগঠিত আঞ্চলিক কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা পেশ করেন। উপরিউক্ত সদস্যদের নামের তালিকা, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সভাপতি রবীন্দ্রনাথ কুণ্ডু।

রাজগঞ্জ আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির রাজগঞ্জ আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন গত ২২শে আগস্ট কাটাপুকুর সারদামণি উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সহ-সভাপতি শ্যামলচন্দ্র দে। শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পর সম্মেলনের কাজ শুরু করা হয়। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সম্পাদক প্রদীপ গাঙ্গুলী।

এরপর সম্মেলনের উদ্বোধন করেন জেলা কমিটির সদস্য সুকুমার চক্রবর্তী। তিনি তাঁর বক্তব্যে বিগত দিনের ইতিহাস তুলে ধরেন এবং বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন প্রদীপ গাঙ্গুলী। প্রতিবেদনের উপর ১০জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন।

প্রতিনিধিদের আলোচনায় বিভিন্ন বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়। ১) শিক্ষাকর্মী নিয়োগ ত্বরান্বিত করা, ২) প্যারা-টিচার নিয়োগ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা, ৩) বেতন প্রদানের তারিখ ঘোষণা করা, ৪) Work-Education শিক্ষকদের জন্য কর্মশালার ব্যবস্থা, ৫) Earn-Leave-এর ব্যবস্থা, ৬) ডি আই অফিসের কাজকর্মের ঢিলেমি ভাব দূর করা, ৭) বকেয়া ডি এ প্রাপ্তি (জুলাই-ডিসেম্বর ০৩), ৮) প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে Computer শিক্ষা চালু করা, ৯) Group-D-কর্মীদের জন্য বিশেষ ভাতা প্রদান করা। মূলত উপরিউক্ত বিষয়গুলির উপর প্রতিনিধিরা বক্তব্য পেশ করেন।

সম্পাদক বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে জবাবী ভাষণ দেন। সম্মেলনে মোট ৯১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। জবাবী ভাষণের পর সদর মহকুমা শাখার নেতৃত্ব সুনীল মল্লিক বক্তব্য পেশ করেন।

এরপর আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর রাজগঞ্জ মহেন্দ্রনাথ উচ্চতর বিদ্যালয়ে সদর মহকুমা সম্মেলনের প্যানেল পেশ করা হয়। আগামী তিন বছরের জন্য আঞ্চলিক শাখার প্রতিনিধিদের নামের তালিকা পেশ করা হয়। সমস্ত প্যানেল প্রতিনিধিদের সমর্থনে গৃহীত হয়।

আলিপুরদুয়ার পূর্বাঞ্চল শাখার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

গত ১৫ই আগস্ট আলিপুরদুয়ার পূর্বাঞ্চল শাখার উদ্যোগে মজিদখানা হাইস্কুলে বার্ষিক সাংস্কৃতিক

প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি গোপালচন্দ্র সাহা। বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন আলিপুরদুয়ার পূর্বাঞ্চল শাখার সম্পাদক অনন্তকুমার সাহা। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ১০৯ জন ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করে। অভিভাবক- অভিভাবকরা যথেষ্ট সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ২০০৪ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ৪৩ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে জলপাইগুড়ি জেলা শাখার সদস্য মিহির সূত্রধর এবং মহকুমা শাখার সদস্য মানিক সাহা উপস্থিত ছিলেন। মজিদখানা হাইস্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

জলপাইগুড়ি থানা দক্ষিণ আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

গত ৮ই আগষ্ট জলপাইগুড়ি হাইস্কুলে জলপাইগুড়ি থানা দক্ষিণ আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন শুরু হয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। পতাকা উত্তোলন করেন আঞ্চলিক শাখার স্থায়ী সভাপতি অসিত বিশ্বাস। শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন উপস্থিত উচ্চতর নেতৃত্ব, ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন এ বি পি টি এ-র প্রতিনিধি, আঞ্চলিক শাখার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ এবং আঞ্চলিক শাখার অন্তর্গত ২৮টি বিদ্যালয়ের সম্পাদক অথবা প্রতিনিধিবৃন্দ। সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধির সংখ্যা ১৬৯ জন।

এরপর সম্মেলনের মূলপর্ব শুরু হয়। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন আঞ্চলিক শাখার সহ-সম্পাদক অমর প্রসাদ চক্রবর্তী। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুকুরজান হাইস্কুলের তিনজন প্রতিনিধি। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী ভাষণে জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সহ-সভাপতি প্রশান্ত শিকদার 'সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই-সংগ্রাম এবং আমাদের দাবী-দাওয়া'র প্রেক্ষাপট অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে ব্যাখ্যা করেন। জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা কমিটির সহ-সভাপতি রমেন দাস ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের প্রতিনিধি মানবেন্দ্র দে'র সংক্ষিপ্ত কিন্তু হৃদয়গ্রাহী বক্তব্যের পর আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক ভাস্কর ভট্টাচার্য্য বিগত তিন বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব সহ সম্পাদকীয় প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ১৫ জন প্রতিনিধি। কয়েকজন নবাগত সদস্য এবং সদস্যা প্রথমবারের মত বক্তব্য রাখলেও তাঁদের বাগ্মিতার প্রভাবে করতালিতে মুখরিত হয় সম্মেলনকক্ষ। আশা করা যায়, আগামীদিনে এরাই হবেন সমিতির একনিষ্ঠ কর্মী।

সম্পাদকের জবাবী ভাষণ-শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির অন্যতম বর্ষীয়ান সদস্য অজিত ভট্টাচার্য্য। এরপর সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড প্রথামত শেষ হয় এবং সম্মেলনকক্ষ আরও একবার মুখরিত হয়ে উঠে 'সম্মেলন সফল হল' স্লোগানে।

শোক

প্রবাসে প্রয়াত হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ হুমায়ুন আজাদ

জয়েশ পেন ক্লাবের মিউনিখ শাখার আমন্ত্রণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ হুমায়ুন আজাদ

৭ই আগস্ট জার্মানিতে যান। বিখ্যাত জার্মান কবি হাইনরিশ হাইনেকে নিয়ে গবেষণার জন্য স্কলারশিপে এক বছর জার্মানিতে থাকার কথা ছিল তাঁর। গত ১০ই আগস্ট রাতে পেন ক্লাবে আয়োজিত জার্মান লেখক-কবিদের সঙ্গে একটি পার্টিতে যোগ দেন হুমায়ুন আজাদ। ঐদিন রাতে সুস্থ থাকলেও পরের দিন একটি অ্যাপার্টমেন্টের ঘরে বিছানায় ৫৭ বছর বয়সের এই অধ্যাপককে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সাহিত্যের সব ক'টি শাখায় — কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস — তাঁর ছিল অবাধ গতি। গত ফেব্রুয়ারি '০৪ মাসে বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর বই 'পাক সার জমিন সাফ বাদ'। এই গ্রন্থে তিনি পাকপন্থী মৌলবাদী আর ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়কার আলবদর, রাজাকারদের কথা লিখেছিলেন। রুষ্ট হয়েছিল মৌলবাদীরা। ২৭শে ফেব্রুয়ারি রাতে আজাদ যখন বইমেলা থেকে কাছেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তাঁর আবাসনে ফিরছিলেন, তখন সশস্ত্র মৌলবাদীদের আক্রমণে ভয়ঙ্করভাবে আহত হন এবং দীর্ঘ চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠেন।

মৌলবাদীদের শত্রু, সাহিত্যসেবী অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের মৃত্যুতে সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা কমরেড এম এ সঈদের জীবনাবসান

প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা, শ্রমিক সংগঠক কমরেড মীর আবদুস সঈদের জীবনাবসান হয়েছে গত ১৫ই আগস্ট।
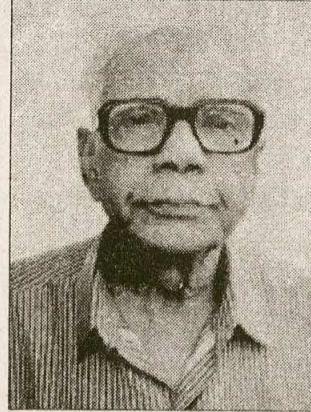
মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বৎসর। তিনি ১৯৩৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ অর্জন করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সংগঠক ছিলেন। নাবিকদের সংগঠন ফরওয়ার্ড সিমেন্স ইউনিয়নের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি চারবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। জিতেছিলেন দু'বার বাদুড়িয়া ও মহেশতলা থেকে। পাঁচের দশকেই আন্দোলন সংগঠন করার দায়ে জেলে যেতে হয়েছিল কমরেড সঈদকে। তাঁর মৃত্যুতে সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে ও তাঁর আপনজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নিমাইসাধন বসুর জীবনাবসান

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য নিমাইসাধন বসু গত ১৭ই আগস্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইতিহাসের কৃতী ছাত্র ডঃ নিমাইসাধন বসু ১৯৩১ সালে হাওড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। সেন্ট পল্‌স্ কলেজ থেকে স্নাতক হন, পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলেত যান। ১৯৫২ সালে বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ্ এ এল বেসামের অধীনে 'ভারতের ইতিহাস' নিয়ে গবেষণা করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পি এইচ ডি এবং পরবর্তী সময়ে ডি লিট ডিগ্রী পান। দেশে ফিরে শিক্ষকতা শুরু করেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৪-৮৯ পর্যন্ত উপাচার্যের দায়িত্ব পালন

করেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল : 'উনিশ শতক ও বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন', 'রেসিজম ইন বেঙ্গল', 'স্বামী বিবেকানন্দ', 'মা সারদা', 'দেশনয়ন সুভাষচন্দ্র' প্রভৃতি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগের আজীবন সদস্য ছিলেন। যুক্ত ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ভারতীয় যাদুঘরের সঙ্গে। কলকাতা হাইকোর্ট যে পাঁচজনের ইতিহাস অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছিল তিনি ছিলেন তার চেয়ারম্যান। কলকাতার জন্মদিন ২৪শে আগস্ট নয় — ওই কমিটি এই মর্মে সিদ্ধান্ত করে হাইকোর্টকে জানিয়ে দেয় এবং হাইকোর্ট তা মেনে নেয়।

তাঁর মৃত্যুতে সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডলের জীবনাবসান

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী, সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের বাংলা কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ভক্তিভূষণ মণ্ডল গত ৩০শে আগস্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর প্রয়াত মণ্ডল রাজ্য রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এক বর্ণময় রাজনৈতিক জীবনের অবসান হল। তিনি ছিলেন শ্রমজীবী মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু। বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও তিনি ছিলেন প্রথম সারির নেতা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী হিসাবে তিনি দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আইনমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৭ ও ১৯৮৭ সালে বামফ্রন্ট সরকারে তিনি মন্ত্রী ছিলেন। ছিলেন মৎস্য ও সমবায় দপ্তরের দায়িত্বে। ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষের পর দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির জন্য তিনি ভারত-চীন মৈত্রী সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন এই সংগঠনের সভাপতি। বীরভূমের দুবরাজপুর কেন্দ্র থেকে একাধিকবার বিধায়ক নির্বাচিত হন।

সমিতি তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী এ টি কাননের জীবনাবসান

বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী এ টি কানন গত ১২ই সেপ্টেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪

বছর। কিরানা ঘরানার প্রবাদপ্রতিম এই শিল্পী ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে কলকাতায় আসেন। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং না পড়ে গানের জগতেই নিমগ্ন হন। শৈশবে লাখনু বাপুরাও-এর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ১৯৪৪ সালে কলকাতায় আসেন। আর কর্ণাটকে ফিরে যান নি। বাংলার সঙ্গীত জগৎ ও সংস্কৃতির সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম দিকে গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, আমির খান সাহেবের সঙ্গে গানের জগতে প্রবেশ করেন। দীর্ঘ ২৭ বছর তিনি সঙ্গীত রিসার্চ আকাদেমির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। খেয়ালে তিনি সারা ভারতেই শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম ছিলেন। মেঘে ঢাকা তারা, বসন্ত বাহার, যদুভট্ট, মেঘমল্লার-এর মতো চলচ্চিত্রেও তিনি গান করেছেন। ১৯৯৫ সালে তিনি সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার পান। তাঁর মৃত্যুতে সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে ও তাঁর পরিবারবর্গ ও অন্যান্য স্বজনদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের নেতা কমরেড নরেন গুপ্ত প্রয়াত

গত ৬ই সেপ্টেম্বর ভোরে রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের নেতা কমরেড নরেন গুপ্তের জীবনাবসান হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলার অন্তর্গত শৌলাকর গ্রামে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। ১৯৩৫ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি কম পাশ করেন পরবর্তীকালে। সেই সময় থেকেই তিনি বামপন্থায় ক্রমশ আকৃষ্ট হতে থাকেন। বামপন্থী আন্দোলন-সংগ্রামে যুক্ত হতে থাকেন। ১৯৪৬ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি সমর্পিত প্রাণ। ১৯৪৮-৪৯ সালে রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক। ১৯৫৬ সালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠনের অন্যতম স্রষ্টাও ছিলেন তিনি। সরকারী কর্মচারীদের অসংগঠিত অংশের মধ্যে তিনি প্রথম থেকেই বহু সংগঠন গড়ে তোলেন। কর্মচারী আন্দোলনে তাঁর অবদান ভোলার নয়।

তিনি ছিলেন শ্রমিকশ্রেণির দর্শনে বিশ্বাসী, মতাদর্শগত সংগ্রামে সতত অবিচল, কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম রূপকার। সে কারণেই চাকুরী জীবনে বারংবার তাঁকে তৎকালীন শাসকশ্রেণির আক্রমণের শিকার হতে হয়েছিল।

আদর্শনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ কমরেড গুপ্তের জীবনাবসানে সমিতি এক সুহৃদকে হারাল, কর্মচারী সংগঠন হারাল তাঁদের প্রিয় নেতাকে। তাঁর মরদেহ কর্মচারী ভবনে নিয়ে আসা হলে সেখানে মালা দেন সমিতির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক অমল ব্যানার্জী। সঙ্গে ছিলেন অ্যাসোসিয়েট মেম্বার্স ইউনিটের সদস্যদ্বয় গোপাল পাল ও কপিলেশ্বর শর্মা।

তাঁর অম্লান স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর বিকাল সাড়ে পাঁচটায় ডিরোজিও হলে (প্রেসিডেন্সী কলেজ) স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে।

তাঁর মৃত্যুতে সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে ও তাঁর পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

নিন্দা/ধিক্কার

৫৮তম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে উগ্রপন্থী আক্রমণে আসাম ও জম্মু-কাশ্মীরে মৃত ১৭ স্কুল পড়ুয়া

দেশের ৫৮তম স্বাধীনতা দিবসে আসাম ও জম্মু-কাশ্মীরের উগ্রপন্থীরা কেড়ে নিল ১৭টি শিশুর প্রাণ। এরা বেশিরভাগই স্কুলের ছাত্র। জখম হয়েছেন আরও ৫৪জন। এদিন আসামের ধেমাজি শহরে স্বাধীনতা দিবসের সরকারী অনুষ্ঠানেই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আলফা উগ্রপন্থীরা খুন করল অন্তত ১৭জন স্কুল ছাত্রকে। জম্মু-কাশ্মীরে ডাঙ্গিওয়াটিতে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে গ্রেনেড ছুঁড়ে ১৪জনকে গুরুতরভাবে জখম করেছে উগ্রপন্থীরা। বারমূলায় একটি স্কুলবাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালায় উগ্রপন্থীরা।

সমিতি উগ্রপন্থীদের আক্রমণে নিহত ছাত্রদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

দক্ষিণ রাশিয়ার বেসলান শহরের স্কুলে ভয়াবহ জঙ্গী হানা, মৃত শিশু ও মহিলা সহ ৩২২

চেচেনিয়াকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার দাবিতে চেচেন জঙ্গীরা গত এক দশক ধরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাচ্ছে। রাশিয়া এই স্বাধীনতা দিতে নারাজ। রুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ নির্মূল করার লক্ষ্যে অটল। প্রায়শই চেচেন জঙ্গীদের সঙ্গে রুশ বাহিনীর রক্তাক্ত সংঘর্ষ হয়। কিন্তু বেসলান শহরের স্কুলে চেচেন জঙ্গীরা যে হত্যালীলা চালিয়েছে তা নজিরবিহীন। তারা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের পণবন্দী করে রেখেছিল ৫৪ ঘন্টা গত ২রা সেপ্টেম্বর থেকে। রাশিয়ার কমাণ্ডোরা শেষপর্যন্ত ৪ঠা সেপ্টেম্বর তাদের উদ্ধার করল দীর্ঘক্ষণ রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর। মারা গেছে ১৫৫টি শিশু সহ ৩২২জন। শিশুদের ওপরে জঙ্গীরা যে অমানবিক নৃশংস আচরণ করেছে তাকে নিন্দা করার ভাষা আমাদের জানা নেই।

এই ঘটনায় সমিতি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং এই হত্যালীলাকে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলে মনে করছে। সমিতি মৃত শিশুদের পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে। সমবেদনা জানাচ্ছে অন্যান্য মৃতদের আত্মীয়স্বজনকে। সমিতি অপরাধীদের কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছে।

ঢাকায় মৌলবাদী আক্রমণে নিহত ১৯ শেখ হাসিনার কোনক্রমে জীবন রক্ষা

গত ২১শে আগস্ট ঢাকায় আওয়ামি লিগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার জনসভায় মৌলবাদীদের গ্রেনেড, বোমা ও গুলিবর্ষণে ১৯জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৫০৬। এই হামলায় গুরুতরভাবে আহত হন মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা নেত্রী আইভি রহমান। তাঁর দুটি পা বাদ দিতে হয়। পরে তিনি ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মারা যান। এই আক্রমণের প্রতিবাদে সারা বাংলাদেশে ধর্মঘট পালিত হয়েছে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী সহ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কার্যকলাপ বাড়া সত্ত্বেও এবং তাঁরা প্রকাশ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অচল করার হুমকি দিলেও তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। সাম্রাজ্যবাদী মদতপুষ্ট মৌলবাদী-প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বাংলাদেশে সক্রিয়। গণতন্ত্রকে হত্যার চেষ্টা করা হচ্ছে বাংলাদেশে।

সমিতি বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামি লিগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টার এবং রাজনৈতিক গণহত্যার তীব্র নিন্দা করছে ও ধিক্কার জানাচ্ছে। সমিতি এই আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি করছে। দাবি করছে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি নিশ্চিত করার।

সমিতি গেরিলানেত্রী আইভি রহমান ও অন্যান্যদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁদের পরিবারবর্গ ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

•

মালদহ জেলার মিলনগড় সিনিয়র মাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আবু সাখরুল ইসলাম গত ১৩ই জুলাই প্রয়াত হয়েছেন। কর্মজীবনে তিনি সমিতির সদস্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে সমিতি শোকাহত। তাঁর প্রিয় পরিজনদের সমিতি সমবেদনা জানাচ্ছে।

•

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার রানিয়া কৃষ্ণদাস বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা প্রীতিকণা সরকার দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে সম্প্রতি প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৩ বছর। তিনি সমিতির সক্রিয় সদস্যা ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে সমিতি শোকস্তব্ধ। তাঁর নিকটাত্মীয়দের সমিতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

•

কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা মহকুমার অন্তর্গত শিকারপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক হরিয়ানন্দ সাহা গত ২২শে জুলাই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি আমৃত্যু সমিতির সদস্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে সমিতি শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

•

সমিতির অর্থ ও কর্মপরিষদের প্রাক্তন সদস্যা এবং বীরভূম জেলা শাখার প্রাক্তন সম্পাদক পারুল রায়চৌধুরী গত ১৪ই সেপ্টেম্বর ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে সমিতি শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

শ্রমিকশ্রেণি সহ জনগণের সকল অংশের মানুষের স্বার্থ রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলুন

গণসংগঠনগুলির জাতীয় মঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ শাখার আবেদন

বন্ধুগণ,

বিগত কয়েক বছর ধরে কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত বি জে পি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ-জোট সরকার একদিকে ধর্মীয় উন্মাদনা ও সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার করে শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে ঐক্য ধ্বংসের প্রচেষ্টার পাশাপাশি বহুজাতিক ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নির্দেশিত বিশ্বায়ন ও নয়া-উদারীকরণ নীতি সহ বেপরোয়াভাবে বেসরকারীকরণ নীতি প্রয়োগ করে চলেছিল। ধর্মঘটের অধিকার সহ শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকার সমূহের ওপর আক্রমণ সংঘটিত হচ্ছিল। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য সহ দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে জনজীবনে অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। বি জে পি-জোট সরকারের অনুসৃত নীতিগুলির বিরুদ্ধে গত লোকসভা নির্বাচনে দেশের মানুষ রায় দিয়েছেন। কেন্দ্রে কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা' সরকার গঠিত হয়েছে। সংসদে বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। বলা যায় ইউ পি এ-সরকার বামপন্থীদের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল। এই সরকার একটি ন্যূনতম কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যার মধ্যে কিছু জনকল্যাণকর কাজের কথা বলা হয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। একইসাথে এই সরকার পূর্বতন আর্থিক সংস্কার নীতির প্রয়োগ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেছে। বস্তুতপক্ষে গত বাজেটে বিভিন্ন যে প্রস্তাবসমূহ পেশ করা হয়েছে তা দেশের মানুষকে নিরাশ করেছে। বিশেষ করে টেলিকম, অসামরিক বিমান পরিবহণ, বীমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুদের হার হ্রাস, পেট্রোপণ্যের দু'বার মূল্যবৃদ্ধি, পরিষেবা করের সম্প্রসারণ ইত্যাদি সিদ্ধান্তের ফলে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ আর্থিক দিক দিয়ে আক্রান্ত হবেন। বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ পর্যালোচনার কথা বলা হয়েছে কিন্তু সেই কাজ চলছে ধীরগতিতে। এদিকে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ফতোয়ায় ইতিমধ্যেই বিদ্যুতের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে শূন্যপদ পূরণ হচ্ছে না, শূন্যপদ অবলুপ্ত হচ্ছে। দপ্তর তুলে দেওয়া হয়েছে, সংকুচিত হয়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ, স্বল্প সঞ্চয়ের কাজ ডাকঘর ছাড়া অন্যত্র দিলে রাজ্যগুলির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। ক্ষুণ্ণ হবে ডাকঘরের অস্তিত্ব, বিঘ্নিত হবে সাধারণ মানুষের সঞ্চিত অর্থের নিরাপত্তা। রুগ্‌ণ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলি পুনরুজ্জীবনের কথা বলা হলেও এক্ষেত্রে সরকার দিশাহীন। শ্রমিকশ্রেণির অর্জিত অধিকারগুলি আক্রান্ত হচ্ছে। আমাদের দেশের নারী সমাজ আজও সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার। অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি বিশেষ করে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জলের সংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগ আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রয়োজন গণবন্টন ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন। সর্বোপরি, দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম ভূমিসংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ ও রূপায়ণের দাবিসহ শ্রমজীবী জনগণের জরুরী দাবিগুলির ভিত্তিতে সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারী, কৃষক, ছাত্র, যুব, মহিলা সহ দলমত নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রয়োজন।

জাতীয় জীবনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজনে নিম্নলিখিত দাবিগুলির ভিত্তিতে আগামী সেপ্টেম্বর মাসব্যাপী যুক্তভাবে ধারাবাহিক প্রচারাভিযান চালাবার পর আগামী ১লা অক্টোবর, ২০০৪ তারিখে কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে বেলা ২-৩০ মিনিটে এক কেন্দ্রীয় সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত সমাবেশে হাজারে হাজারে মিছিলসহ যোগদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের মেহনতী মানুষের নিকট আহ্বান জানাচ্ছি।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০০৪ **নিবেদক —**

১. সি আই টি ইউ
২. এ আই টি ইউ সি

৩. ইউ টি ইউ সি
৪. টি ইউ সি সি
৫. এইচ এম এস
৬. ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী)
৭. ১২ই জুলাই কমিটি
৮. রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি
৯. কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক-কর্মচারী সমিতিসমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটি
১০. জয়েন্ট কাউন্সিল
১১. জে পি এ
১২. ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন
১৩. বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি
১৪. কলকাতা ডিভিসন জীবন বীমা কর্মচারী সমিতি
১৫. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সাধারণ বীমা কর্মচারী সমিতি
১৬. ইস্টার্ন জোন জেনারেল ইনসুরেন্স কর্মচারী ইউনিয়ন
১৭. জীবন বীমা কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন
১৮. ইউনাইটেড মুভমেন্ট কমিটি অফ রেল ডিফেন্স
১৯. মার্কেনটাইল ফেডারেশন
২০. এ আই ডি ই এফ
২১. নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি
২২. নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি
২৩. পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতি
২৪. বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি
২৫. বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি
২৬. পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘ
২৭. প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ
২৮. সারা বাংলা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি
২৯. সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি
৩০. পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভা (হরেকৃষ্ণ কোঙার স্মৃতি ভবন)
৩১. পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভা (২০৮, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট)
৩২. সংযুক্ত কিষাণ সভা
৩৩. অগ্রগামী কিষাণ সভা
৩৪. এ আই কে কে এম এস
৩৫. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খেতমজুর ইউনিয়ন
৩৬. পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি
৩৭. পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি
৩৮. নিখিলবঙ্গ মহিলা সঙ্ঘ
৩৯. অগ্রগামী মহিলা সমিতি
৪০. এ আই এম এস এস
৪১. ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন
৪২. নিখিল ভারত যুব ফেডারেশন
৪৩. যুবলীগ
৪৪. বিপ্লবী যুবফ্রন্ট
৪৫. এ আই ডি ওয়াই ও
৪৬. ভারতের ছাত্র ফেডারেশন
৪৭. নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন
৪৮. ছাত্রব্লক
৪৯. পি এস ইউ
৫০. এ আই ডি এস ও

দাবিসমূহ

(১) বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার চুক্তির অন্তর্ভুক্ত শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, শিক্ষা, ওষুধ, পরিষেবা, প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে জনবিরোধী ধারাগুলি পরিবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। (২) ভূমিসংস্কারের কর্মসূচি নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্য সরকারগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে, জমির ঊর্ধ্বসীমা কমাতে হবে এবং উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন ও গরিব কৃষকদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। (৩) ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত— ★ কর্মস্থান নিশ্চিত করার জন্য আইন প্রণয়ন। ★ গ্রাম ও শহরে দরিদ্র পরিবারের অন্তত একজনকে বছরে ১০০ দিনের কাজের ব্যবস্থার আইন প্রণয়ন। ★ কৃষিক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও স্বল্প সুদে কৃষকদের ঋণের সুযোগ প্রদান। ★ গণ-বন্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, আদিবাসী পশ্চাদ্‌পদ এলাকা সহ গরিব মানুষদের জন্য গণ-বন্টন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। (৪) আদিবাসীদের অরণ্য থেকে উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে। (৫) পেট্রল, ডিজেল, কেরোসিন, রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ানো চলবে না, প্রয়োজনে আরও শুল্ক কমাতে হবে। (৬) কাজের অধিকারকে সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। (৭) কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলিতে অবলুপ্ত পদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা, শূন্যপদে নিয়োগ ও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলিকে যথাযথভাবে রূপায়িত করতে হবে। কোনো সরকারী দপ্তর বন্ধ করা চলবে না। (৮) শিক্ষাক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক ও সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধিপ্রসূত পাঠক্রম বাতিল করতে হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিচালন কমিটি/পরামর্শদাতা কমিটিতে মনোনীত আর এস এস মতাদর্শী

ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী ব্যক্তিদের অপসারণ করতে হবে। (৯) ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত শিক্ষা ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালন ব্যবস্থা সহ ছাত্র-বেতন কাঠামোর উপর যাতে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকে, কেন্দ্রীয় সরকারকে এমনভাবে আইন প্রণয়ন করতে হবে। (১০) শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা বাণিজ্যিকীকরণ রোধের লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে জি ডি পি'র ছয় শতাংশ ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে শতকরা তিন শতাংশ বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। (১১) ১৯৪৮ সালের বিদ্যুৎ আইন পুনঃপ্রবর্তন সহ বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর জনবিরোধী ধারাগুলি বাতিল করতে হবে। (১২) পাটচাষীরা যাতে ন্যায্য দামে পাট বিক্রয় করতে পারে তার জন্য জুট কর্পোরেশনকে সক্রিয় করতে হবে এবং কাঁচাপাট কেনার জন্য অর্থ জোগানের ব্যবস্থা করতে হবে। (১৩) ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টের রায় বাতিল করতে এবং ধর্মঘটের অধিকার সুরক্ষিত করতে কেন্দ্রকে আইন প্রণয়ন করতে হবে। (১৪) টেলিকম, বীমা, ব্যাঙ্ক, এন টি পি সি, অসামরিক বিমান পরিবহণ সহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিদেশী ও বেসরকারী বিনিয়োগের সীমা বৃদ্ধি করা চলবে না। দিল্লি ও মুম্বাই সহ বিমান ক্ষেত্রগুলিকে বেসরকারীকরণ করা চলবে না। (১৫) ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সংরক্ষিত ৮৫টি পণ্যকে ক্ষুদ্র শিল্পের আওতা বহির্ভূত করার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। (১৬) লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিকে অবিলম্বে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। (১৭) স্বল্প সঞ্চয়ে সুদের হার ন্যায়সংগতভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। জি পি এফ এবং ই পি এফ-এর সুদের হার ১২ শতাংশ করতে হবে। (১৮) অসংগঠিত ক্ষেত্র ও গৃহভিত্তিক কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ একটি সুসংহত আইন প্রণয়ন করতে হবে। এদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করতে হবে। (১৯) সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে মহিলাদের সমান অধিকার সুনিশ্চিত করতে আইন প্রণয়ন করতে হবে। সমান কাজে সমান মজুরি দিতে হবে। (২০) অবিলম্বে সংসদে ১/৩ অংশ মহিলা আসন সংরক্ষণ বিল পাশ করতে হবে। (২১) গণমাধ্যমে অশ্লীলতা প্রচার বন্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২২) রাজ্যের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের স্বার্থে রেল সম্প্রসারণ, নদীভাঙন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও উপকূল উন্নয়ন সহ কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির দ্রুত বাস্তবায়ন ও নূতন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

অর্থমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে সাধারণ সম্পাদকের চিঠি

মাননীয়
শ্রীঅসীম দাশগুপ্ত
অর্থমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মাননীয়
শ্রীকান্তি বিশ্বাস
বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিষয় : শারদোৎসব ও ঈদ উৎসবের পূর্বে সেপ্টেম্বর, ২০০৪ মাসের বেতন ও বোনাস অক্টোবর মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পাবার আবেদন

মহাশয়,

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সেপ্টেম্বর'০৪ মাসের বেতন অক্টোবর মাসের ১০ তারিখের মধ্যে যাতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের হাতে পৌঁছে যায় সেই বিষয়ে আপনার হস্তক্ষেপ চাইছি। কারণ বর্তমানে চালু নিয়ম অনুসারে এই বেতন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের হাতে পৌঁছাতে পরবর্তী মাসের ২৪/২৫ তারিখ হয়ে যায়। এই বছর পূজো শুরু হচ্ছে ২০শে অক্টোবর এবং তার অল্প কিছুদিন পরেই ঈদ উৎসব। বিদ্যালয়গুলি ১৭ই অক্টোবর হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে।

অতএব মহাশয়ের কাছে আবেদন এই মাসে অন্তত চলতি নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের হাতে বেতন ও বোনাসের অর্থ যাতে ১০ই অক্টোবরের মধ্যে পৌঁছে যায় সেই বিষয়ে আপনার সহৃদয় হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করি। উল্লেখ্য যে বিগত বছরেও এই ধরনের পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।

ধন্যবাদ সহ,

তারিখ : ১৪.০৯.২০০৪

অমল ব্যানার্জী
সাধারণ সম্পাদক
নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

বাংলাভাষা ও ভারতের সংবিধান

নীতীশ বিশ্বাস

একটি ঐকতান নিবেদন

ঐকতান ঃ ডি.এল.২২৪ডি, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১

একটি 'সহমর্মী' সহযোগী প্রকাশন ☐ মূল্য ঃ ২৫ টাকা

'বাংলাভাষা ও ভারতের সংবিধান' গ্রন্থটির লেখক নীতীশ বিশ্বাস বাংলাভাষা গবেষক এবং বাংলার বাইরে বাঙালি সহায়ক সমিতি 'সহমর্মী-র সম্পাদক। সারা ভারতে মাতৃভাষা, বাংলাভাষার সাংবিধানিক অধিকার ও ভারতের দ্বিতীয় প্রধান ভাষার মর্যাদার জন্য যাঁরা লড়াই করছেন এমন সব সংগঠন, পত্র-পত্রিকা ও ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে। বইটির অবতরণিকা লিখেছেন শ্রদ্ধেয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস। বর্তমানে মোট ২২টি ভাষা সংবিধান নির্দিষ্ট তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সংবিধানে এখনও স্বীকৃতি পায় নি এমন অনেক ভাষা আছে। নীতীশ বিশ্বাস-লিখিত মূল নিবন্ধটির শিরোনাম "সংবিধানের প্রেক্ষাপটে ভারতের বাংলাভাষা"। এই প্রবন্ধে লেখক লিখেছেন যে, সোভিয়েত ধ্বংসের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যে সব কারণ ছিল তার সঙ্গে অভ্যন্তরীণ দু'টি মুখ্য বিষয় যুক্ত হয়ে পড়েছিলো। এক, জনজাতিগুলির বিকাশে অবহেলা ; দুই, অন্যান্য ভাষাগুলির ওপর রুশ ভাষার প্রবল প্রাধান্য। কংগ্রেসী শাসনকালে কিভাবে বাংলাভাষাকে পশ্চিমবঙ্গে অবহেলা করা হয়েছে তার বিবরণ এই গ্রন্থে বিধৃত। লেখকের প্রশ্ন "কেন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কেবলমাত্র হিন্দিতেই পড়াবে? — এ কি ধরনের মাৎস্য-ন্যায়?" লেখক স্পষ্ট করেই লিখেছেন, "ভাষা সংখ্যালঘু হিসাবে উর্দু, হিন্দী, ইংরেজী ভাষাভাষীরা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাভাষীরা শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহজে যে সুযোগ পান, তা ভারতের কোনো রাজ্যে নেই। কিন্তু থাকা উচিত।" কেন থাকা উচিত তা বোঝাতে লেখক সংবিধানের ২৯,৩০,৩৪৭,৩৫০ ধারার উল্লেখ করেছেন। লেখক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন বাংলাভাষাকে দুর্বল করতে সংগঠিত চক্রান্তকে ১৯৯১ সালে সেন্সাস বিভাগ যে তালিকা প্রকাশ করলো তাতে মৈথিলি ভাষার উল্লেখমাত্র নেই। অন্যদিকে ওদের হিসাবে সারা ভারতে বাংলার (উপভাষাও নয় বি-ভাষা) একটি আঞ্চলিক ভাষা কামতাপুরীকে রাজবংশী ভাষা হিসাবে উল্লেখ করে আলাদা বিভাগ করলো। যার মোট জনসংখ্যা সর্ব হিসাবে ৩৪ হাজার ১০৬ জন। এতে দু'টি চক্রান্ত সফল হল ঃ (১) বাংলাভাষাকে দুর্বল করতে, তার জনসংখ্যা কমানো এবং বাংলার মধ্যে বিরোধকে উস্‌কে দেওয়ার কাজ করলো। (২) মৈথিলি সহ যে ৪৭টি ভাষা গিলে নিলো তা যাতে লোকচক্ষুর সামনে না আসে তাকে রিপোর্ট থেকে ব্ল্যাকআউট করল। (২২.১২.০৩-এ মৈথিলি অষ্টম তপসিলে স্থান পেল) পরিশিষ্ট-৯-এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পলিটব্যুরো সদস্য প্রকাশ কারাতের ভারতের আদর্শ ভাষানীতি প্রসঙ্গে মন্তব্য আছে। প্রকাশ কারাতের বক্তব্যের মূল কথা হল ঃ "ভাষাভিত্তিক রাজ্যগুলিকে ভাঙলে রাজ্যগুলি দুর্বল হয়ে পড়বে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে রাজ্যের অধিকারগুলি গুরুত্ব হারাবে। কারণ আমাদের যাবতীয় অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে। এক্ষেত্রে ছোট রাজ্যগুলিকে আরও বেশী করে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। আমরা চাই বহু ভাষাভাষী এদেশে মূল সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য।" পরিশিষ্ট ১১-তে ভারতে বাংলাভাষীদের অধিকার সংক্রান্ত সরকারী বিভিন্ন চুক্তি ও নির্দেশনামা আছে। শুধু বাংলাভাষা নয়, সকল মাতৃভাষার বিকাশ সাধনে আগ্রহী লেখক। এই গ্রন্থ মাতৃভাষা রক্ষা আন্দোলনের কর্মীদের প্রেরণা যোগাবে। ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা সহ মাতৃভাষা পড়ার অধিকার দেবার দাবী জানিয়ে 'সহমর্মী' যে পত্র দেয় তা এই গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। তথ্যসমৃদ্ধ এই বইটি পাঠকপ্রিয় হোক। বিশ্বায়নী ফাঁদে পড়ে সারা বিশ্বেই মাতৃভাষাগুলি আজ বিপন্ন। সেই সময়ে এই গ্রন্থটি লিখে লেখক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

— **শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়**
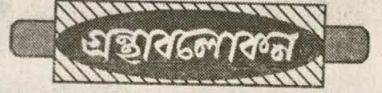
বিদ্যাসাগর ভাবনা

সম্পাদনা ঃ সুদিন চট্টোপাধ্যায়, লক্ষ্মণ কর্মকার এবং অশোক পাল

দীপ প্রকাশন ❒ কলকাতা-৭০০ ০০৬ ❒ মূল্য ঃ ৮০ টাকা

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'সৃজন'-এর উদ্যোগে প্রকাশিত 'বিদ্যাসাগর ভাবনা' গ্রন্থটি স্পর্ধিত ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রয়াসের মূল্যায়ন। এই সংকলন গ্রন্থটিতে বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত মূল্যায়ন ও ভাবনা তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম পর্যায় ঃ সেকালের ভাবনায় বিদ্যাসাগর। এই পর্যায়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিহারীলাল সরকার, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুচরণ বিদ্যারত্ন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শিবনাথ শাস্ত্রী ও মানকুমারী বসুর প্রবন্ধ সন্নিবেশিত। দ্বিতীয় পর্যায় ঃ চরিতাভিধানে বিদ্যাসাগর। এই পর্যায়ে দুটি চরিতাভিধান-এর উল্লেখ আছে ঃ সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান এবং বাংলা আকাদেমী চরিতাভিধানে বাংলাদেশ। তৃতীয় পর্যায় ঃ একালের ভাবনায় বিদ্যাসাগর। এই পর্যায়ে যাঁদের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাঁরা হলেন ঃ বিমান বসু, আজাহারউদ্দিন খান, প্রণব রায়, মোহম্মদ আবদুল। গ্রন্থের তিন সম্পাদক স্বপন পাল, মিলনেন্দু জানা ও আশিস সান্যাল। এই বিদ্যাসাগরকে লেখা মাইকেল মধুসূদন দত্তের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। তারিখ ২ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪। অত্যন্ত অর্থকষ্টের মধ্যে পড়ে মধুসূদন ফ্রান্সের ভার্সাই থেকে বিদ্যাসাগরের কাছে সাহায্যের হাত বাড়াতে অনুরোধ জানান। বিদ্যাসাগর আর্থিক সাহায্য পাঠালে মধুসূদন অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদ্যাসাগরকে এই চিঠি লেখেন। মধুসূদন লিখছেন ঃ "I suppose the Rs.1000 sent by you is the money I had in the Alipore Court. I can not sufficiently thanks you for the draft on the French Bank. Am I not for right in thinking that you have the heart of a Bengali?" গ্রন্থের শেষে আছে বিদ্যাসাগরের জীবনপঞ্জী ও বিদ্যাসাগরের বংশলতিকা। গ্রন্থটির মুখবন্ধ লিখেছেন শ্রদ্ধেয় বিমান বসু। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে নবসাক্ষরদের উদ্দেশে। বিদ্যাসাগর-এর প্রাসঙ্গিকতা আজও অম্লান। দেশাচারের দুর্গকে নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন যিনি সেই বিদ্যাসাগরকে জানা এবং জানানো খুবই জরুরী। স্বাধীনতার ৫৭ বছর পরে আজও জাতপাতের লড়াই, বর্ণবৈষম্য অব্যাহত আমাদের দেশে। মধ্যযুগীয় বর্বরতা আজও বিদ্যমান। সতীদাহ আজও হয়। সুতরাং বিদ্যাসাগর আজও প্রাসঙ্গিক। "আচারের যে প্রাণহীন পাথর দেশের চিত্তকে পিষে মেরেছে, রক্তপাত করেছে, নারীকে পীড়া দিচ্ছে সেই পাথরকে দেবতা বলে মানেন নি (তিনি), তাকে আঘাত করেছেন" — লিখেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মোহম্মদ আবদুল হাই লিখেছেন ঃ "উনবিংশ শতাব্দীতেও 'অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে' তাঁর একক জীবনকে যিনি প্রবাহিত করেছিলেন, তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।" মানবজাতির পয়লা নম্বর দুশমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-পোষিত বিশ্বায়নী বদমাইসিতে মনুষ্যত্ব যখন সারা বিশ্বেই বিপন্ন তখন মনুষ্যত্বের মহিমায় উজ্জ্বল বিদ্যাসাগরকে জানানোর দায়বদ্ধতা থেকে বুদ্ধিজীবী সমাজ দূরে থাকতে পারেন না। সেই দায়বদ্ধতাই পালন করেছেন সম্পাদক সুদিন চট্টোপাধ্যায়, লক্ষ্মণ কর্মকার ও অশোক পাল। তাঁরা ধন্যবাদার্হ। এই গ্রন্থ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও বুদ্ধিজীবী সমাজে যে সমাদৃত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

— **শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়**

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

৭৭/২, পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

বিজ্ঞপ্তি

পর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যালয় প্রধানদের জানানো যাচ্ছে যে, মুদ্রণসংক্রান্ত ত্রুটির কারণে ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষে নবম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন ফর্মে নির্দেশিকায় মহম্মদ (Md.) কথাটি ভুলবশতঃ সম্মানসূচক শব্দতালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের অ্যাডমিশন রেজিস্টারে যে সব ছাত্রের নামের পূর্বে মহম্মদ আছে তাদের নামের পূর্বে রেজিস্ট্রেশন ফর্মে মহম্মদ কথাটি অবশ্যই লিখতে হবে।

গোপা বসু (দত্ত)
উপসচিব (পরীক্ষা)

যথোপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণ ও অবগতির জন্য —

(ক) সচিব, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
(খ) বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
(গ) সকল জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক শিক্ষা), পশ্চিমবঙ্গ।
(ঘ) পশ্চিমবঙ্গের সকল শিক্ষক সংগঠন।
(ঙ) উপসচিব (নথি), পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।
(চ) পর্ষদের উপসচিব (শিক্ষা), পরবর্তী পর্ষদবার্তা সংখ্যায় মুদ্রণের জন্য।
(ছ) সমস্ত আঞ্চলিক আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।
(জ) সম্মানীয় পর্ষদ সদস্যবৃন্দ, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

তারিখ : ১৩.৯.২০০৪

গোপা বসু (দত্ত)
উপসচিব (পরীক্ষা)

লেখকদের প্রতি অনুরোধ

- ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে।
- লেখার 'কপি' রেখে লেখা পাঠাবেন। কোন লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- জেরক্স কপি পাঠাবেন না। জেরক্স কপি প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।
- সমিতির রাজ্য দপ্তরের ঠিকানাতে লেখা পাঠাতে পারেন।

সম্পাদক
শিক্ষা ও সাহিত্য

Teachers' Journal

ORGAN OF THE ALL BENGAL TEACHERS' ASSOCIATION

Editor : Sri Prasanta Dhar ★ **Joint Editor : Sri Sibaprasad Mukhopadhyay**

VOL. LXXXIII **NO.9** **SEPTEMBER, 2004**

WELFARE STATE AND EDUCATION

The most famous exponents of 'utilitarian doctrine' were Jeremy Benthan and J.S. Mill – this philosophy advocates award of greatest benefits to the greatest number of people. Again, egalitarianism vouches the concept that all people are equal and deserve equal rights and opportunities . True democracy strives to achieve both the principles. But if the history of democratic rule is analysed, it becomes crystal clear that minority of privileged order yeilds rich harvest denying the legitimate rights of the vast majority of the people. And the democratic movements have spearheaded to establish the genuine authority of the populace in the functioning of governance through their elected representatives. The basic necessities including the right to education of the children are to be provided by the State – the democratic endeavours always aim to achieve these necessities of the people.

The establishment of socialist rule in Russia in 1917 made a sea-change in the modus operandi of governance – there was a paradim shifting. The denied sections received 'State Patronage' to ameliorate their living standards. Food, shelter, health and education were guaranteed to all the people. It opened the eyes of the capitalist world – a realisation found expression that some 'concessions' should be given to the common people and the poors. Gradually, Welfare State perception has come into existence – this system undertakes to protect the health and well-being of its citizens, especially those in financial or social needs. The right to elementary education secured popular support from all quarters. Basic education ensures fundamental change in the arena of all types of developments. As a matter of fact, development without education is nothing but an utopia. And education showers benefits both to the person and the community.

The founding fathers of our Constitution prescribed that free compulsory elementary education should be made a reality within 10 years from the enforcement of the constitutional rule. But the successive Central Govts did not attach due weightage for materialisation of the cherished desire of the framers of the Constitution. Years rolled

down, but no change was effected. Some years ago, the Apex Court of the country issued a verdict to take up the issue of universalisation of elementary education and completion of the same has to be done within the time frame of 2010. And under this backdrop, the NDA Govt was compelled to take up the programme of Education For All (EFA), but there was lack of sincerity as evident in the allocation of fund for achievement of the target of EFA. On the contrary, the allocation of financial resources for communalisation of syllabus -curriculum and the study of obscurantist ideas like astrology, palmistry and priesthood was made endeavours were made to replace reason-based education by faith-oriented educational system. The people of the country ousted the NDA Govt with a great hope.

The UPA Govt has to function as per the guidelines of Common Minimum Programme (CMP). The CMP is well-drafted one which is highly pro-people and pro-education too. The Tapas Majumder Committee had estimated that a sum of Rs. 1,37,000 crore was required over a period of 10 years to achieve the goal of universal elementary education. The Central Govt should not lose sight of the expenditure targets set by the said committee, and continue to increase progressively expenditure on elementary education in future. The 2 per cent education cess on all taxes is expected to mobilise additional resources to the tune of Rs. 4000-5000 crore. But the Planning Commission should not be allowed to redirect the resources into avenues other than education while making financial allocations. The fact remains that despite the promise of enhanced expenditure, the actual allocation for elementary education is far below the amount required to actualise universal elementary education.

The votaries of imperialist globalisations and liberalisation vouches 19th century concept of Minimalist Approach by the State; the National Govt should not affix much importance on education – this idea is just opposed to the perception of Welfare State. Education sharpens the brain; education ensures better health care and better civic sense. Vigilence and movements should run parallel to mount pressure on the UPA Govt for staying within the ambit of CMP. The present Central Govt must do justice to education.

09 September 2004

Call Of The Association

AMAL BANERJEE

General Secretary

Anti-Imperialism Day was observed in Kolkata on 1 September in perfect tune with the national programme – the Left Front's mammoth rally against imperialism and war was attended by all sections of people. The members of ABTA in a large number participated the historic rally to protest against the sinister designs of the imperialist forces led by Bush administration. Heartiest congratulations to the members. The endless flow of the processionists displayed unique sense of discipline till the rally terminated. The metropolis witnessed an unparalled sight.

October 05 will be observed as International Teachers' Day. Both FISE and STFI have urged the persons working in the arena of education to observe the day in a befitting manner. ABTA is a major component of STFI, and naturally, we must act in consonance with the tradition of our most endeared Association. In this respect, we must recall from our memory that concerted and planned endeavours always yeild positive results. ABTA has ascended at the apex of reverence across the country, even abroad, for its dynamism and correct and timely vision. 1954 struggles of ABTA ignited the members to register voice of protests against the then anti-education govt. This movement ultimately turned into a mass movement, and created a history.

The Association plans to bestow reverence to the participants of 1954 struggles. Friends, some historical events never die into oblivion. Past, perfect understanding of the past, explains present and helps to illuminate the future.

International Teachers' Day should be observed joinning the teachers and educational employees of all strata. And all the secular-democratic-progressive Teachers' Organisation are to be actively involved for greater impact. Programmes are to be organised in the districts all over the state. State level programme will be held in Kolkata. The District Branches are requested to chalkout plans for the success of the programme.

The National Platform of Mass Organisations (NPMO) throughout the month of September is organising campaigns across the state. And on 1 October an assemblage will be held at Sahid Minar highlighting 22 charter of demands including the issues of education. We have started the campaign programme at all levels and the process has to be accelerated so as to achieve the targeted results.

Again, the September issue of our journal lays specific focus on education – global and

national educational scenario finds place in the writings every year. And this month critically analyses the question of further enhancement of quality of the journal. Since the inception of our glorious Association Siksha-O-Sahitya : Teachers' Journal continues to work as the mouthpiece and supplies guidelines to spearhead the stirrings to protect the interests of education and people as well. ABTA has always responded to the demand of the time, and as a natural sequel, the people have always stood beside the Association at the hour crisis. Elevation of the standard necessitates constructive criticism and sincere involvement.

It is our obligatory duty to work in favour of building up mass awareness against imperialism which understands pecuniary exploitation and establishment of hegemony over the economic and natural resources of under-developed and developing countries. Despite erosion of value sense caused by imperialist globalisation, people hold teaching community in high esteem and expect much from the teachers and educational employees. True, a small section of the teaching community has submitted to selfish and consumerist life-style. But there is no reason for despair. The teaching community knows well how to isolate the errant ones.

Broader unity has to be built up with diferent mass organisations to thwart the menace of imperialist globalisation with a view to protect the economic sovereignty of the country. We shall have to join all anti-imperialist movements to save democratic education system, to protect professional security too.

There are ceaseless efforts to undermine the formal education system for past four decades. The imperialist globalisation does not vouch the concept that career should be open to talent. The policy of commercialisation has made education a purchasable commodity. Naturally, the quality aspect takes a back seat. We shall have to fight tooth and nail to protect democratic education system to make secure our existence. 'Save Education' slogan can surely obtain people's support by further enhancement of quality which can be secured with employment of improved and innovative learning-teaching technique; these are also struggles against imperialist designs. We must keep it in mind.

16 September 2004

Not To Forget

ANIL BARAN BANERJEE, Ex-Headmaster
Patrahati R.R. High School, *Bankura*

In the days of light of joy
Even in Victory's pleasure, we are
Not to forget, – never, never; –
Those days, – the dark days of past
When so hopeless, speechless, helpless
Had we become,
In tense and anxious halls and streets
In so many rallies and meets
We heard, we sang, –
"We shall overcome."

To win the battle,
To climb the hill so high
We could make us able so far
To scale some feet mere,
To cross the primary steps a feco
While hundred remainings lie!

In a dense and darker night
This day may again decline, yet!
We shall have to overcome, –
We are not to forget.

A Beggar

BAIRAGYA CHAKRABARTI, *Purba Medinipur*

Clad in tattered coat
he walked in lonely lane
like a pre-historic homo-sapien
with beard luxurient.

Faltering legs pushed him soon
before an open door –
peeped he for a flat wheatcake
the cruel slam denied to the poor.

He was gone unnoticed
heaving a sigh of grief and woe.
the lonely lane became lonlier
at the curse of the wretched poor.

D O No. H-11014/1/2004-ILAS(II)

SIS RAM OLA

MINISTER OF LABOUR & EMPLOYMENT
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110 001

To
Shri Sunil Khan
Member of Parliament (LS),
313, V.P. House,
New Delhi-110001.

Dear Shri Sunil Khan

Please refer to Lok Sabha Debate held on 06.07.2004—matter raised under Rule 377 by you rearding need to bring in a legislation to accord Right to Strike to the employees and ratification of ILO Conventions No. 87, 98, 151, and 154.

Convention No. 87 provides for the right of workers and employers, without any distinction to establish and join organizations of their own choosing without previous authorization. Their organizations have the right to form or join federations and confederations including the federation and confederation at international level. These organizations or federations may not be liable to arbitrary dissolution or suspension by an administrative authority. Convention No. 98 aims to protect the exercise of the right to organise and to promote voluntary collective bargaining.

Government of India has taken a conscious decision not to ratify the Conventions No. 87 & 98. This decision has been taken in consultation with DOPT who were of the view that Government employees should not be covered under these two Conventions as they have an exceptionally high degree of job security flowing from Article 311 as compared to industrial workers. Government employees also have alternative grievance redressal machinery under the JCM and the administrative tribunals. DOPT had, therefore, reiterated the Government stand that these Conventions should not be ratified.

Convention No. 151 concerning Labour Relating (Public Service) is an extension of Convention No. 87 & 98. This also cannot be ratified for the reasons stated above. As far as Convention No. 154 concerning Collective Bargaining is concerned the main hurdle in ratifying this Convention is the fact that it applies to all branches of economic activity. As the bulk of workers in the country are either unorganized rural workers or those working in the urban informal sector, it may not be possible to extend measures for promoting collective bargaining in these sectors immediately.

With regards
Date : 17th August, 2004

Yours sincerely
Sis Ram Ola

All India State Government Employees' Federation

KARMACHARI BHABAN

10A, SHANKHARITOLA STREET, KOLKATA-700 014

30th August, 2004

To

Shri P. Chidambaram

Union Finance Minister,

Government of India

North Block, New Delhi-110 001

Fax : 011-2309 2810

Sub : Raising of interest rate of G.P.F. along with E.P.F. and interest rate of Small Savings.

Dear Sir,

You are surely aware that along with the drastic reduction of interest rate of EPF, the rate of interest of General Provident Fund of the Central and State Govt. employees (numbering more than one crore) was also reduced from earlier 12% to 8% presently. All these reductions took place during the last several years against which we have always protested.

Now since, the States are demanding for raising the interest rate of EPF, we would request that the All India State Govt. Employees' Federation has also raised demand of raising the interest rate of GPF also as more than one crore of Govt. employees are affected by it.

We would like to refer to another point. During the Lok Sabha elections the senior citizens all over the country voted against the BJP-led NDA in a big way as a protest against the drastic reduction of interest rate of Small Savings. This was one of the main reasons for the anger of the senior citizens against the BJP Govt.

Now everybody expected that the UPA Govt. would raise the interest rate to a certain extent. And the UPA Govt. has announced 9% interest rate for the savings of senior citizens according to our information, as appeared in the media. But we would like to point out that the existing 8% interest rate of postal savings carries a bonus of 10% after maturity of the deposit. But now if senior citizens deposit money at 9%, no bonus will be added to their savings after maturity. This means at 8% interest, the depositors will actually be benefited with 9.25% interest rate taking into account the 10% bonus. And while depositing at 9% they will get just 9% only without 10% bonus. Senior citizens are feeling badly at this reported decision by the UPA Govt.

Hope you would appreciate our position and take appropriate steps to raise the interest rate of GPF to earlier rate of 12% and also interest rate of Small Savings at least to 12% and issue orders accordingly.

With regards,

Sincerely yours,

SUKOMAL SEN

General Secretary

All India State Government Employees' Federation

KARMACHARI BHABAN

10A, SHANKHARITOLA STREET, KOLKATA-700 014

1st September, 2004

Reminder Circular

Sub : Joint National Convention & National Executive Meeting at Delhi
Ref : AISGEF Circular of 20 August, 2004

Dear Comrades,

Kindly refer to my Circular letter of 5th August, 2004 detailing the proceedings of Patna National Council meeting of 1-3 August, 2004, I am to inform you that since Central Employees' Confederation lately expressed their difficulty for the date of 25th September, 2004 for National Convention at Delhi, the date has ultimately been decided to be held on **24th September, 2004,** as communicated in our Circular of 20th August, 2004.

The Joint Convention will thus meet at 2-30 PM to 7-30 PM on 24th September, 2004 at the auditorium of *Indian Institute of Public Administration* (near ITO, behind A.G.C.R. Office) at Bahadur Shah Jaffar Marg, New Delhi. Consequently, the National Executive meeting of AISGEF which has already been announced in the Patna Council to be held on 24th September, 2004 will be at Banga Bhavan, 3, Haily Road, New Delhi-1 at 10 AM to 1 PM. Lunch will be served at Banga Bhavan after the meeting and all members will then proceed to Joint Convention. National Executive will include All India Women Sub-Committee members also.

The Agenda of the National Executive is to detail out the programme of March to Parliament and submission of mass signature on 7th December, 2004 at Delhi and other related issues and miscellaneous, if any.

The quota for the AISGEF for the Joint Convention on 24th September, 2004 is 350 and the statewise break-up will be as follows :

(1) Haryana-50, (2) U.P.-50, (3) Punjab-50, (4) Bihar-40, (5) M.P.-20, (6) Chhattisgarh-10, (7) Jharkhand-20, (8) Maharashtra State Employees' Confederation-20, (9) Gujarat-10, (10) Kerala-10, (11) Tamilnadu-10, (12) Karnataka Govt. Employees' Association-10, (13) Akhil Karnataka State Government Employees' Federation-10, (14) Maharashtra Zilla Parishad Employees' Confederation-10, (15) Orissa-5, (16) Assam-5, (17) Tripura-5, (18) Jammu & Kashmir-5, (19) Goa-5, (20) Andhra Pradesh NGO Association-15, (21) Telengana NGO Association-15, (22) Andhra Pradesh Public Sector Employees' Federation-10. This quota for the States include the National Executive members also.

All States should see that this quota is fulfilled and some lady comrades are included in their delegation. All delegates should reach the Convention venue in time and leave the Convention only after it is concluded.

Arrangement for stay, etc. for the delegates and National Executive members has to be made by the states themselves.

Moreover, it may be noted that in the National Executive meeting only the members of National Executive and Women Sub-committee members should attend and not others.

Kindly book your return Railway Tickets and confirm AISGEF Head Qrs. about your participation with the quota as noted above.

Here I am enclosing our letter of 31.8.2004 addressed to the Union Finance Minister requesting raising of G.P.F. interest rate & Small Savings interest rates for your information.

We have sent this letter to all Central Trade Unions and Press also.

We are trying for an interview with the Prime Minister to press with our Charter of Demands.

We have just received a copy of D.O. dated 17.8.2004 from Shri Sis Ram Ola, Union Labour Minister addressed to Shri Sunil Khan, CPI (M) Member of Lok Sabha, which speaks for itself. We are enclosing herewith copy of that D.O. for your information. Com. Khan, a CPI (M) Member from Durgapur (West Bengal) is constantly raising the issue in Parliament.

In view of this attitude of the Govt., our National Convention on 24th September, 2004 and our decision for March to Parliament on 7th December, 2004 for submission of the Mass Petition to Parliament demanding Right to Strike assume further importance.

We are, therefore, requesting you to collect maximum number of signatures on the Mass Petition realising the gravity of the situation. Without mass pressure the Govt. will not move.

With greetings,

Comradely yours,
SUKOMAL SEN
General Secretary

Encl : As Stated.

To
All State Affiliates, Invitees &
All India Women Sub-committee Members

Madrasah Circular

West Bengal Board Of Madrasah Education

19, Haji Md. Mohsin Square, Kolkata-700 016

No. 6325

Date : 28.07.2004

High Madrasah/Alim/Fazil/Kamil Examination-2005

(Both Regular & External)

NOTIFICATION

It is notified for information of all concerned that the High Madrasah/Alim/Fazil/Kamil Examinations, 2005 (Both Regular & External) will be held as per following Programme.

EXAMINATION PROGRAMME

DATE	DAY	HIGH MADRASAH	ALIM	FAZIL	KAMIL
		11 A.M.-2P.M.	**11 A.M.-2P.M.**	**11 A.M.-2P.M.**	**11 A.M.-2P.M.**
01.03.2005	Tuesday	Bengali-I/Urdu-I	Bengali/Urdu	Tafsir	Tafsir
02.03.2005	Wednesday	Bengali-II/Urdu-II	Arabic-I	Hadith	Hadith
03.03.2005	Thursday	Life Science	Hadith	Fiqh	Arabic-I
05.03.2005	Saturday	Mathematics	Mathematics	Usul	Arabic-II
07.03.2005	Monday	English	English	Arabic-I	Arabic-III
08.03.2005	Tuesday	History	Tafsir	Arabic-II	Arabic-IV
09.03.2005	Wednesday	**11 A.M.-1 P.M.** Geography	**11A.M.-1 P.M.** Geography **1-30P.M.-3-30 P.M.** Fiqh	Arabic-III	Tarikh-ul-Islam
10.03.2005	Thursday	**11 A.M.-2 P.M.** Advance Arabic	Life Science Arabic-II	Arabic-IV	Fiqh
12.03.2005	Saturday	Physical Science	Physical Science Faraid	Kalam	Usul
			11 A.M.-2 P.M.		
14.03.2005	Monday	Arabic	History	Tarikh-ul-Islam	Kalam
15.03.2005	Tuesday	All Addl. Subjects -Theoretical	All Addl. Subjects	**10.A.M.-1 P.M.** All Addl. Subject Paper-I **1-30 P.M.-4-30 P.M.** All Addl. Subject Paper-II	

N.B.
- (i) Centre Fee @ Rs. 40/- per candidate or as directed by the Board.
- (ii) The dates for Work Education, Physical Education and Social Service (as addl. subject) examination will be from Monday the 21st march to Saturday to the 26th march 2005.
- (iii) The Candidates shall collect their Admit Cards from the respective Madrasah after 18th February, 2005.
- (iv) The papers of 100 marks will be of 3 hours' duration and the papers of 50 marks will be of 2 hours' duration.
- (v) Examination in short-hand & type writing will be held at Kolkata and Malda only. The venue and date will be announced later on.
- (vi) Examination in Sewing and Needle Work will be of four hours' duration.
- (vii) Practical of Computer Application will be held on 20th April, 2005.

G.H. Obaidur Rahman
Secretary

Board Circular

WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
77/2, Park Street, Kolkata- 700 016

Circular No. S/375 Dated : 17.9.2004

From : Sri Swapan Bhattacharya, Secretary, W.B.B.S.E.

To : The Heads of all Institutions recognised by the Board.

Sub : Extension of the tenure of the Managing Committee/Ad-hoc Committee/Organising Committee/Administrator of the Institutions recognised by the Board.

The Board issued the Circular No. S/134 dt. 8.3.04 allowing extension of the tenure of Managing Committee/Ad-hoc Committee/Organising Committee/Administrator of the recognised Institutions upto 31.10.2004 or till completion of the office bearers election or until further orders which ever is earlier subject to certain conditions stipulated therein.

It has now come to the Notice of the Board that a good number of Secondary Schools are not in a position to complete the entire process of the constitution/reconstitution of Managing Committee within 31.10.2004 and the Board has taken note of the fact that in respect of Higher Secondary Schools, the admission of students is to continue upto 30th November, 2004.

In view of above the Executive Committee of the Board in its meeting held on 9.9.2004 after careful consideration of the facts and circumstances resolved that :–

(1) In respect of Secondary Schools the entire election process of Managing Committee including election of office bearers should be completed by 28.02.2005 and the tenure of Managing Committee/Ad-hoc Committee/Organising Committee/Administrator is accordingly extended upto 28.02.2005 in each case or till completion of the office bearers election of Managing Committee or until further orders which ever is earlier. The Institutions which have already drawn up programme for election of Managing Committee within 28.02.2005 shall proceed accordingly.

(2) In respect of Higher Secondary Schools where constitution/reconstitution of Managing Committee has already become due, the entire election process including office bearers election shall be taken up after 30th November, 2004 and completed by 30.042005 and accordingly the tenure of Managing Committee/Ad-hoc Committee/Organising

Committee/Administrator of such schools is extended upto 30.04.2005 or till completion of the office bearers election of the Managing Committee or until further orders which ever is earlier.

The Board however reserves the right to appoint Administrator/Ad-hoc Committee where the same would be necessary for administrative reasons.

This Circular is not applicable in respect of all Institutions recognised by the Board, where contrary orders from Hon'ble Court prevails.

Sd/-Illegible
Secretary

Memo No. S/375 (1-14) Date : 17.9.2004

Copy forwarded for information and necessary action to :–

1. The Principal Secretary, School Education Department, Govt. of West Bengal, Salt Lake City, Kolkata-91.
2. The Director of School Education, West Bengal, Bikash Bhaban, Salt Lake City, Kolkata-91.
3. The District Inspector of Schools (SE) of all districts of West Bengal for circulation to recognised Institutions of the Board.
4. The Deputy Secretary (Academic) for publication in the next issue of the "Parsad Varta".
5. The all recognised Secondary Teachers' Organisation.
6. O.S.D., WBBSE.
7. P.A. to the President, WBBSE.
8. P.A. to the Secretary, WBBSE.
9. Meeting Section, WBBSE.
10. All Deputy Secretaries, WBBSE.
11. All Asstt. Secretaries, General Section, WBBSE.
12. All Regional Officers, WBBSE (Kolkata, Burdwan, Midnapore & North Bengal).
13. All Board Members, WBBSE.
14. All Law Supervisers, WBBSE.

Sd/-Illegible
Secretary

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

রাজ্য শাখা পরিচালিত

হলিডে হোম

বক্রেশ্বর

সত্যপ্রিয় রায় স্মৃতি বিশ্রাম ভবন-এর ভাড়া

শয্যা	ভাড়া প্রতিদিন		জামানত	ঘরের সংখ্যা
	সদস্য	সদস্য নয়		
৪	৭৫·০০	১০০·০০	১০০·০০	৮

দীঘা

রথীন্দ্রকৃষ্ণ বিরাম নিলয়-এর ভাড়া

কুটির

শয্যা	ভাড়া প্রতিদিন		জামানত	ঘরের সংখ্যা
	সদস্য	সদস্য নয়		
৬	১০০·০০	২০০·০০	২০০·০০	৮

ডরমেটারী ঘর

শয্যা	ভাড়া প্রতিদিন	জামানত	ঘরের সংখ্যা
২	৫০·০০	৫০·০০	১
৩	৭০·০০	৭০·০০	১
৪	৯০·০০	৯০·০০	২
৬	১৩০·০০	১৩০·০০	২

ডরমেটারী হল

শয্যা	ভাড়া প্রতিদিন	জামানত	ঘরের সংখ্যা
২০	শয্যাপ্রতি ২০·০০	শয্যাপ্রতি ২০·০০	১
২৮	শয্যাপ্রতি ২০·০০	শয্যাপ্রতি ২০·০০	১

হলিডে হোম বুকিং করতে অবশ্যই সমিতির স্কুল/মহকুমা বা জিলা শাখার কর্তৃপক্ষের পরিচয়পত্র সঙ্গে আনতে হবে। এছাড়া সমিতির সদস্য ব্যতীত ব্যক্তি নিজ নিজ অফিস কর্তৃপক্ষের পরিচয়পত্র সঙ্গে আনতে হবে।

জামানত ঃ ভ্রমণশেষে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকলে তা বাদ দিয়ে এবং দীঘা হলিডে হোমের কুটির ভাড়ার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ খরচের টাকা বাদ দিয়ে কেন্দ্রীয় অফিস থেকে ফেরৎ পাওয়া যাবে।

ডরমেটারী হল/ঘর ব্যবহারকারীগণ, প্রয়োজনে রান্নার জায়গা ব্যবহার করলে প্রতিদিন ৬০ টাকা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অতিরিক্ত দিতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
পি-১৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ
কলকাতা-৭০০ ০১৩
দূরভাষ ঃ ২২১৫-৮৮৫৬, ২২১৫-৯১৫৮